আলোচনা-প্রসঙ্গে

নবম খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

নবম খণ্ড

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

প্রকাশক :
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্‌লিশিং হাউস্‌
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৬২

মুদ্রাকর :
শ্রীকাশীনাথ পাল
প্রিন্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

আমার কথাগুলি যদি তোমার -
শুধু কথা ও চিত্রণেরই খোরাক মাত্র হয় -
করায় বা আবরণের ভেতর দিয়ে
লোকটিকে যদি -
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পায় -
তবে -
পাওয়া যে তোমার
অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় —

তোমারই "আমি"

আলোচনা-প্রসঙ্গে

৬ই পৌষ, রবিবার, ১৩৫৩ (ইং ২২ । ১২ । ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশথতলায় এসে বসেছেন। বাদলদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), প্রমথদা (দে), ঠাটু (সান্যাল), নীহারদা (হালদার), মণিদা (ঘোষ) প্রমুখ কাছে আছেন।

কেমনভাবে চলতে হবে সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চলনটা এমনভাবে regulate (নিয়ন্ত্রিত) করতে হয়, যাতে কিনা অন্যের সুবিধা বই অসুবিধা না হয়। এইটেই হ'লো সাধারণ নীতি। এই নীতি সার্থক হয়, যেখানে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে এর সুসঙ্গতি স্থাপিত হয়। আমার কষ্ট না হয়, তেমনভাবে তোমরা চলবে—সেইটে আমার দাবী তোমাদের কাছে। এতে তোমরাও সুখী হবে, পরিবেশও উপকৃত হবে, আমিও নন্দিত হব। নিষ্ঠা না থাকলে ব্যক্তিত্ব কখনও পরাক্রমশালী হয় না। প্রেষ্ঠের নিন্দা করে যে বা তাঁর নিন্দার প্রশ্রয় দেয় যে, তার mentality (মানসিকতা) ধীরে-ধীরে bastard (জারজ) হ'য়ে ওঠে। Chaste mentality (পবিত্র মানসিকতা)-এর লক্ষণ হ'লো অকাট্য শ্রেয়নিষ্ঠা, যা' কোন প্রলোভনে, ভয়ে, প্রয়োজনে বা বাধায় টলে না। ব্যক্তিত্বে শক্তি সঞ্চার হয় এই নিষ্ঠার ভিতর-দিয়েই। আর, এই শক্তিই পরিবেশের সম্ভ্রম আকর্ষণ করে।

প্রফুল্ল—আপনি অসৎ-নিরোধের কথা বলেন অথচ সবার প্রতি অদ্রোহী হ'তে বলেন—এটা কেমন ক'রে সম্ভব? দুষ্ট লোকের প্রতি স্বতঃই তো মন বিরূপ হ'য়ে ওঠে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তার যখন operation (অস্ত্রোপচার) করে, তখন রোগীর প্রতি কি তার সহানুভূতির অভাব হয়? রোগীকে সুস্থ ক'রে তোলবার জন্যই operation (অস্ত্রোপচার) করে। ঘা যাতে শুকিয়ে যায়, তার জন্যও কত সযত্ন ও সতর্ক ব্যবস্থা করে। তেমনি মানুষটার প্রতি যদি অত্যন্ত দরদ না থাকে তাহ'লে তার চারিত্রিক ব্যাধি সারান যায় না। তার জন্য শাসন, তোষণ, পোষণ, সেবা, দরদ সবকিছুই লাগে। সর্ব্বোপরি লাগে সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়। তোমার ছেলেটার জন্য তুমি কেমন কর, ভেবে দেখলে পার। Hate sin and not the sinner (পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে নয়)—এমনতর attitude (মনোভাব) নিয়ে চলতে হয়।

প্রমথদা—কোন দোষত্রুটি-সম্পর্কে প্রকৃত অনুতাপ যদি আসে, তবে তার কি

পুনরাবৃত্তি হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না হবারই তো কথা। তবে sickly minded (অসুস্থমনা) যারা, যারা fanatic (সুনিষ্ঠ) নয়, তাদের হ'তে পারে। শ্রেয়প্রীতির দরুন যে বিবেকবুদ্ধির জাগরণ হয়, তা' সত্তার অন্তঃকেন্দ্রকে স্পর্শ করে। তাই অমনতর বিবেকসঞ্জাত অনুতাপ ব্যর্থ হয় কমই।

একজন নবাগত দাদা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সামাজিক জীব আমরা, সমাজের বুকে জন্ম নিয়েছি, সমাজের মধ্যে বাস করছি, তাই আমাদের প্রধান করণীয় হ'লো প্রাণপণে অপরের ভাল করা—যত দিক দিয়ে যত লোকের যতখানি পারা যায়। এর মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের কল্যাণ। আর, কল্যাণের প্রতীক হলেন ইষ্ট। তাই, সব চলাটা, সব করাটা হওয়া চাই ইষ্টার্থে সুসংহত। নইলে করাগুলি দানা বেঁধে উঠে স্থায়ী সুফল প্রসব করতে পারে না, বিচ্ছিন্নতায় বিলীন হ'য়ে যায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার পা দু'খানা, হাত দু'খানার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, আমার পরিবেশের সঙ্গেও সেই সম্পর্ক। হাত-পা বাদ দিয়ে যেমন আমার চলে না, পরিবেশকে বাদ দিলেও আমার জীবন তেমনি অচল হ'য়ে ওঠে। তাই পরিবেশকে সুস্থ, স্বচ্ছ ও উন্নত করা আমার জীবন-চর্য্যারই অঙ্গীভূত। এমনতর চলনই হ'লো ধর্ম্ম, যা ব্যষ্টি ও সমষ্টির সত্তাকে ধরে রাখে। তাই, পরিবেশের স্বার্থের কথা বাদ দিয়ে নিজের একক স্বার্থের কথা ভাবাটাই একটা বেকুবী। এই বেকুবী যার বিদায় নেয়নি, সে কখনও শিষ্ট বা শিক্ষিত মানুষ ব'লে পরিচিত হবার যোগ্য নয়।

এরপর দেওঘর সহর থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক বেড়াতে আসলেন। সেবাধর্ম্ম-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের আশ্রয় মানুষ। এই কথাটা সর্বদা স্মরণ রেখে সাধ্যমত মানুষের সেবাযত্ন ও উপকার করতে হয়। সামর্থ্য সত্ত্বেও এই করাটা যার যত খতম হ'য়ে আসে, সে তত নিরাশ্রয় হ'য়ে উঠতে থাকে। ফলকথা, প্রত্যেকটা মানুষ যদি প্রত্যেকটা মানুষের স্থিতি ও উন্নতির জন্য suffer (কষ্ট) ও sacrifice (ত্যাগ) করতে রাজী না থাকে, তবে ব্যক্তিই বা দাঁড়ায় কি ক'রে আর সমাজই বা দাঁড়ায় কি ক'রে ? পারস্পরিক সেবাবুদ্ধি তাই ব্যক্তি ও সমাজের সংস্থিতির মূল ভিত।

উদারতা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উদারতা খুব ভাল জিনিস, কিন্তু আদর্শনিষ্ঠা ও বৈশিষ্ট্যকে উল্লংঘন ক'রে যে একশা রকমের চলাঢলি তাকে কিন্তু উদারতা কয় না। আবার ধরুন, আপনার সামনে আপনার ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অবমাননা হ'চ্ছে, আর আপনি তাতেই সায় দিয়ে যাচ্ছেন, কোন প্রতিবাদ করছেন

না, সেটাও কিন্তু কাপুরুষতা বৈ আর কিছু নয়। এইসব দুর্ব্বলতাকে যদি উদারতা ব'লে চালিয়ে দেওয়া হয়, তার মত ভুল আর নেই। নিষ্ঠায় দৃঢ় হ'য়ে সৎ ও শুভ যেখানে যা'-কিছু তাকে বিহিত শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা জ্ঞাপন করাই উদারতার প্রধান কথা। এতেই সংহতি সবল হ'য়ে ওঠে। উদারতার মধ্যে শ্রদ্ধা ও গুণগ্রহণমুখরতা যেমন থাকে, তেমনি থাকে অসৎ-নিরোধী পরাক্রম। উদারতার নামে যেখানে প্রবৃত্তিপরায়ণতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেখানে জাহান্নমের পথই প্রশস্ত হয়। Evil (অসৎ)-কে resist (নিরোধ) করাই উচিত, হিংসাকে হিংসা করাই অহিংসা। ব্যারামের প্রতি অহিংস হওয়া মানে death (মৃত্যু)-কে invite (আমন্ত্রণ) করা, at the cost of life (জীবনের বিনিময়ে)।

কিছুক্ষণ পরে ও'রা চ'লে গেলেন।

একজন এসে আর-একজন সৎসঙ্গীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে বললেন যে, সে নাকি ব্যক্তিগত বিরোধ ও শত্রুতার প্রতিশোধ নেবার জন্য বাইরের লোকের সাহায্য নিয়ে একজন গুরুভাইকে লাঞ্ছিত করেছে।

এই কথা শোনামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানি বিষণ্ণ হ'য়ে গেল। একটু পরে বললেন—এমনতর হ'য়ে থাকলে খুবই খারাপ কথা। আমরা মারামারি করতে পারি, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে যদি একত্রে বসে রসগোল্লা খেতে পারি, তবে বুঝবো, সে মারামারি healthy (সুস্থ) মারামারি। আমাদের loop-hole (ছিদ্র), vanity (দম্ভ), weakness (দুর্ব্বলতা) অনেক থাকতে পারে, passion (প্রবৃত্তি) দিয়ে obsessed (অভিভূত) হ'তে পারি, তার জন্য গোলমালও হ'তে পারে, কিন্তু নিজেদের ঘরোয়া গোলমালের ব্যাপারে বাইরের লোককে ডেকে এনে তাকে দিয়ে যদি নিজের ভাইকে নির্য্যাতন করি, সে একরকমের বিশ্বাসঘাতকতা বৈ আর কিছু নয়। তার মানে, আমার inferiority (হীনম্মন্যতা)-এর satisfaction (সন্তোষ)-এর জন্য আমি ইষ্টানুগত্য সংঘভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সবকিছু লহমায় বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। এ খুব জঘন্য চরিত্রের লক্ষণ। এমনতর মানুষ নিজের অহং-এর খাতিরে দেশ, জাতি, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, গণস্বার্থ ইত্যাদি সবকিছুকেই বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে। যত গুণপনাই থাক, এমনতর মানুষ-সম্বন্ধে সাবধান থাকাই সমীচীন।..............সেইদিন দু'জন শিখ এসেছিল, তারা বলছিল—তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবার সময় কোন পাঠান তাদের কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলে নিজেরা মারামারি থামিয়ে দু'জনেই তাকে resist (প্রতিরোধ) করে। তার মানে তারা চায় না যে, কোন পাঠান তাদের বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে। সংহতি বজায় রাখার জন্য যারা উদ্যত-প্রবৃত্তিকে লহমায় সংযত করতে পারে, তাদের মধ্যে যে ধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে জাগ্রত, তাতে আর সন্দেহ কি?

১১ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ২৭।১২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশথতলায় এসে বসেছেন। এখানে এখন প্রচণ্ড শীত পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর রোদ পিঠ ক'রে বসেছেন। বাণীদা (চৌধুরী) প্রমুখ বিহারের যুব-আন্দোলনের কতিপয় বিশিষ্ট কর্ম্মী এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

তাদের কর্ম্মধারা কেমন হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমাদের movement (আন্দোলন) এমন হওয়া উচিত, যাতে প্রত্যেকেই স্বস্তির অধিকারী হয়।

বাণীদা—হিংসাকে দমন করতে হবে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিংসাকে হিংসা করতে হবে অহিংসার জন্য, অধর্ম্মকে অবলুপ্ত করতে হবে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য, ব্যাধিকে বিধ্বস্ত করতে হবে স্বাস্থ্যের জন্য, মৃত্যুকে মারতে হবে জীবনের জন্য। হিংসা-প্রবৃত্তিকে হিংসা ক'রে তার নিরসন করতে হবে। কোন সত্তাকে হিংসা করা অন্যায়।

প্রশ্ন—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করলেন, তা'তে তো লোকের সত্তাকেই হিংসা করা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্। তিনি বলতে চেয়েছিলেন—'পূর্ব্বকর্ম্মের ফলস্বরূপ বিধিবশে তারা মৃত্যুকে আহরণ করে রেখেছে। হে অর্জ্জুন! তুমি শুধু তাদের অর্জ্জিত মৃত্যুফলের পরিবেষক হও। তুমি তাদের মৃত্যুর কারণ নও। তাদের মৃত্যুর কারণ তাদের কর্ম্ম।' তবে সেই ব্যবস্থা করতে পারাই ভাল, যাতে সবাই বাঁচে, মৃত্যুই মরণ বরণ করে।

বাণীদা—Leader (নেতা)-দের উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Leader (নেতা)-দের rationally (যুক্তিযুক্তভাবে) চলা উচিত। পয়েন্টম্যানদের মত তাদের লাইন ঠিক ক'রে দেওয়া লাগে। কোন জীয়ন্ত মানুষ-দেবতার কাছে surrender (আত্মসমর্পণ) না করলে, কেউ প্রকৃত leader (নেতা) হতে পারে না। আকাশের দেবতা হ'লে হবে না। তাতে প্রবৃত্তিগুলির গায় হাত প'ড়ে সেগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় না। ইষ্টদেবকে ঠাকুর বলে। ঠাকুর মানে যিনি ঠক্কর দেন। মানুষ যখন প্রবৃত্তি-অভিভূত হয়, তখন প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তি ব'লে চিনতে পারে না। ঠাকুর সুকৌশলে মানুষকে এমন অবস্থার মধ্যে ফেলেন, তাকে এমন কাজের দায়িত্ব দেন, উপযুক্ত মুহূর্ত্তে এমন কথা বলেন, যাতে তার প্রবৃত্তিটা তার কাছে ধরা পড়ে। ঠাকুরের প্রতি অনুরাগ থাকলে তখন সেই প্রবৃত্তিকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করার সম্বেগ জাগে। এইভাবেই মানুষ শুধরে যায়। নইলে যে যতই ভাল হো'ক, অনিয়ন্ত্রিত খেয়াল ও প্রবৃত্তি যে কাকে কখন কোন্‌দিকে পরিচালিত করবে, তার কোন ঠিক নেই। তাই ইষ্ট নাই, surrendered (আত্মনিবেদিত) নই,

অথচ নেতা হলাম, তার মানে অকল্যাণের অগ্রদূত হলাম।

সারা ভারতের সংহতি কেমন ক'রে আসবে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মবোধকে জোরসে উজ্জীবিত ক'রে তুলতে হবে। হিন্দু যদি আচারে-আচরণে প্রকৃত হিন্দু হয়, সারা ভারতের হিন্দুসমাজ যদি ঐক্য-বন্ধনে বিধৃত হয়, প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের হয়, নিজেরা স্বধর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে অন্য সম্প্রদায়ের লোককে তারা যদি স্বধর্ম্মপরায়ণ ক'রে তোলার প্রেরণা জোগায়, তবে এই উদ্দীপ্ত ধর্ম্মবোধের ফলে পারস্পরিক প্রীতিবোধও প্রবল হ'য়ে উঠবে। আর, প্রত্যেক province (প্রদেশ) প্রত্যেক province (প্রদেশ)-এর emergency (সঙ্কট)-এর সময় সেবা-সাহায্যের জন্য প্রস্তুত না থাকলে material cementing (বাস্তব সংহতিসাধন) হয় না। আমার এক পয়সা লাগলে সিকি পয়সা রেখে দেব with suffering (কষ্ট ক'রে) for any sister-province and sister-community (অন্য প্রদেশ ও অন্য সম্প্রদায়ের জন্য)। ধনী-দরিদ্র, জমিদার-প্রজা, শিল্পপতি-শ্রমিক পরস্পর পরস্পরকে বাঁচাবে with men, money and resources (মানুষ, অর্থ ও সম্পদের বিনিয়োগে)। সত্তাসম্বর্দ্ধনী পারস্পরিকতা যদি প্রবল হ'য়ে মাথাতোলা দেয় একাদর্শপরায়ণতার শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে—পরাক্রমপ্রবন্ধ অনুচলনে,—তবেই misery (দুর্দ্দৈব) materially impossible (বাস্তবে অসম্ভব) হ'য়ে উঠবে, mercy (ভগবৎ-করুণা) automatically (আপনিই) আসবে—সংহতিকে সাবুদ ক'রে।

বাণীদা—প্রাদেশিকতা-জনিত বিদ্বেষ যাবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর (উচ্চকণ্ঠে)—কোথায় বিদ্বেষ? আমি তো দেখি ভালবাসার অন্ত নেই। অন্তঃসলিলা ভালবাসাকে উসকে না দিয়ে জোর ক'রে যদি বিভেদ সৃষ্টি করি, সেইটেই তো অন্যায়। নোয়াখালীর বিপন্নদের জন্য বিহারী ভাইদের যে আন্তরিক সমবেদনার অনুভূতি উত্তাল হ'য়ে উঠেছিল, সেটা কি বিদ্বেষের লক্ষণ না প্রীতির লক্ষণ? Integrating enthusiasm (সংহতি-সন্দীপী উৎসাহ) যেখানে যতটুকু আছে তাকে murder (হত্যা) না ক'রে manipulate (সুপরিচালিত) ক'রে গণ্‌গণে ক'রে দিতে হয়। ঐ enthusiasm (উৎসাহ) যদি misdirected (বিপথে পরিচালিত)-ও হয়, তবু তাকে crush (ধ্বংস) না ক'রে profitably channelise (লাভজনকভাবে প্রণালীবদ্ধ) করা লাগে।

বাণীদা—নেতারাই অনেক সময় ঠিক পান না কোথায় কী করণীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Principle (আদর্শ) ঠিক না থাকলে কোন্ পথে যাচ্ছি ঠিক পাই না। সত্তাসম্বর্দ্ধনার পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হ'চ্ছে কিনা তাও বুঝতে পারি না। সদ্‌গুরুর সঙ্গে যুক্ত না হ'য়ে নিজের খুশিমত চলতে থাকলে

বুদ্ধিভ্রংশ হয়। বুদ্ধিভ্রংশ হ'লেই সর্ব্বনাশ। নেতা যারা হবে, তাদের গুরু-আনতি বিশেষ প্রয়োজন। তাদের একটা ভুলে সারা দেশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'য়ে পড়তে পারে। তাই তাদের এমনভাবে গুরুনিষ্ঠ থাকতে হবে যাতে তারা প্রবৃত্তি-জনিত প্রমাদের ঊর্দ্ধে থাকতে পারে। জনসাধারণ অজ্ঞ, ভুলো মন তাদের। কিসে কী হয়, তাও সাধারণ লোকে বিচার করতে পারে না। তাই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের খুব বিবেকী হওয়া লাগে। আমার যদি সম্যক দর্শন না থাকে, আমি নিজেই যদি অভ্রান্ত পথের সন্ধান না পেয়ে থাকি, কী অধিকার আছে আমার জনকল্যাণের নামে অন্যের উপর নিজের খেয়াল-খুশি চাপিয়ে দেবার? চাই ইষ্ট, চাই দীক্ষা, চাই ধর্ম্মাচরণ। তাতেই মানুষগুলি সুস্থ, সবল, দক্ষদীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ইষ্টকে পরিবেষণ ক'রে মানুষকে মানুষ ক'রে তোলে যারা—তাদের নাম ঋত্বিক্। হাজার-হাজার সুগঠিত ঋত্বিক্ চাই আজ, যারা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। তাদের গায়ের হাওয়া যেখানে যেয়ে লাগবে সেখানেই গজিয়ে উঠবে উন্নত জীবন, মহৎ-চরিত্র। এ-কথা মনে রেখো—শুধু বাংলা, বিহার ও ভারতকে ঠিক করলেই হবে না। সারা জগৎকেই আজ নূতন ক'রে ঢেলে সাজাতে হবে। আর, তার দায়িত্ব তোমাদের উপর। তোমাদের মুখ চেয়ে আছে যারা, তাদের তোমরা নিরাশ ক'রো না।

বিহারের একটি ভাই বললেন—বাংলা আজ বিপন্ন। বাংলার জন্য আমরা কী করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার এই কথা বড় আশার কথা। তোমরাই পার বাংলার সব ক্ষত মুছে দিতে, তোমার প্রদেশের প্রত্যেকটা cell (কোষ) দিয়ে বাংলার প্রত্যেকটা cell (কোষ)-কে nourish (পুষ্ট) করতে। বাংলা খোঁড়া হলেও তার ক্ষমতা অসীম। তাকে যদি সব দিক-দিয়ে তাজা ক'রে তুলতে পার, সবাই উপকৃত হবে।

এরপর ওঁরা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

রঞ্জন (দাশশর্ম্মা) কথাপ্রসঙ্গে বলল—আমার একজন বন্ধু নানা ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, তার একটা ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে সেদিন তাকে বলেছি—তোমার কোন সাহায্য-সহযোগিতা আমি চাই না। তারপর থেকে মনে হ'চ্ছে ঐভাবে কথাটা বলা ঠিক হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কোন সাহায্য-সহযোগিতা চাই না—এ-কথা কাউকে বলা চলে না, বিশেষতঃ একদিন যার দ্বারা উপকৃত হয়েছ, তাকে তো নয়ই। সামান্য কারণে কৃতজ্ঞতা হারান গুরুতর অপরাধ। তা'ছাড়া, আমরা প্রত্যেকে inter-dependent (পরস্পর-নির্ভরশীল)। কার যে কখন কার সাহায্য-সহযোগিতা অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়বে তার কোন ঠিক নেই। কাকেও চাই না—এ-কথা বললে বলা হয় ভগবানকেও চাই না। ওটা দেমাকের কথা। প্রায়ই

ও-কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। মানুষ যখন অহঙ্কারে কাউকে অবজ্ঞা ক'রে দূরে ঠেলে দেয় বা পর ক'রে দেয় ভগবান তখন মুখ টিপে হাসেন। পরমপিতাকে না হ'লে যেমন মানুষের চলে না, মানুষকে না হ'লেও তেমনি মানুষের চলে না। আমরা সম্যক পরিশুদ্ধ নই, তাই পরস্পর-পরস্পরের দোষ হজম ক'রে নিয়ে চলা লাগে। তোমার দোষত্রুটি যদি কেউ না সয়-বয়, তাহ'লে তুমি দাঁড়াও কোথায় ?

রঞ্জন—কোন-কোন মানুষকে দেখা যায় কষ্টকে যেন কষ্ট মনে করে না, তার কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ অনিচ্ছাতে যা' করে বা সয়, তাতে কষ্ট হয়। ইচ্ছা ক'রে যা' করে বা সয়, তাতে অনেক কষ্ট হ'লেও কষ্টের বোধ কাবু করতে পারে কমই। ধর, গান শেখার প্রতি যদি তোমার ঝোঁক থাকে এবং তার জন্য যদি রোজ ৩ ঘণ্টা গলা-সাধার প্রয়োজন হয়, গলা-সাধার কষ্টটা তোমার কষ্ট ব'লেই মনে হবে না। বরং ঐ কষ্ট করার সুযোগ যদি তুমি না পাও, তাহলেই তোমার কষ্ট হবে।

একটি দাদা এসেছেন, তিনি ভাল শিকারী। কয়েকটি বড়-বড় বাঘ-ভাল্লুক শিকার করেছেন জীবনে। গল্পচ্ছলে সেই কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিংস্র প্রাণীকে না মেরে, তার হিংস্রতাকে যদি এমনভাবে নিয়োগ করা যায় যাতে লোকের উপকার হয়, তাহ'লে খুব ভাল হয়।

শরৎদা—তা' কি সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসম্ভব অনেক কিছুই সম্ভব হয়, যদি সেগুলি আমাদের গরজ হ'য়ে ওঠে। তখন আমরা সেইভাবে চিন্তা করি, চেষ্টা করি, মাথা ঘামাই আর পরমপিতার দয়ায় আমাদের মস্তিষ্ককোষ ভেদ ক'রে অভাবনীয় বুদ্ধি ও কৌশলের আবির্ভাব হয়।

শরৎদা—আমাদের দেশে মৃগয়া করার প্রথা ছিল কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষত্রিয়রা মৃগয়া করত to keep their martial spirit alive (তাদের সামরিক মনোভাব তাজা রাখবার জন্য)।

উপনয়ন-সংস্কার-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

মন্মথদা (দে)—আমি যদি উপনয়ন না নিই, অথচ সদাচার, নামধ্যান ইত্যাদি ঠিক রাখি, তাহ'লে ক্ষতি কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিহিতভাবে উপবীত-গ্রহণ আর্য্যদ্বিজদের একটা অবশ্য-পালনীয় বৈশিষ্ট্য-সম্মত আচার বা সংস্কার। আমরা যখন কোন মৌলিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কার বা আচারকে ignore (উপেক্ষা) করি, তখন অজ্ঞাতসারে অন্য সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্য, সংস্কার বা আচারকেও ignore (উপেক্ষা) করতে শুরু করি। ওতে চরিত্র ঢিলে হ'য়ে পড়ে।

অহিংসা-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিংসা হ'লো তাই যা' জীবনের স্থিতি ও প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক রচনাই অহিংসার কাজ। অধর্ম্মের প্রতিবিধান না করলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, অপ্রেমকে নিরস্ত না করলে প্রেমিক হওয়া যায় না।.........যারা ইচ্ছা-সহকারে ক্রমাগত অন্যায় করে তারা শয়তানের দ্বারা obsessed (অভিভূত), যারা তা' support (সমর্থন) করে, তারা হ'লো অন্যায়ের পোষণদাতা, শয়তানীর পালক-পিতা, আর যারা neutral (নিরপেক্ষ), তা'রা অন্যায়ের leaven (বীজ) বা culture medium (উদ্ভিন্নকারী মাধ্যম)-বিশেষ। ফলকথা, সক্রিয়ভাবে অসৎ-নিরোধী না হ'লে নিজেরই ধীরে-ধীরে অধোগতি হয়, চরিত্র ঐ রঙে রঙ্গিল হ'য়ে উঠতে থাকে। সত্তাপোষণী চলন ও অসৎ-নিরোধী পরাক্রম এই দ্বিমুখী অভিযান অব্যাহত থাকলে তবেই অক্ষত থাকা যায়। এই কলুষিত সমাজের মধ্যে থেকেও সমাজের কলুষেরও কিছু-কিছু অপনোদন করা যায়।

শরৎদা—যীশুখ্রীষ্ট তো অহিংস ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও দেখতে পাই—মন্দিরের চত্বরে ঢুকে দোকান-পাট বসিয়ে ব্যবসাদাররা মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করছে দেখে দোকানগুলি ওলট-পালট ক'রে দিয়ে তিনি কেমন ভীম-বিক্রমে চাবুক নিয়ে তাড়া করলেন তাদের। এটা করলেন পরমপিতার স্বার্থে। কিন্তু বিপদের সম্মুখীন হ'য়েও তিনি নিজেকে defend (রক্ষা) করতে চেষ্টা করেননি। তাঁকে যারা ভালবাসত তাদের তা' করা উচিত ছিল। তিনি পরমপিতার জন্য যে attitude (মনোভাব) নিয়েছিলেন, তাদের তাই করা উচিত ছিল।.........চৈতন্যদেবও জগাই-মাধাইয়ের উপর কেমন উগ্রভাব ধারণ ক'রে তাদের অন্তরে ত্রাস ও অনুতাপ জাগিয়ে তবে প্রেম দেখিয়ে তাদের অন্তর জয় করেছিলেন। তাদের উগ্রদম্ভ, দর্প ও প্রবৃত্তি-উন্মত্ততাকে স্তব্ধ না ক'রে, আয়ত্তে না এনে গোড়ায় প্রেম দেখাতে গেলে সে-প্রেম তারা ধরতে পারত না। হয়তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো।

একটি মা এসে আর-একজনের হৃদয়হীন ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আনুপূর্ব্বিক সব কথা আগ্রহ-সহকারে শুনলেন। তারপর সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—তোর খুব কষ্ট হয়েছে, তাই না ?

মা'টি বললেন—হ্যাঁ ! আমার প্রাণে বড় লেগেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই তো কারও মনে কোনদিন ব্যথা দিস্ না ?

উক্ত মা—চেষ্টা করি না দিতে। তবে মন-মেজাজ খারাপ থাকলে হঠাৎ কা'রও-কা'রও সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রে ফেলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্ব্যবহার ক'রে সুখ পাস্ ?

উক্ত মা—না ! মনটা খারাপ হ'য়ে যায়। অনুতাপ আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর মনে যখন অনুতাপ আসতে সুরু করেছে, তখন যদি অন্য লোকটা পাঁচ জায়গায় তোর নিন্দামন্দ ক'রে বেড়াতে থাকে, তখন মনের ভাব কেমন হয় ?

উক্ত মা—তখন অনুতাপের ভাবটা নষ্ট হ'য়ে যেতে থাকে এবং নিজের ব্যবহার সমর্থন করার বুদ্ধি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু লোকটা যদি নিন্দা না ক'রে তুই কোন্ অবস্থায় প'ড়ে কি কারণে অমনতর ব্যবহার করেছিস্, তা সহানুভূতির সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করে ও তোর দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও তোর সঙ্গে খুব প্রীতিপ্রদ ব্যবহার করে, তাহ'লে তোর মনের অবস্থা কেমন হয় ?

উক্ত মা—তেমন ব্যবহার তো কা'রও কাছ থেকে পাইনি। তবে ঐ রকম ব্যবহার পেলে সত্যিই বোধহয় তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে ওঠে এবং নিজের দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতাপ আরো বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোষ ক'রেও এমনতর ব্যবহার তাহ'লে তুই পেতে চাস্ ?

উক্ত মা—এটা কে না চায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তোর সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করেছে, তার সঙ্গে ঐ তোর নিজের চাহিদামত ব্যবহার করলে কেমন হয় ? আমার তো মনে হয়, ওতে নিজের লাভই সব থেকে বেশী হয়। কারণ, মানুষটা চিরতরে আপন হ'য়ে যায়। অবশ্য, সে দুষ্ট প্রকৃতির লোক হ'লে পরেও খারাপ করতে চেষ্টা করতে পারে। তবে নিজে সতর্ক থেকে সদ্ব্যবহার করতে পারলে প্রায়ই দেখা যায় মানুষটা শ্রদ্ধানত হ'য়ে ওঠে এবং তার হৃদয়ের উপর অনেকখানি আধিপত্য লাভ করা যায়। একটা মানুষের হৃদয় পাওয়া একটা মূল্যবান সম্পত্তি পাওয়ার থেকে অনেক বেশী লাভজনক ব্যাপার। একটা মানুষ সহায় থাকলে অসময়ে বিপদে-আপদে কত কাজে লাগে, তা'র কি কোন লেখাজোখা আছে ? তাই বলি, বেশ ক'রে খতিয়ে দেখো—তুমি কোন্ অবস্থায় কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর, এবং সেই দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের অবস্থা বিবেচনা ক'রে স্থান-কাল-পাত্র-অনুযায়ী বিহিত তৃপ্তিপ্রদ ব্যবহার ক'রো। এতে তুমি অনেকের শ্রদ্ধার ময়ূর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'তে পারবে। নিজের অন্তরের বিক্ষোভও বিদূরিত হবে বহুল পরিমাণে। তবে তুমি নিজে অমনতর ব্যবহার করলেও মানুষের কাছ থেকে অমনতর সুবিবেচনা পাওয়ার প্রত্যাশা রেখো না। এতে তৃপ্তির অধিকারী হবে অনেকখানি।

একটি দাদাকে (কায়স্থ) লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মনে রাখবেন আপনি ক্ষত্রিয়, কিন্তু ক্ষতক্রিয় নন। ক্ষতের থেকে ত্রাণকারক কিন্তু ক্ষতকারক নন। ক্ষাত্র তেজের নাম ক'রে মানুষকে যদি বিব্রত ও উদ্ব্যস্ত ক'রে তোলেন, তাতে কিন্তু কোন পৌরুষ নেই। শিবি হলেন ক্ষত্রিয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ক্ষত্রিয়ের কাছে আর্ত্ত মানুষ আশ্রয় পাবে, ভরসা পাবে, বুকে বল পাবে। আবার, দুষ্ট যে, সে তাকে দেখে ভয়ে কাঁপবে। ক্ষত্রিয় একাধারে হবে বীর ও কুটকৌশলী। ক্ষত্রিয় যদি একযোগে বল-ও-বুদ্ধি-সমন্বিত না হয়, তাহ'লে কিন্তু কাজ হাসিল হয় না। এই বুদ্ধি হওয়া চাই ইষ্টকৃষ্টি-অনুসারী। তাই রাজাকে বলে defender of faith (ধর্ম্মের রক্ষক)। বুদ্ধি আছে, বল আছে কিন্তু নিষ্ঠা নেই, ধর্ম্মবোধ নেই, স্বার্থান্ধতা ও মদমত্ততা প্রবল, সে কিন্তু ক্ষত্রিয় নামের যোগ্য নয়। তাকে দিয়ে ঢের অকাম হ'তে পারে। সব বর্ণের বেলায়ই এ-কথা খাটে। তাই, যে-কোন বর্ণের যে-কেউই হো'ক primary qualification of an individual (ব্যক্তির প্রাথমিক গুণ) হ'লো ইষ্টানুবর্ত্তিতা। এ-ছাড়া মানুষ dependable (নির্ভরযোগ্য) হয় না। মানুষগুলির ভিতর ঐ জিনিসটি থাকলেই তার উপর ভর ক'রে সমাজ প্রকৃত সমাজ হ'য়ে ওঠে, সমাজ মানে একসাথে সমান চলনায় চলে যারা। সমাজ হ'লো একটা inter-interested body of people, who are held together by Ideal-centric love and mutual active service (পারস্পরিক স্বার্থান্বিত জনগণের সংগঠন, যারা আদর্শকেন্দ্রিক প্রীতি এবং পারস্পরিক সক্রিয় সেবার বন্ধনে সম্বদ্ধ)।

প্রশ্ন—অনেককে দেখা যায় সৎ কিন্তু দুর্ব্বল। সৎলোক দুর্ব্বল হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যতখানি সৎ তার personality (ব্যক্তিত্ব) ততখানি integrated (সংহত) ও powerful (শক্তিমান), স্বভাবতঃই সে বিনীত, সেবাপ্রাণ ও অসৎ-নিরোধী। তাই, সৎলোকের তথাকথিত জলুস কম থাকলেও সে কিন্তু দুর্ব্বল নয়।

ইতিমধ্যে হাউজারম্যানদা এলেন।

যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব প্রমুখ মহাপুরুষগণের প্রসঙ্গ উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এঁরা ভালবাসা দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করেন জীবনের পথে, অমৃতের পথে, অভ্যুদয়ের পথে। এঁরাই দিয়ে যান জীবন-বৃদ্ধির নীতি, যার অনুসরণে মানুষের জীবন হয় সার্থক। এঁরাই হলেন law-giver (বিধি-প্রবক্তা)।

হাউজারম্যানদা—জীবনের নীতিবিধি তাঁরা যতই ব'লে যান না কেন, মানুষ যদি তা না মানে, তাহ'লে লাভ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য first and foremost thing is unrepelling adherence to the principle (প্রথম ও প্রধান জিনিস হ'লো আদর্শে অচ্যুত অনুরাগ)। তা' গেলে সব নষ্ট হ'য়ে গেল। Then devil is the law-giver (তখন শয়তানই বিধিপ্রবক্তা)।

হাউজারম্যানদা—আমরা আদর্শে অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে চলতে চাই, কিন্তু

মাঝে-মাঝেই তা' ব্যাহত হয়, এর থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নানা কারণে সম্বেগ কখনও শ্লথ, কখনও বা সবল হ'তে পারে। কিন্তু আদর্শাভিমুখী চলনটা যেন continuous (নিরবচ্ছিন্ন) থাকে। এই চলনের ক্রমাগতি যদি রুদ্ধ না হয়, তাহ'লে ভাবনা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন পেট ঠিক আছে তো ?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ। বড়দার বাড়ীতে সবাই খুব যত্ন করেন। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম না হ'লেই পেট ভাল থাকে।

গোয়ালপাড়ার জীবন বালতিতে ক'রে দুধ নিয়ে খরিদ্দারের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই লক্ষ্য ক'রে সহাস্যে বললেন—গোরস গলি-গলি ফিরে সুরা বৈঠল বিকায়।………তুলসীদাসের দোঁহাগুলি বড় চমৎকার। পুরো দোঁহাটা বল্‌তো দেখি।

পড়ে শোনান হ'লো—

সাচ কহে তো মারো লাঠ্ঠা
ঝুটা জগৎ ভুলায়।
গোরস গলি-গলি ফিরে
সুরা বৈঠল বিকায়।
সাধকো বাঁধে, চোরকো ছোড়ে
পথিক কো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরা তামাসা
দুখ লাগে আউর হাসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর খেলাচ্ছলে বার-বার তালে-তালে বলতে লাগলেন—

ধন্য কলিযুগ তেরা তামাসা
দুখ লাগে, আউর হাসি।

উঠছেন, তবু মুখে ঐ দোঁহা।

একটা আনন্দের আমেজ ছড়িয়ে গেল চতুর্দ্দিকে।

১৩ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ২৭।৩।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আমতলায় একখানি ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। অনেকেই উপস্থিত আছেন।

লক্ষ্মীনারায়ণদা সৎমন্ত্রের তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎমন্ত্র মানে তাই যার অনুশীলনে মানুষের বাঁচা-বাড়া অব্যাহত থাকে। সদ্‌গুরু হ'লেন সৎনামের প্রতীক। তাঁর প্রতি নিষ্ঠা চাই।

মূর্ত্ত সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে অন্যত্র দীক্ষা নেওয়া চলে না। সদ্‌গুরুকে গ্রহণ ক'রে তদনুগ চলনায় চলা চাই। তবেই নাম করা সার্থক হয়। সৎনামের সঙ্গে কোন নামের বিরোধ নেই। এতেই যা'-কিছু পরিপূরিত হয়। ধর্ম্ম এক, বাঁচা-বাড়া এক। বাইবেল, কোরাণ, বেদ, আপ্তবাক্য, শ্রুতি একই জিনিস—বিভিন্ন ভাষায় একই জিনিস। শব্দের উপাসনা বেদ, কোরাণ, বাইবেল সবটার মধ্যেই আছে। মূলে সব এক। যারা এটা খুলে দেবে, বারে-বারে ধরবে মানুষের কাছে, নিজেরাও সেই বোধের উপর দাঁড়িয়ে চলবে, তারাই নিয়ে আসবে স্বর্ণযুগ। ঐক্য আছেই। এককে পৃথক করে শয়তানি ক'রে। সেই শয়তানির নিরসন করতে হবে। যাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হ'য়ে ওঠে, তাই করতে হবে।

প্রশ্ন—এতো মন্ত্র কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-এক স্তরে এক-এক বীজ, দেবতা, ঋষি, ছন্দ, বিনিয়োগ ইত্যাদি সব আছে। সৎনাম চরম স্তরের দ্যোতক। তাঁর মধ্যে নীচের যা'-কিছু সংহৃত অবস্থায় থাকে। তাই, প্রাণ ভ'রে সৎনাম করলে স্তরে-স্তরে সব রকম অনুভূতিই সহজলভ্য হ'য়ে ওঠে। নামে ও কাজে ডুবে থাকতে হয়। শুধু নামেও হয় না, শুধু কাজেও হয় না। দুই-ই এক সঙ্গে চালাতে হয়।

জড় ও চৈতন্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা'-কিছু সবই চৈতন্য। অচৈতন্যের সত্তা নেইকো। চিৎ ছাড়া সত্তাই নেই। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত চৈতন্যময়। জড় মানে কম চৈতন্যওয়ালা, জড় কথাটা relative (আপেক্ষিক) অর্থাৎ তুলনামূলক। পাথরে, গাছে, গরুতে মানুষে যেখানে যা'তে যতটুকু চৈতন্য থাকার তাই আছে। গরু-মানুষ, পাথর-মানুষ, ঘোড়া-মানুষ, এই কথা এসে দাঁড়ায়। যা'-কিছু সৃষ্টি সৎ, চিৎ ও আনন্দের বিগ্রহ। একটা বালুকণা পর্য্যন্ত ঐ লক্ষণাক্রান্ত। প্রকৃত বোধ ও জ্ঞান যার হয়, তার কাছেই এটা প্রতিভাত হয়। বৈশিষ্ট্যের ও ঐক্যের বোধ ও জ্ঞান একসঙ্গে যেখানে থাকে, সেখানেই পূর্ণ বোধ ও জ্ঞানের উদয় হয়। নিজ সত্তাকে যখন আমরা ভাল ক'রে জানি, তখন সেই দাঁড়ায় যা'-কিছুকে জানতে পারি। এই সত্তাকে জানার জন্যই সদ্‌গুরুতে অনুরক্ত হ'তে হয়। ভক্তি না হ'লে জ্ঞান হয় না। ভক্তি, জ্ঞান যা'-কিছু সত্তা-সম্বর্দ্ধনার জন্য। সত্তার মধ্যে আছে নিজেকে রক্ষা করা, পালন করা ও প্রসৃষ্ট করার আকুতি। এই আকুতি যদি গুরুভক্তির সঙ্গে সঙ্গতিশীল না হয়, সেখানেই আসে deviation (বিচ্যুতি)। মানুষ প্রবৃত্তির পাল্লায় প'ড়ে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়। ওকেই বলে মায়া-মোহের বিভ্রান্তি। মানুষ বিয়ে করুক, সংসার করুক কোনটাই তা'র ভক্তি ও জ্ঞানের অন্তরায় হয় না, বন্ধতার কারণ হয় না, যদি সে গুরুগত প্রাণ হয়, গুরুর জন্য তার সংসার হয়। আমি বুঝি—নরের নারীর প্রয়োজন মুক্তি পাওয়ার জন্য,

নারীর নরের প্রয়োজন মূর্ত্তি দেওয়ার জন্য। বিহিত দাম্পত্য-জীবন যাপনের ফলে প্রতিটি জাতক যদি ইষ্টানুগ মূর্চ্ছনা নিয়ে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, সেখানেই সার্থক হয় নর-নারীর মিলন। এমনি ক'রেই সমাজ চৈতন্যদীপ্ত হ'য়ে সম্বর্দ্ধনী চলায় চলে। আধার যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে চেতন চলন পদে-পদে বাধাগ্রস্ত হয়, প্রবৃত্তির জড়তা ঘিরে ধরে তাকে।

১৯শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ২। ৪। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর আমতলায় এসে বসেছেন। অজয়ের সিংদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—True Ritwiks are psycho-fighters (সত্যিকার ঋত্বিক্‌রা হ'লো মনোজগতের যোদ্ধা)। তাদের কাজ হ'লো মানুষের ভুল চলনা, ভুল চিন্তা ও ভুল ধারণা সংশোধন ক'রে মানস-পরিশুদ্ধির ভিতর-দিয়ে তাদের সুস্থ ও সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তোলা। এই করতে হলে চাই ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে নিজেদের প্রবৃত্তিকে জয় করা। সর্ব্বদা সজাগ হ'য়ে তারা আত্মজয়ের সংগ্রামে রত থাকে এবং এইভাবেই জীবনে জয়ী হয়। তাদের সক্রিয় চেষ্টায় অপরের ভিতরও এই প্রবণতা সঞ্চারিত হয়। এই সঞ্চারণাই যাজন। শ্রীকৃষ্ণের দু'টি জিনিস ছিল। একটি ঋত্বিক্‌-সংঘ আর-একটি নারায়ণী সেনা। লোকহিতের জন্য যাজনও চাই আবার সঙ্গে-সঙ্গে চাই অসৎ-নিরোধী ব্যবস্থাপনা।

প্রফুল্ল—পরবর্ত্তীকালে অবতার-মহাপুরুষ যাঁরা আসেন, তাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তী অবতার-মহাপুরুষদের রচিত সংঘের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তা'র সংশোধন না ক'রে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি চান মানুষ, তিনি চান জীবন, এবং তাঁকে যারা চায়, তারা যে যেখানে যে-সংঘ বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই থাক, তাঁর কাছে আসেই। তিনি আলগা থাকাতেই, যা'রা চায়, তাদের আসবার পথ খোলা থাকে। তিনি দল, মত, সংঘ বা সম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধে। তিনি সবার।

প্রফুল্ল—পরবর্ত্তী যদি সর্ব্বত্র তাঁর ভক্ত ও পরিবেষক পাঠাতে না পারেন, তবে তৎকামী ভক্ত পৃথিবীর যেখানেই যিনি থাকুন না কেন, প্রত্যেকেই কি তাঁর সন্ধান পান ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের মধ্যে aerial (বেতারবার্ত্তা সংগ্রহ করার যন্ত্র) আছে, তারাই পায়। অন্তরে আগ্রহ থাকলে খুঁজতে থাকে, তাতে ভিতরেও নানা রকমের সাড়া পায়, বাইরেও অভাবনীয়ভাবে যোগাযোগ হ'য়ে যায়। মানুষের মস্তিষ্ক হ'লো সূক্ষ্মতম যন্ত্র, যার যেমনতর tuning (একতানতা), সে তেমনতর সাড়াই পেয়ে থাকে।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ২৮। ৫। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়ালের প্রাঙ্গণে বসেছেন। ক্যাপেলদা, আউটারব্রিজদা, হাউজারম্যানদা এবং আশ্রমের দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সমস্ত মহাপুরুষদের মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁদের লোক-লালসা অসীম। তাঁরা পেতে চান মানুষ। মানুষকে ধ'রে-ধ'রে প্রত্যেকটি মানুষের ভাল করাই তাঁদের প্রধান স্বার্থ। তাই, অবতার-মহাপুরুষদের মধ্যে কখনও ভেদ করতে নেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সবাই এক।

কেষ্টদা মহাবীরের একখানি ছবি এনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে বললেন—এইটে রেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—বেশ করেছেন। চোখের সামনে রেখে দেবেন।

একটু পরে হেসে বললেন—দেখেন কালের কী প্রভাব। হয়তো হনুমানু লেজা নিয়ে ঘুরতো, তা' বাদ প'ড়ে লেজ হয়েছে।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৯। ৫। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বাইরে বসেছেন। সুধাংশুদা (মৈত্র), সুরেনদা (সেন), বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়), রাধারমণদা (জোয়ার্দার), যতীনদা (দাস), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), গোপেনদা (রায়), হাউজারম্যানদা, ক্যাপেলদা, আউটারব্রিজদা প্রমুখ কাছে আছেন।

ক্যাপেলদা জিজ্ঞাসা করলেন—ঈশ্বর কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি প্রেম-স্বরূপ, দয়া-স্বরূপ, সৎ-স্বরূপ। তাঁর অস্তিত্বের উপর দাঁড়িয়েই যা'-কিছু অস্তিত্ববান। তিনি আছেন বলেই যা'-কিছু আছে। তিনিই ধ'রে আছেন, রক্ষা করছেন, পালন করছেন—অন্তর-বাহিরের শক্তিরূপে তাই সৃষ্টি টিকে আছে।

হাউজারম্যানদা—তাঁকে জানা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Christ (যীশুখ্রীষ্ট)-কে জানলেই তাঁকে জানা হয়।

হাউজারম্যানদা—বিশ্বাস হয় কেমন করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস ক'রেই বিশ্বাস হয়। পরমপিতা এটা দিয়েই রেখেছেন। যীশুকে ভালবাস, তার ভিতর-দিয়েই তাঁর উপর বিশ্বাস আসবে। ভালবাসলে যা' করে, অন্ততঃ নাটকীয় ভঙ্গীতেও তা' করতে থাক, সব এসে যাবে।

হাউজারম্যানদা—এটা কি কপটতা নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কপটতা হয় যদি উদ্দেশ্য ও করা বিমুখী হয়। ভালবাসার

আগ্রহ যদি থাকে এবং সেই আগ্রহকে পুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তুমি যদি যা' করণীয়, তা' করতে থাক, তাহ'লে কপটতা হবে কেন ?

ভাবীর সাথে না করলে ভাব
অভাব যাবে কিসে ?
সব চাওয়াটাই ভাবহারা তোর
তাইতো হারা দিশে।

অভাব মানে যেখানে আমার করার ভিতর-দিয়ে হওয়া হয়নি। তাই ভাবের মূর্ত্ত বিগ্রহ যিনি, তাঁকে ভালবেসে অভ্যাস, ব্যবহার বদলিয়ে তাঁর মনোজ্ঞ হ'য়ে না উঠলে অভাব যাবে না অর্থাৎ হওয়া হবে না।

যতীনদা—এর ভিতর-দিয়ে কি অর্থাভাব দূর হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থাভাব মানে তো আমি বুঝি যেমনতর হ'লে অর্থ পাওয়া যায়, তেমনতর না-হওয়া। এর পিছনেও আছে চরিত্র, অভ্যাস, ব্যবহার ইত্যাদি। কিন্তু চরিত্র, অভ্যাস, ব্যবহার ইত্যাদিকে যদি আপনি প্রেষ্ঠানুগ ক'রে তোলেন, আপনি যদি তাঁরই হন, মানুষের পক্ষে আপনি আপনার মত ক'রে যে অনেকখানি উপাদেয় ও উপকারী হ'য়ে উঠবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অমনতর মেকদার যদি আপনার থাকে, আপনার অনটন থাকতেই পারে না। জানবেন—ইষ্টানুগ হয়ে ওঠাটাই সর্ব্বপ্রকার অভাবের বজ্রকপাট। তাঁর প্রতি সক্রিয় ভাব-ভালবাসায় মন যার ভরপুর, অভাববোধেও তার মনকে পীড়া দিতে পারে কমই। নইলে মানুষের চাহিদারও অন্ত থাকে না, অভাবেরও অন্ত থাকে না।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে বললেন—আপনি কলকাতায় যাবেন, গাড়ী কিন্তু দু'খানা চাই। একদিন হয়তো গাড়ী ক'রেই চ'লে আসলেন ক্যাপেলকে নিয়ে। গাড়ী হ'লে কাজ খুব এগিয়ে যাবে। মানুষের দরজায়-দরজায় দেবদূতের মত যেয়ে হানা দেবেন।

আশ্রমের একজন কর্ম্মী অভাব-অভিযোগের দরুন বাইরে গিয়ে কাজকর্ম্ম ক'রে জীবিকা-অর্জ্জন করতে চান। আর-একজনের মুখে সেই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তার থাকাটা নির্ভর করছিল কিসের উপর ভেবে দেখ। চাতকপাখী নাকি মেঘের জল ছাড়া অন্য কোন জল খায় না। ডেকে-ডেকে ম'রে যায়, তবু অন্য জল খায় না। যারা মেঘের জলের কমতি হলেই মাঠের জল খোঁজে, তাদের আর কি কথা ? বাপ ভাল ক'রে খেতে দিতে পারল না ব'লে আর-একজনকে বাপের আসনে বসাব, তার তো কোন মানে হয় না।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ৩০। ৫। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়ালের বারান্দায় ব'সে আছেন। খেপুদা, কালিদাসদা (মজুমদার), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), বিশুভাই

(মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাজকর্ম্ম-সম্পর্কে বললেন—তাড়াতাড়ি এক লাখ, দেড় লাখ দীক্ষা দিয়ে ফেল, তাদের খুব ক'রে infuse (উদ্বুদ্ধ) কর, তারা যত পারে যাজন করুক, ইষ্টভৃতি বাড়িয়ে দিক, নামধ্যানও চালাক জোরসে। সঙ্গে-সঙ্গে প'চিশ হাজার যোগ-অর্ঘ্যকারী জোগাড় ক'রে ফেল। যেমন ক'রে হো'ক এটা করাই চাই। এমনভাবে লাগতে হবে যাতে কিছুতেই ফস্কে না যায়। তিন মাসে না হো'ক, ছ' মাসে হবে। খাটলেই হবে। পারাটা করার সঙ্গে জড়ান আছে।

সুরেনদা (বিশ্বাস) তাঁর অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে বললেন যে, চেষ্টার উপর থাকলে যোগ-অর্ঘ্য করতে বাধে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লাস-সহকারে বললেন—ঐ দেখ, গাঁট খুলে যাচ্ছে। দেখবে—তোমার আগ্রহ তোমাকে টেনে কত লম্বা ক'রে ফেলবে। মানুষ যে কতখানি পারে, তা' সে জানে না। ইষ্টনেশায় মাতাল হ'য়ে উঠলে, মানুষ অসম্ভব সম্ভব ক'রে ফেলতে পারে। তোমরা যখনই লাগার মত ক'রে লাগ, তখনই ঠিক পাও। কিন্তু নানান পিছটানে তোমাদের চলার বেগটা স্তিমিত হ'য়ে পড়ে। টাকার নেশা, বউয়ের নেশা, আরামের নেশা, খাওয়ার নেশা—এইরকম এক-এক খাদে প'ড়ে মানুষ খাবি খায়। নইলে না-পারার কোন কারণ নেই। 'নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ'। একটা বাধা হয় শরীর। শরীরের দরুন অনেকে পেরে ওঠে না। কিন্তু তাও ঠিক ক'রে নেওয়া যায়। প্রফুল্লর হয়তো শরীর খারাপ। ও যদি বাইরে যায় এমনভাবে চলবে যাতে শরীরও ভাল থাকে, কাজও চালাতে পারে। নিজের habit (অভ্যাস)-ই adjust (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে নেবে সেইভাবে। ইষ্টনেশা থাকলে মানুষ ঐভাবেই নিজেকে গ'ড়ে তোলে deficiency (খাঁকতি) make up (পূরণ) ক'রে তোলে।

যশোহরের একটি দাদা দারুণ দুঃখ-কষ্ট ও হতাশার কথা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দুঃখের উপর অত ভালবাসা কেন? দুর্ভাগ্য-বিলাসী হওয়া ভাল নয়, ওতে দুর্ভাগ্য ঘোচে না। যত কষ্টই আসুক, তাকে আমল না দিয়ে, তাতে মুহ্যমান না হ'য়ে যা' করার তা' জোর ক'রে করতে থাক। তোমার করাটাই তরিয়ে দেবে তোমাকে। দুঃখের চিন্তায় নিমজ্জিত না থেকে, নিজের ও পরের ভাল যাতে হয়, তেমনতর করার মধ্যে নিমজ্জিত রাখ নিজেকে। দেখতে-দেখতে সব ফর্সা হ'য়ে যাবে।

কথাগুলি শুনতে-শুনতে দাদাটির মুখখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

দাদাটি বললেন—মাঝে-মাঝে বড় ভয় হয়, বড় ঘাবড়ে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ধমকের সুরে)—আবার ঐ কথা? ঐ কথা ভাববিও না, উচ্চারণও করবি না। মরদের মত লা'গে যা।

পরক্ষণে দরদমাখা কণ্ঠে বললেন—আমি তোদের উপর কত আশা রাখি।

তোরা কত অনাশ্রিতের আশ্রয় হ'য়ে দাঁড়াবি। তোদের কি এইভাবে অবসন্ন হ'য়ে থাকা শোভা পায়?

দাদাটি দীপ্ত ভঙ্গীতে বললেন—আপনার দয়ায় ঠিক পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসিমুখে)—তাই, ঠিক থাকে যেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ১।৬।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়ালের বারান্দায় বসেছেন। দুলালদা (নাথ), কেশবদা (রায়) এবং আরো কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁর কাছে এসেছেন।

কেশবদা—আমাদের এখন কোন্ দিকে লক্ষ্য দিয়ে চলতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের চাই ধর্ম্ম, আদর্শ, ঐক্য, সংহতি ও সম্বর্দ্ধনা। সেই পথেই চলতে হবে যাতে বাঁচার পথ অবাধ হয়, মরণের পথ রুদ্ধ হয়। ভগবদনুসরণই জীবনের পথ। তাঁকে মানি অথচ তাঁর পথে যদি না চলি, তবে তাঁকে মানা হবে না। তাই চাই দীক্ষাকে এস্তার ক'রে তোলা।

একটি দাদা বললেন—অনেকে দীক্ষা নিতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে সে জীবনই চায় না। মানুষের জীবনের আসল সম্পদ্ হ'লো সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর প্রতি unrepelling adherence (অচ্যুত অনুরাগ) নিয়ে চলা। সৎদীক্ষা নিতে objection (আপত্তি) থাকে তখনই যখন আমরা প্রবৃত্তির অনুচর হই। অমৃতে অরুচি হয় তখনই, যখন আমরা মৃত্যুকে ভালবাসি।

আমার কথা হ'লো—এস, ধর, কর, আজ বড় দুঃসময়। এখনও যদি তাচ্ছিল্য কর, লাঞ্ছিত হবে। যদি প্রাণ থাকে, রক্ত থাকে, পিতৃপুরুষের সম্বল থাকে এতটুকু, এই লহমায় এখনই ঝাঁপ দাও, বড় দুঃসময়, এমন দুঃসময় আর আসেনি। এখনও দেরী করলে পাতিত্যের চরম হবে। আমি বলি—হিন্দু কি দুনিয়ার এমনই বোঝা তার বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই? তার কি কিছু দেবার নেই জগতে? কে আছে এই হিন্দুর? কে তাকে ধ'রে তুলবে? কে তাকে বলবে?—তোমরা, বাঁচ, তোমরা উন্নত হও, তোমরা আদর্শপরায়ণ হও। কে তাকে হাত ধ'রে চালিয়ে নিয়ে উপনীত ক'রে দেবে মহাগৌরবের শিখরে? হিন্দু যদি বাঁচে, সে শুধু একলা বাঁচবে না। সবার বাঁচার পথ ক'রে দেবে সে। এই তার চিরন্তন ঐতিহ্য। নেতারা তাঁদের বুদ্ধিমত প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেই চেষ্টা ভগবৎ-নীতির পথে নয়। তাই, কাজের বড় একটা কিছু হচ্ছে না। তাই বলি—কেউ যখন পাশে এসে দাঁড়ালো না, আমরাই ভগবানকে ধরি, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে integrated (সংহত) হ'য়ে উঠি, নিজেরাও বাঁচি,

সকলের বাঁচার পথও পরিষ্কার ক'রে তুলি। আমরা কাউকে মারতে চাই না, তবে শয়তানির নিরসন চাই।

তাই বেশী ঢাকঢোল না পিটিয়ে হরদম initiates (দীক্ষিত) বাড়ান লাগে। যত বেশী মানুষ আদর্শপরায়ণ হবে, শয়তানের আধিপত্য তত শিথিল হবে, ভিতরে-ভিতরে ক্ষয়ে যাবে। পদ্মার ভাঙ্গনের মত, ভিতরে খেয়ে যায়, বাইরে ঠিক থাকে। উপর থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু একদিন ধপাস ক'রে ভেঙ্গে পড়ে। আমরা চাই ভগবিধি অনুযায়ী সব গ'ড়ে উঠুক। এই গড়নের মধ্যেই আছে উল্টো যা' তার ভাঙ্গন। এই সংগঠনের মূল হ'লো দীক্ষা। Initiation is the root of organisation, otherwise organisation is false (সংগঠনের মূল জিনিস দীক্ষা, নইলে সে-সংগঠন মিথ্যা)।

প্রশ্ন—দীক্ষা না নিয়ে এমনি যদি মেনে চলে, তাহ'লে হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে অনেক ফাঁক থাকে, তার উপর rely (নির্ভর) করা যায় না। Married wife (বিবাহিত স্ত্রী) ও kept (রক্ষিতা)-এর মধ্যে যতখানি ফারাক, initiated (দীক্ষিত) ও admirer (গুণগ্রাহী)-এর মধ্যে ফারাক প্রায় ততখানি। একটা বাজে মানুষও যদি সৎ-দীক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে সেই চলনে চলে, তার ভিত যতখানি শক্ত হয়, একজন গুণী মানুষ যদি আদর্শে দীক্ষিত না হ'য়ে উপরসা তাঁর প্রশংসা নিয়ে চলে, তার ভিত কিন্তু সে তুলনায় অনেকখানি কাঁচা থেকে যায়। রাজার মাথায় মহামূল্য মুকুট থাকে, গরুর মাথায় সামান্য শিং থাকে। আত্মরক্ষার ব্যাপারে কোন্‌টা বেশী মূল্যবান? কোন্‌টা বেশী শক্তিমান? তাই, জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে নিজেকে যে অচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধ ক'রে তোলে, সেই লাভবান হয়।

দক্ষিণা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি রাস্তায় চললে-চলতে তখনই যদি গুরু পাই, আর সঙ্গে আর কিছু না থাকলে আমার গায়ের জামাটা খুলে যদি দক্ষিণা দেই, তাতেই হয়, আমার কাছে আর কিছু নেই, রুমালটা আছে, তাই দিলাম—প্রাণ থেকে যা' দেওয়া যায়, তাই দক্ষিণা। তবে দক্ষিণা দেওয়ার বেলায় সাধ্যকে সঙ্কুচিত করতে নেই। প্রাণখুলে দেওয়াই ভাল। আর, এইটে বোধে আনা চাই যে, আমার যা'-কিছু সবই গুরুর—তন-মন-ধন সবই তাঁর।

কেশবদা—সবাইকেই কি দীক্ষা দেওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কা'রও আন্তরিক টান যদি হয়, কেউ যদি নাম চায়, তাকে দীক্ষা না দেওয়া পাপ। কারণ, হিন্দুরা এটাকে elixir of life (জীবনের অমৃত) ব'লে মনে করে।

কেশবদা—সবাইকে নিয়ে কি চলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ different type (নানা ধরণ)-এর। কাউকে বাদ

দেওয়ার জো নেই। হিসেব ক'রে প্রত্যেককে যথাযথ স্থানে লাগিয়ে তাকে useful (কাজের উপযোগী) ক'রে তুলে, একটা system (বিধান) গ'ড়ে তোলা যায়। ওর মধ্যে সবই লাগে। মানুষ যদি treacherous (বিশ্বাসঘাতক) না হয়, তার যোগ্যতা যত কমই থাক, তাকে কাজে লাগাতে অসুবিধা হয় না। নিজের অভ্যাস এমন ক'রে তুলতে হয় যাতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক তোমার কাছে shelter (আশ্রয়) পায়। তাহ'লেই লোককে দানা বেঁধে তোলা যায়।

কেশবদা—অনেককে দেখা যায় সাংসারিক উন্নতি করতে গিয়ে ওর মধ্যেই একেবারে জড়িয়ে পড়ে। অন্য কোন দিকে আর মন দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Unrepelling attachment to the Ideal (ইষ্টে অচ্যুত অনুরাগ) না-থাকলে সবই হাউইবাজীর মত হয়। উন্নতি steady (স্থায়ী) হয় না। নিজের চরিত্রের ভিতর অসামঞ্জস্য দেখা দেয়, তাতে সব দিককার সামঞ্জস্য ক'রে চলতে পারে না। একদিক সামলাতে গিয়ে আর-একদিক বেসামাল ক'রে ফেলে। আমার কথা হ'লো—First be initiated, come unto me, do accordingly and everything will be added unto you (প্রথমে দীক্ষিত হও। আমার কাছে এস। সেইভাবে কর এবং সবই তুমি পাবে।)

প্যারীদা—পরিস্থিতি কেমন যেন বিভ্রান্ত ক'রে দিতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিস্থিতি তোমাকে তার মত করতে চেষ্টা করবে। তোমার বৈশিষ্ট্য হ'লো তাকে তোমার সহায়ক ক'রে নেওয়া। দম্ভ, ঘৃণা, অহমিকা, দ্বেষ, লজ্জা, ক্রোধ এসে চেষ্টা করবে তোমাকে আত্মসাৎ করতে। তোমার কাজ হ'লো তাদের ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন ক'রে তোলা। আর সেই তোমার পুরুষকার। প্রতিমুহূর্ত্তে সজাগ হ'য়ে এইভাবে চলাকেই বলে ধর্ম্মাচরণ। তাই ধর্ম্মাচরণের মূল হ'লো ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণ।

রাষ্ট্র ও জাতীয়-সংহতি সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে পাঁচ লাখ লোক initiate ক'রে (দীক্ষা দিয়ে), integrate (সংহত) ক'রে, assemble (সম্মিলিত) করিয়ে প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পোষণ দিয়ে পারস্পরিকতার ভিত্তিতে যদি একটা আদর্শ যৌথ পরিবারের মত গ'ড়ে তুলতে পার—বাঁচা-বাড়ার জন্য যা'-যা' লাগে তা'র সুষ্ঠু ও সর্ব্বাঙ্গীণ সমাবেশ ক'রে, অসৎ-নিরোধে তৎপর থেকে, তাহ'লে তা' দেখে মানুষ আঁচ পেতে পারে—একটা ideal state (আদর্শ রাষ্ট্র) কেমন হওয়া উচিত। বৈশিষ্ট্যপোষণী ধর্ম্মই হ'লো state (রাষ্ট্র)-এর stay (স্থিতি)। তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নেইকো। ধর্ম্ম হ'লো তেমনতর চলন যাতে মানুষ পরিবেশকে নিয়ে বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে। তার জন্য লাগে আদর্শ। প্রকৃত আদর্শ যিনি, পূর্ব্বতনদের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ তো থাকেই না, বরং থাকে পরিপূরণ। তাই তাঁর কাছে

সাম্প্রদায়িকতা ঠাঁই পায় না, বরং সব সম্প্রদায়ের, সব দলের লোকই একগাট্টা হ'য়ে ওঠে তাঁকে অবলম্বন ক'রে।

স্থানীয় একজন নবদীক্ষিত দাদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানে রোজ এসে আলাপ-আলোচনা ক'রে ideology (ভাবধারা)-র সঙ্গে conversant (পরিচিত) হওয়া লাগে। অনেক কাজ সামনে। তাড়াতাড়ি equipped (প্রস্তুত) হ'য়ে নেও। যত লহমা দেরী করবে, তত পারাটা না-পারার দিকে গড়াবে।

অদৃষ্ট-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অদৃষ্ট মানে আমার স্বকৃত কর্ম্মের ফল যা' আমার দেখা ও জানার বাইরে আছে। প্রত্যক্ষ যা' তা'র সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে আমি যদি সুপটু হই, তাহ'লে অপ্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে আমার ভাবনার কিছু নেই। এক পুকুরে যে সাঁতার কাটতে পারে, অন্য পুকুরে গেলে সে ডুবে যায় না।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ১২।৬।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় এসে বসেছেন। তাঁর দিব্য তনু যেন শান্তি, প্রীতি ও আনন্দের অমৃতধারায় অভিষিক্ত। তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালে রোগ-শোক-দুঃখ-পীড়িত, বিষয়-বাসনামত্ত চঞ্চল মন আপনা থেকেই যেন ধীর, স্থির ও শান্ত হ'য়ে আসে। প্রাণ পরিতৃপ্ত ও পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। হৃদয়ভার অপসৃত হ'য়ে অত্যন্ত হাল্কা ও মুক্ত মনে হয় নিজেকে। তাই ভক্তবৃন্দ তাঁর সান্নিধ্যে ব'সে আনন্দমকরন্দ পানে বিভোর। এমন সময় বালীগঞ্জের একজন ডাক্তার আসলেন তাঁর কাছে। তিনি প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরম প্রীতিভরে আলাপ করতে লাগলেন।

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন—ধর্ম্মজীবন ও বাস্তব সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সমন্বয় কেমন ক'রে হ'তে পারে? অনেকে তো অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য কম্যুনিজমের পক্ষপাতী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মজীবনের মধ্যেই জীবনের সব দিককার সব প্রয়োজনের সমাধান নিহিত আছে। ধর্ম্ম মানে পরিবেশকে নিয়ে বাঁচা-বাড়া। তার জন্য চাই কর্ম্ম। প্রত্যেকের কর্ম্ম আবার হবে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। সেইজন্য আমাদের সমাজে বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী grouping (বিভাগ) ছিল। কিন্তু এই group (বিভাগ)-গুলি ছিল inter-interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) ও inter-related (পরস্পর সম্বন্ধান্বিত)। প্রত্যেকে জানত কাউকে বাদ দিয়ে কা'রও চলে না। এই বোধটা জাগ্রত থাকত আদর্শনিষ্ঠার দরুন। আদর্শ না থাকলে মানুষ ভ্রান্তির মধ্যে প'ড়ে যায়। প্রকৃত স্বার্থ-সম্বন্ধে চেতনা থাকে না।

দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হ'য়ে যায়। তাই, আদর্শমুখী হ'য়ে পরিবেশকে নিয়ে বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সক্রিয়ভাবে কল্যাণের পথে এগিয়ে চলাই ছিল আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কার। এতে ছিল না স্বার্থ-সংঘাত, ছিল না ঘৃণা-বিদ্বেষ, ছিল না বৃত্তি-অপহরণ, ছিল না বেকার-সমস্যা। কম্যুনিজম কা'কে কয়, তা তো আমি জানি না। কিন্তু আমি যা' ক'লাম, তার থেকে ভাল ব্যবস্থা কী হ'তে পারে, তা' তো আমি বুঝি না। গোলমাল হয় তখনই, যখনই আমরা আদর্শকে না মেনে প্রবৃত্তির অধীন হই। আদর্শ বলতে আমি বুঝি একজন মানুষ—যাঁর করা, বলা ও ভাবার মধ্যে পরিপূর্ণ সত্তাসম্বর্ধনী সমন্বয় সংঘটিত হয়েছে। তাঁকে গ্রহণ করা চাই, অনুসরণ করা চাই। তাকেই বলে দীক্ষা। আজ আদর্শের ধার ধারা নেই, দীক্ষা নেই, habits, behaviour (অভ্যাস, ব্যবহার) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা নেই, কি দিয়ে কি হবে? ওসব কথা বললে বলবে সনাতনী। যাই বলুক, বিধিকে বাদ দিয়ে তো কিছু হয় না। আর একটা কথা, আমাদের সেই আদর্শকেই গ্রহণ করতে হবে, যাঁর মধ্যে পূর্ব্বতনদের fulfilment (পরিপূরণ) আছে। ভেদ সৃষ্টি করেন যিনি, তিনি কখনও প্রকৃত আদর্শ নন।

ডাক্তারবাবু—বাংলাদেশ আজ নানা সমস্যায় নিষ্পেষিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্ত সমস্যা একটা সমস্যা। আমি তো ভাবনার কোন কারণ দেখি না। এই দুর্দ্দিনে পরমপিতার আশীর্ব্বাদ-অনুগ্রহ আপনাদের সামনে হাজির। করুন, achieve (লাভ) করুন। ঘুরে-ঘুরে মানুষকে চাঙ্গা করুন, fire up (উৎসাহ-দীপ্ত) করুন, convince (প্রত্যয়দীপ্ত) করুন, infuse (উদ্দীপ্ত) করুন।

একটি দাদা বললেন—আমি খুব কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইসবগুল এ-বেলা ৪ চামচ, ও-বেলা ৪ চামচ—এইরকম ক'রে খেয়ে দেখতে পার।

এরপর ডাক্তারবাবু তাঁর ব্যক্তিগত কয়েকটি কথা ব'লে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় ফরিদপুরের কয়েকটি ভাইকে বললেন—আদর্শই হ'লেন ধর্ম্মের পথ। ধর্ম্ম আচরণ করতে গেলেই সদ্‌গুরু বা আদর্শের প্রয়োজন। সদ্‌গুরু পেলেই দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। যত লোক দীক্ষিত হয়, তারা ঐক্যসম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠে। দীক্ষা বেশী হ'লে ঐক্য ও সংহতি প্রবল হয়। প্রবল সংহতি থেকে আসে শক্তির প্রবলতা। শক্তির প্রবলতা আনে বিপুল ও ব্যাপক সম্বর্দ্ধনা।

হরেনদা (বসু)—বিপ্রের ব্যবসায় করা কি অন্যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবসায় বৈশ্যের কাজ। তবে বিপ্রের পক্ষে শূদ্রবৃত্তি অর্থাৎ চাকুরী থেকে ব্যবসায় ভাল—মন্দের ভাল—আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে। উপজীবিকা মানে সেই কর্ম্ম, যার উপর দাঁড়িয়ে প্রাণন বা জীবনধারণ অবাধ হয়। তা' হ'তে

গেলেই কর্ম্মটা হওয়া চাই বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। বিপ্রের হ'লো উঞ্ছবৃত্তি, মানুষের প্রাণ উপচান শ্রদ্ধার দানের উপর বাঁচা। লোকসেবাই তাদের কর্ম্ম। এর মধ্যে কোন contract (চুক্তি) নেই যে আমি তোমার জন্য এই করব, তুমি আমাকে এই দিবে। স্বতঃদায়িত্বে অপ্রত্যাশী হ'য়ে মানুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনার সেবা করলে মানুষ আপনা থেকেই দেয়। এমনতর অর্জ্জনপটুতাকেই বলে ক্ষমতা। এই ক্ষমতা যার যত বেশী, সে তত বেশী মানুষের object of interest (স্বার্থকেন্দ্র) হ'য়ে ওঠে। ঐ তারা হয় তার সম্পদ্। এমনি ক'রেই ব্যক্তিত্ব বিশাল ও ব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠে। আমার মনে হয় বাঁধাধরা চাকরী করলে ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব হয়। নিজের পায় দাঁড়াবার মত বিশ্বাস গজায় না। এই দুর্ব্বলতা আবার অনেক সময় ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়।

এরপর কাজকর্ম্ম-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Individual (ব্যক্তিগত) যাজনের উপর দিয়ে যত কাজ হয়, ততই ভাল। বেশী হৈ-চৈ করা ভাল নয়। লেগে-বেঁধে এখনই কয়েক লক্ষ লোক দীক্ষিত ক'রে তোলা লাগে। এতটুকু যদি materialise (বাস্তবায়িত) করতে না পারি, তাহ'লে কীই বা আমাদের মেকদার, আর কীই বা আমরা পেতে পারি ?

অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন্ অবস্থার মধ্যে প'ড়ে রঘুনন্দন অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন, তা' জানি না, তবে হিন্দুসমাজের পক্ষে এর ফল যে ভাল হয়েছে, তা' মনে হয় না। এতে সমাজ বাড়তির দিকে যেতে পারেনি, বরং শীর্ণ হয়েছে। অনুলোমের প্রচলন থাকলে বাইরের অনেকেও সমাজের অঙ্গীভূত হ'য়ে যেত। আজকের মত এমন অবস্থা দাঁড়াত না।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ১৩।৬।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একখানি ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। কাছে অনেকেই আছেন। সবার চোখে-মুখে যেন একটা নিবিড় ভালবাসা ও ভাল-লাগার আলো জ্বলজ্বল ক'রে ফুটে আছে। এই আবহাওয়ায় আস্‌লে শুষ্ক প্রাণ যেন সহজেই সরসতায় ভ'রে ওঠে।

ফরিদপুরের একটি ভাই এখানে দীক্ষাগ্রহণ করার পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে উৎসাহভরে বললেন—হও তো বিরাট হও। মানুষ উপভোগ করুক তোমাকে। শেয়াল-কুকুরের মত বেঁচে কি লাভ ? বরং এমনভাবে চল, এমন হও যাতে কারও শেয়াল-কুকুরের অবস্থায় থাকতে না হয়।

ক্ষেত্রদা (শিকদার)—অন্যে কী অবস্থায় থাকবে-না-থাকবে, সে কি আমার হাত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার love (ভালবাসা), তোমার devotion (ভক্তি), তোমার will (ইচ্ছা) তো তোমারই। আর সেই অনুযায়ী হবে তোমার achievement (প্রাপ্তি)। তোমার উন্নতির সঙ্গে যদি পরিবেশের উন্নতির ব্যবস্থা না কর, তবে তোমার উন্নতিটা মিথ্যে। তা' শক্ত হবে না, পোক্ত হবে না, স্থায়ী হবে না। তাই নিজের স্বার্থেই তোমার পরিবেশকে দেখা লাগবে। অন্তরে urge (আকুতি) থাকলেই এটা করা যায়। Urge (আকুতি)-ই নিয়ে আসে energy (শক্তি)। আর, তাই-ই materialised (বাস্তবায়িত) হয় কর্ম্মে। Fundament (মূল) ধ'রে কাজ করা লাগে। যা' করলে সব হয়, তাই করা লাগে। যা' করলে কিছু হয়, সব হয় না, তা' কিন্তু fundament (মূল) নয়। Fundament (মূল) হ'লো দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ঐটে করতে পারলে সব হবে। ধর, দীক্ষিতের সংখ্যা পাঁচ লাখ দাঁড়ালো, তাদের ভাল ক'রে nurture (পোষণ) দিলে। তখন পাঁচ লাখ লোক যেন একটা মানুষের মত দাঁড়িয়ে গেল। প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকে। তখন কী করা যায় আর না-যায়, তা' বলা যায় না। নিজেরা তো দাঁড়ান যায়ই, আরো কোটি-কোটি লোককে বাঁচান যায়। নিজেদের চেষ্টায় agriculture (কৃষি), industry (শিল্প) ইত্যাদি গ'ড়ে তোলা যায়। Production (উৎপাদন) এত বাড়িয়ে তোলা যায় যে নিজেদের প্রয়োজন তো মেটেই, বাইরেও রপ্তানি করা যায়। মানুষগুলি সংঘবদ্ধ হ'য়ে যদি কঠোরকর্ম্মা ও পারস্পরিক সেবাপরায়ণ হয়, এক নিঃশ্বাসে বড়-বড় কাজ ক'রে ফেলা যায়। মানুষই হ'লো সম্পদের উৎস। ইষ্টানুরাগের মন্থনদণ্ড দিয়ে যতই তাকে মথিত করা যাবে, ততই অমৃতময় শক্তি ও সম্পদের আবির্ভাব হ'তে থাকবে তার ভিতর থেকে। তোমরা জান বা না-জান —এটা ঠিক কথা—তোমরা প্রত্যেকেই এক-একটা prince (রাজপুত্র)—both materially and spiritually (ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুই দিক দিয়ে)। পরমপিতার নাম নিয়ে তা' বাস্তবে হ'য়ে ও ক'রে দেখাও। তাহ'লে দুঃখ-দারিদ্র্য দেশ থেকে ছুটে পালাতে পথ পাবে না। Surrendered activity (আত্মনিবেদিত কর্ম্ম) নিয়ে চল, efficiency (দক্ষতা)-এর চরমে উঠে দাঁড়াও। স্বর্ণফল তোমাদের হাতের কাছে। আমি বলি—এখনই তা' করার ভিতর-দিয়ে করায়ত্ত কর।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৪।৬।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় একখানি তক্তপোষের উপর উপবিষ্ট আছেন।

একটি দাদা বললেন—আমি স্বাধীনভাবে কিছু করতে চাই, কিন্তু কী করব ঠিক বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি নিজের মাথা খাটিয়ে একটা কিছু ক'রে যদি উন্নতিলাভ কর, তাহ'লে তুমি আরো পাঁচ জনকে উন্নতির পথ দেখাতে পারবে। তাই যেখানে আছ, আশপাশ লক্ষ্য কর, ভেবে দেখ তোমার সামর্থ্য, সুবিধা ও সঙ্গতি-মত এমন কী করতে পার যাতে লোকেরও উপকার হয় এবং তুমিও দাঁড়াতে পার। আমি তোমার অঙ্ক কষে দেওয়ার চাইতে, তুমি যাতে অঙ্ক কষতে পার, তাই করাই কি ভাল নয়?

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর গোপেনদাকে (রায়) বললেন—অনেকে আমার কাছে থাকতে ও আলাপ-আলোচনা শুনতে ভালবাসে, কিন্তু কাজের বেলায় নারাজ। ভিতরে-ভিতরে আলসে প্রকৃতির। এই আলস্য না গেলে কিন্তু মানুষের কখনও ভাল হয় না। ওতে অনুরাগও ঢিলে হ'য়ে পড়ে। কিন্তু যারা আমার নীতি ও নির্দ্দেশ বাস্তবে মূর্ত্ত করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে, তাদের টান দিন-দিন বেড়েই যায়।

প্যারীদা একজন রোগীর চিকিৎসা-সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে-সব complication (উপসর্গ) আসেনি, অথচ আসতে পারে, সেগুলির পথ আগে থাকতে বন্ধ ক'রে দিতে হয়। তাছাড়া রোগীর system (বিধান)-টাও মোটামুটিভাবে বোঝা দরকার, যাতে একটা কষ্ট কমাতে গিয়ে আর-একটা কষ্ট না বাড়ে। চারিদিকে নজর রেখে এমনভাবে treatment (চিকিৎসা) করতে হয়, যাতে সর্ব্বাঙ্গীণ সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। একদিক সামাল দিতে আর একদিক বেসামাল হ'য়ে গেল, সেটা সামলান হ'লো তো অন্যদিকে বেতাল হ'লো, এইভাবে একটার পর একটা ওষুধ চলতে থাকলো, এ কিন্তু ভাল চিকিৎসকের লক্ষণ নয়। তাছাড়া অস্বাভাবিক জলদিবাজি বা ঢিলেমি কোনটাই ভালো নয়। রোগকে কাবু করা ও ভিতরের শক্তিকে উজ্জীবিত ক'রে তোলা এই দুই দিকেই নজর দিতে হবে। চিকিৎসকের ব্যবহার এমন দরদী ও উদ্দীপনী হওয়া চাই যাতে রোগীর অন্তর্নিহিত curative urge (আরোগ্যসাধনী আকুতি) flare up (প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে) ওঠে।

৪ঠা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৯।৬।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। সূর্য্য তখন অস্ত যায়-যায়। মেঘের ফাঁক দিয়ে সোনালী রোদ এসে পড়েছে আমগাছের উপর। মনে হচ্ছে, কে যেন গলান সোনা ঢেলে দিয়েছে গাছটির উপর। বড় চমৎকার

দেখতে হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও উপস্থিত সবাই একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সে-দিকে। এমন সময় বাইরে থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক আসলেন। তাঁদের বেঞ্চিতে বসতে দেওয়া হ'লো। প্রণামান্তে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—দেশের উন্নতির জন্য প্রধান প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাই প্রবল ধর্ম্মপ্রাণতা। তাছাড়া জাতি টেকে না। ধর্ম্ম চাইলে ধার্ম্মিকের দরকার, আদর্শের দরকার, যাঁর অভ্যাস-ব্যবহারে ধর্ম্ম জীয়ন্ত হ'য়ে আছে। যেমন দয়াকে বোধ করতে হ'লে দয়ালু ব্যক্তির দরকার, যাঁর ভিতর দয়া মূর্ত্ত। তাই ঋষিকে বাদ দিয়ে ঋষিবাদ নিয়ে থাকলে হবে না। ওতে তাঁর বাণীর মনগড়া ব্যাখ্যা হ'তে থাকে। তাঁর মনোমত ক'রে নিজেদের গড়া হয় না। তাই আদর্শকে খুঁজে নিতে হবে, তাঁর কাছে দীক্ষিত হ'তে হবে। একাদর্শকে অনুসরণ করার ভিতর-দিয়ে ঐক্য আসবে, পারস্পরিক সেবা ও সহযোগিতা আসবে। প্রত্যেকে অপরের হবে, প্রত্যেক group (শ্রেণী) যেমন আদর্শের সেবায় উন্মুখ হবে, তেমনি অন্য group (শ্রেণী)-গুলিকেও fulfil (পরিপূরণ) করবে। এইভাবে সবাই মিলে inter-interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) হ'য়ে উঠবে। শক্তি, সংহতি ও সম্বর্দ্ধনা আসবে এর ভিতর-দিয়ে। একেবারে super-communism (উচ্চাঙ্গের সাম্যবাদ) হ'য়ে যাবে। শুনেছি commune কথার মধ্যে আছে to serve together, to oblige together (সমবেতভাবে সেবা করা, বাধিত করা)। ধর্ম্মের পরখ হ'লো সেবাবুদ্ধির জাগরণ। ধর্ম্ম জাগলেই ভালবাসা জাগবে, কর্ম্ম জাগবে, সেবাবুদ্ধি জাগবে। তখন শোষণ-বুদ্ধি লোপ পাবে, পোষণবুদ্ধি প্রবল হবে। পরিবেশকে দুর্ব্বল করা মানেই যে নিজেকে খোঁড়া করা, পরিবেশকে বাড়িয়ে তোলা মানেই যে নিজের ভাল করা। ধর্ম্ম-যাজনা মানে মানুষের ভিতর এই বোধটা set ক'রে (বসিয়ে) দেওয়া। শুধু নিজেরা ধর্ম্মাচরণ করলে হবে না, পরিবেশকেও ধর্ম্মাচরণে প্রবুদ্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন—আশ্রমের প্রধান লক্ষ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ক'লাম এই। কোন plannig (পরিকল্পনা) নেই। আমি আছি, আমি যেমনতর করি, বলি, ভাবি, বুঝি ও চলি, তা' যাদের ভাল লাগলো, তারা আসলো, জড় হ'লো, একসঙ্গে চলতে সুরু করলো, লোকে বলতে লাগলো আশ্রম। এই তো ব্যাপার। বুদ্ধি ক'রে কিছু করিনি। তবে আমার দর্শন এই—বাঁচা-বাড়া সকলেরই উদ্দেশ্য, তা' fulfil (পরিপূরণ) করতে যাবতীয় যা'-কিছু লাগে, সে-সবই গজাতে হবে। সেই প্রয়োজনে আশ্রমে সব দিকেরই চর্চ্চা হয়। আশ্রম মানে যেখানে সম্যকভাবে শ্রম ক'রে সত্যকে, মঙ্গলকে লাভ করা যায়।

প্রশ্ন—ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বিশ্বাস করি—ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, আমরা সব অবতারকেই মানি। অবতার কথার মানে অবতরণ, যিনি রক্ষাকে ত্রাণ করেন, গ্লানিকে দূরীভূত ক'রে জীবনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকে উদ্ধাতাও বলা যায়। যুগে-যুগে তাঁরা দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী ক'রে মূলতঃ একই বাণী বহন ক'রে নিয়ে আসেন। একেরই অবতরণ হয় নানাভাবে। তাই অবতারদের মধ্যে ভেদ করলে ঈশ্বরকে ignore (উপেক্ষা) করা হয়। অবতারকে ভগবানও বলা যায়। ভগবান মানে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি। 'পুরুষোত্তম' কথা আছে, তার মানে fulfiller the best (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূরণকারী)। অবতার-পারম্পর্য্য না মানলে further fulfilment (আরোতর পরিপূরণ) হয় না, tradition (ঐতিহ্য) ঠিক থাকে না। তাই পূর্ব্বতন প্রত্যেককে যেমন স্বীকার করতে হয়, বর্ত্তমান যিনি তাঁকেও গ্রহণ করতে হয়। বর্ত্তমান যিনি তাঁর মধ্যে আগের যাঁরা সবাই থাকেন। পূর্ব্বতনদের মাহাত্ম্য তাঁর কাছে এসে আমরা ভাল ক'রে বুঝি। একটা ধারারাই ক্রমাগতি চলেছে। এই ধারাকে বিচ্ছিন্ন করতে নেই। ভাগ্যবান তারাই, অবতার-মহাপুরুষের জীবদ্দশায় যারা তাঁকে ধরে অটুট নিষ্ঠায় নির্দ্বিধায় কায়মনোবাক্যে অনুসরণ ক'রে চলে। এই চলনের ভিতর-দিয়েই আসে ভগবৎপ্রাপ্তি মানে ভগবৎ-স্বভাবসম্পন্ন হওয়া, স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হ'য়ে ওঠা।

আধ্যাত্মিক জীবন-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিক জীবন মানে নিত্য স্ফুরণশীল, নিত্য গতিশীল সুকেন্দ্রিক জীবন। ওর মূলেও আছে ইষ্টনিষ্ঠা। ইষ্টকে নিয়েই ফুটে ওঠে গোটা জীবনের যা'-কিছু। প্রত্যেকটা দিকের সঙ্গে প্রত্যেকটা দিকের একটা সামঞ্জস্য আসে। তাই দ্বন্দ্ব ও অশান্তি দূরীভূত হ'য়ে একটি গভীর সমাধানজনিত আনন্দ দেখা দেয়। সত্তা চায় নিজেকে পোষণ করতে, সংরক্ষণ করতে, বহুতে বিস্তৃত করতে অর্থাৎ বাঁচতে-বাড়তে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য এই ষড়রিপু ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদির আবির্ভাব হয় মানুষের ভিতর। কিন্তু মানুষ যখন এইগুলির অধীন হ'য়ে পড়ে তখন বাঁচা-বাড়া অর্থাৎ ধর্ম্ম থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে। তাই ওগুলির বশ না হ'য়ে ওগুলিকে বশীভূত করা লাগে। মানুষ স্বেচ্ছায় ইষ্টের অধীনতা যতখানি স্বীকার ক'রে নেয়, সর্ব্ববৃত্তির ইষ্টানুগ বিন্যাস যতখানি ক'রে চলে, ততখানি সে হয় স্বাধীন। আর, এই স্বাধীন মানুষই পারে তেমনভাবে চলতে যাতে নিজের ও অপরের বাঁচা-বাড়া অক্ষুণ্ণ থাকে। এই ইষ্টনিষ্ঠ চলনকেই বলে আধ্যাত্মিকতা, একেই বলে ধর্ম্ম। পারিপার্শ্বিককে ignore (উপেক্ষা) করলে ধর্ম্ম হবে না, সবাই জাহান্নমে যাবে। তুমি রাজা হ'য়ে থাকবে তা হবে না। তোমার বাঁচার জন্য অন্যকে এত প্রয়োজন যে তাকে তোমার বাঁচাতেই হবে,

environment (পরিবেশ) ক্ষীণ হ'লে তোমার জীবনও অতখানি ক্ষীণ হবে। তাহ'লে ভেবে দেখ, ধর্ম্ম জিনিসটা কতখানি democratic (গণতান্ত্রিক)। তোমার নিজের right (অধিকার) establish (প্রতিষ্ঠা) করতে গেলেই আগে অন্যের right (অধিকার) establish (প্রতিষ্ঠা) করা লাগবে। নইলে তোমার right (অধিকার)-এর অস্তিত্ব থাকবে না। অন্যের right (অধিকার) affect (ব্যাহত) করে যারা, তাদেরও তোমার প্রতিরোধ করা লাগবে। শয়তানী করাও পাপ, শয়তানীর প্রশ্রয় দেওয়াও পাপ।

চক্রপাণিদা (দাস)—Environment (পরিবেশ) না থাকলে তো জীবনই থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে দীর্ঘদিন cell-এ (ক্ষুদ্র কক্ষে) আবদ্ধ ক'রে রাখলে নাকি পাগল হ'য়ে যায়।

সুধাংশুদাকে (মৈত্র) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—কী খবর আজ ?

সুধাংশুদা সংক্ষেপে গুছিয়ে রেডিওর খবর বললেন।

এরপর ভদ্রলোকরা বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আবার আসবেন।

কিছু সময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ বহুদিন পরে ক্ষিদে পেয়েছে। আমার বর্ত্তমান অবস্থায় পেঁপে আর ছাগলের দুধ খাওয়া বোধহয় ভাল।

হেমপ্রভামাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—দ্যাখ্! একটা শয়তানী শিখিয়ে দি। ক্ষিদে পেলেই তো আমি খেতে চাইব। যা' খেতে চাই, তার সঙ্গে পেঁপে যোগ ক'রে দিবি। পেঁপে কেটে ধুবি না, ধুয়ে কাটবি।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, যাদের পেট ভাল নয়, তাদের ছানাটানা খেতে হ'লে ছাগলের দুধের ছানা খাওয়াই ভাল। গরুর দুধের ছানাটা অনেকের হজম হয় না।

ঝাল খাওয়া-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুকনো লঙ্কা না খেয়ে কাঁচা লঙ্কা খেলে অতো ক্ষতি করে না। কাঁচা লঙ্কায় fresh (তাজা) 'সি', ভিটামিন খুব বেশী। তাও মাত্রামত খেতে হয়। ঝাল বেশী খাওয়াও যেমন ক্ষতি, স্বাভাবিক অবস্থায় একেবারে না-খাওয়াও তেমনি ক্ষতি। ঝাল হিসাবে গোলমরিচ ও আদা ভাল। সবই মাত্রামত।

সুধাংশুদা—খাওয়ার সময়-সম্বন্ধে আপনার কী মত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষিদে লাগলে তখন খাওয়াই ভাল।

সুধাংশুদা—ডাক্তাররা তো রোজ এক সময়ে খাওয়ার কথা বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোজ এক সময়ে যদি ক্ষিদে পায়, তাহ'লে তো খুবই ভাল। ক্ষিদে না

পাওয়া সত্ত্বেও কি খাওয়া ভাল? কোন-কোন সময় অবস্থা বুঝে এক-আধবেলা লঙ্ঘন দিলে বা খুব হাল্কা খেলে তাতে ক্ষিদে চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। পেটটাকে অযথা খাটাতে নেই। জোর ক'রে চাপালে তা' assimilated (আত্মীকৃত) হয় না, তাতে বরং ক্ষতি করে। ক্ষিদে বুঝে কোন-কোন বেলা ভাত, রুটি ইত্যাদি না খেয়ে liquid food (তরল খাদ্য) খাওয়া ভাল। সুস্থ অবস্থায় মাঝে-মাঝে হাল্কা খাবার খেয়ে উপবাস, শুক্রবার করার মত পূর্ব্বাহ্নে হবিষ্যান্ন গ্রহণ ক'রে, সেদিন আর কিছু না-খাওয়া, শিশু প্রাজাপত্য করা, ইত্যাদি শরীরের পক্ষে ভাল। সাধারণ উপবাসের সময় জলটা বেশী খাওয়া ভাল।

অনেক আগেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। আকাশে বেশ তারা উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আকাশের দিকে চেয়ে অরুন্ধতী তারাটা দেখলেন এবং অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে উপস্থিত সকলকেও দেখালেন।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যেখানে বশিষ্ঠ, সেখানেই অরুন্ধতী। টান থাকলে বোধহয় এইরকম হয়। টানের মত টান হ'লে মৃত্যুকে ভেদ ক'রেও প্রিয়-সংসর্গ লাভ হয়। ছাড়াছাড়ি হয় না।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর অবিনাশদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে জ্যোতিষ-সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন।

৬ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ২১।৬।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মনোরঞ্জনদাকে (চট্টোপাধ্যায়) বললেন—দীক্ষার সাথে-সাথে ঋত্বিকীটা complete (শেষ) করা লাগে। সাধারণতঃ তিন টাকার কমে কাউকে সই করাবে না। করার সঙ্কল্প নিলে, সেই সঙ্কল্পটাই পারিয়ে দেয়। রোজ পাঁচ টাকা ক'রে যারা ইষ্টভৃতি করছে, তাদের indolent attitude (অলস মনোভাব) কেটে গেছে। শ্রেয়ার্থে করা ও দেওয়ার বুদ্ধি যত বাড়বে, ability (সামর্থ্য)-ও তত বেড়ে যাবে, গাফিলতি থাকবে না।

মনোরঞ্জনদা—আপনি তো দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়াবার কথা বলেন, একে তো আমাদের কর্ম্মী-সংখ্যা কম, তারপর পাঞ্জাপ্রাপ্ত অনেকে আবার তেমন যাজনমুখর নন। এ-সম্বন্ধে কী করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের সঙ্গে নিয়ে যাজনে বেরোন লাগে। অবস্থার মধ্যে ফেলে তাদের মুখ খুলিয়ে দিতে হয়। কইতে-কইতে যখন রস পাবে, তখন আর ছাড়তে চাবে না। নতুন কর্ম্মীও সংগ্রহ করা লাগে। নিজে ক্রমাগত মাতোয়ারা হ'য়ে থাকতে হয়। কিছুতেই যেন ভাব কেটে না যায়।

৭ই আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ২২। ৬। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় চৌকীতে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), হীরেনদা (ঘোষ), ললিতদা (ত্রিপাঠী), পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ কাছে আছেন।

বাঁচা-বাড়ার পরিপন্থী যারা, তাদের কেমনভাবে আয়ত্তে আনা যায়—কেষ্টদা সেই সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু principle (নীতি) বললে হবে না। উল্টো চলন যা'-কিছুকে বাস্তবে অসম্ভব ক'রে তোলা লাগবে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে অসৎ চলন বাড়বার সুযোগ না পায়, অসৎ যারা তারাও সৎ চলনে চলতে প্রবুদ্ধ ও বাধ্য হয়। ভাল যা' তা' আগুনের হল্কার মত ছড়িয়ে দিতে হয়। আদর্শকে সঞ্চারিত করতে হয় আর লোককে দীক্ষিত ক'রে তুলতে হয়। নিত্য যদি মানুষ অনুশীলন না করে, সদভ্যাস যদি আয়ত্ত না করে, তবে যাজনের ভিতর-দিয়ে যে-প্রেরণার সৃষ্টি হয় তা' উবে যায়। তাই, দীক্ষা দিয়ে লোককে আচরণশীল ক'রে তোলার কথা বলি। এর সঙ্গে-সঙ্গে করা চাই proper material adjustment for life and growth (বাঁচা-বাড়ার জন্য সমীচীন বাস্তব ব্যবস্থা)। এইজন্যই তো আকুল আগ্রহে বার-বার বলি—এখনই দেড় লাখ উপযুক্ত লোক দীক্ষিত ক'রে ফেলুন। ইষ্টভৃতি বাড়ান, আর ঋত্বিকী complete (সম্পূর্ণ) ক'রে ফেলুন।

ফণীদা (মুখোপাধ্যায়)—অসুখ সারে না, তাই বেরোতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওভাবে অসুখ সারবে না। যাও—field-এ (কর্ম্মক্ষেত্রে) চ'লে যাও। পরিবারবর্গের জন্য ভাববে না। কষ্টের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে পরমপিতার কাজে লেগে থাক। সংসারের জন্য দুইদিনও দেরী করা ঠিক না। ....ভাদুড়ী পঁয়তাল্লিশ টাকর চাকরী নিয়ে পড়ে আছে, এইটে তার কাছে blessing (আশীর্ব্বাদ), অথচ মানুষের রাজা হবে, তা' হবে না। মানুষ কি বুঝলে ব'সে থাকতে পারে? ছ্যানম্যান্ ক'রে বেরিয়ে পড়ে না? পাগল ক'রে দেয় না সবাইকে? এমনতর পঁচিশটি group (দল)-ই যথেষ্ট।

ফণীদা—মাথা ঠিক থাকলে সব পারা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেট সাফ না হ'লে মাথা ঠিক হবে কি ক'রে? বদমাল ভিতরে জমিয়ে রাখি যে আমরা। নানা consideration-এ (বিবেচনায়) ভাল-ভাল মানুষ নষ্ট হ'য়ে গেল। Jewels are turned into ashes (রত্ন ছাইয়ে পর্য্যবসিত হ'লো)। আমি যা' বলি তাই ক'রে যা, তোর ভাবনা কী? ঋত্বিক তুই, ঋত্বিকের কাজে লেগে যা। তোর দশটা কোম্পানী করার, ম্যানেজিং এজেণ্ট হবার কি দরকার? নিরাশী-নির্ম্মম হ'য়ে এই কাজ কর। এখানে যে-ক'জন আছে, সেই ক'জনই আমি যা' চাই তা' কনফারেন্সের আগে

ক'রে ফেলতে পারে।

মনোরঞ্জনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—পরমপিতার নজর থাকলে—

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন—পরমপিতার নজর এত দেখলাম, তাঁর দয়ায় এত বাঁচলাম, এত ত'রে গেলাম, তবু পরমপিতার নজরের দোহাই দিই। তাঁর নজর আছেই। আমাদেরই নেই পরমপিতার উপর নজর।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে চেয়ে বললেন—আমি বলি ফণীরে মারেন, সকলেরে মারেন, মেরে থেথলো ক'রে ফেলেন। তাতে যদি ঘোর কাটে।

কেষ্টদা—মারবে কে ? যে মারবে, তারও যে অনেক গলদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেই তো মুশকিল।

ফণীদা—বাইরে বেরিয়েছিলাম, কাজও কিছু হয়েছিল, কিন্তু এখন যে আর চলাফেরা করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Necessity has no law (প্রয়োজনের কোন বিধি নেই)। চলাফেরা করাই লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার পায়খানায় গেলেন। পায়খানা থেকে ফেরার পর মনোরঞ্জনদা, হীরালালদা, ফণীদা, করুণাদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ এসে জড় হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—রেওয়াজ আছে, experience (অভিজ্ঞতা) আছে, করা আছে। তোমরা পারবেই।

পরক্ষণেই ফণীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কী করবি ?

ফণীদা—চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'চেষ্টা করব' কি রে ? যাতে successful (কৃতকার্য) হই, তাই করবই। এ-কথা বলতে পারলি না ?

অমরভাই (ঘোষ)—বর্ষাকাল কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেমানুষ, নাক টিপলে দুধ গলে। এই বয়সে আবার অত অসুবিধার কথা কেন ? বক্তৃতা কর, জানও অনেক কিছু। তার মধ্যে আবার ও-কথা কেন ? আমার মনে হয় তোমরা গিয়ে লাগলেই পারবে। ক'রে-ক'রে রেওয়াজ আছে, এতে আর নূতন training (শিক্ষা) লাগবে না। মনে-প্রাণে লাগলেই হবে।

হীরালালদা—কলকাতায় কারফিউয়ের জন্য কাজ করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছুটি নিয়ে বেরিয়ে যা। ছুটি দিলেও বেরুলাম, না-দিলেও বেরুলাম।

কেষ্টদা—হীরালালদা বেরুলে তার দলের সবাই বেরুবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—হ্যাঁ! গোদা যখন গেছে, তখন আর কি ? সবাই পিছে-পিছে ছুটবে।

পরে দেবেনদা (রায়চৌধুরী) ও সুরেনদাকে (বসু) লক্ষ্য ক'রে বললেন—ওরাও খুব পারে। এক-এক দল ১০,০০০ লোকের দীক্ষার দায়িত্ব নিলে হয়। করাই চাই।

সন্ধ্যায় যশোহরের কান্তিদা (বিশ্বাস) ও প্রফুল্লদা (মুখোপাধ্যায়) সেখানকার কাজ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—কমিটিই আমাদের কাল হয়েছে। ঠোকাঠুকি লেগেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কমিটি আবার কী? যারা করে তারাই তো কর্ম্মকর্ত্তা। তারা আবার প্রয়োজন মত অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা নেয়, সহকারী যোগাড় ক'রে নেয়,—এইতো ব্যাপার। কমিটি থাক বা না থাক, সেই বাহাদুর যে অন্যের ego (অহং)-কে ডিঙ্গিয়ে-ডিঙ্গিয়ে কাম করতে পারে। সমুদ্রে স্নান করতে গেলে কখনো ডুব দিয়ে, কখনো লাফ দিয়ে ঢেউ এড়াতে হয়। মানুষের ego (অহং)-কেও ঐভাবে এড়িয়ে যেতে হয়। কখনো বিনীত হ'য়ে এড়াতে হয়, কখনো fulfil (পরিপূরণ) ক'রে win (জয়) করতে হয়। অযথা clash (সংঘাত) সৃষ্টি করা crushed (বিধ্বস্ত) হবার পথ।

প্রফুল্লদা—আজকাল লোকে politics (রাজনীতি) চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মই তো real politics (প্রকৃত রাজনীতি)। Politics (রাজনীতি)-এর ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে পূরণ-পোষণ। যা' মানুষকে সর্ব্বতোভাবে পূরণ-পোষণ করে, তাই politics (রাজনীতি)। তাই, ধর্ম্মই politics (রাজনীতি)-এর মূল উদ্দেশ্য সাধন করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মনোহরভাইকে (সরকার) দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—চৌকী ঠিক করেছিস্ তো?

মনোহরভাই—আজ্ঞে হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহদীপ্ত ভঙ্গীতে বললেন—আর যা'-যা' কাম হাতে আছে, তাড়াতাড়ি সেরে ফেল্।

তারপর কালিদাসীমাকে বললেন—গামছা দে।

কালিদাসীমা গামছা দিলেন।

গামছা দিয়ে মুখটা মুছে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Initiation (দীক্ষা) fundamental (মূল) জিনিস। Initiation (দীক্ষা) যত হয়, তত মঙ্গল। তাতে শুধু যে ভারতেরই উপকার হবে তা' নয়, জগতেরও শান্তি হবে। Initiation (দীক্ষা) যাতে সর্ব্বত্র হয়, সেইজন্য অগণিত ঋত্বিকের দরকার। ঋত্বিক্ দিয়ে ছেয়ে ফেলতে হবে সব জায়গা। দীক্ষার কাজ যদি দ্রুতে এগুতে থাকে, পরমপিতার নামে মানুষ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, ঐ এক ঢিলে অনেক পাখী মরবে। অবশ্য আমরা কারও মরণ চাই না। আমরা চাই সবাই বাঁচুক, সবাই সুখে থাকুক এবং এই পথের অন্তরায় যা' তার সমাধান হো'ক।

কান্তিদা—আপনি যা' চান, তা' করতে খুব খাটুনির প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—খাটুনির প্রয়োজন, তবে সে-খাটুনি বনভোজনের খাটুনির মত। এখানে দল ধ'রে যাচ্ছ, ওখানে দল ধ'রে যাচ্ছ—মানুষের সঙ্গে দরদীর মত মিশছ, মস্‌গুল হ'য়ে গল্পসল্প ক'রছো, তারাও আনন্দ পাচ্ছে, তোমরাও আনন্দ পাচ্ছ। ভগবান-টগবান বড়-বড় কথা কও না, অথচ মানুষ তোমাদের সংস্পর্শে আনন্দে পাগল হ'য়ে উঠছে, দীক্ষার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠছে, তোমাদের ছাড়তে চাচ্ছে না, সর্ব্বদা পিছনে-পিছনে ঘুরছে, এমনতর ইন্টরঙ্গিল রকমটা যদি এনে ফেলতে পার, সেখানে তো এন্তার স্ফূর্ত্তি। এমনতরভাবে অন্তরের আগ্রহ থেকে যে-সব দীক্ষা হয়, তারাই হয় asset (সম্পদ্)। এইভাবে দীক্ষা নিলে প্রায়ই ছিটকে যায় না। প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়ে বা দোদুল্যমান মন নিয়ে যারা দীক্ষা নেয়, তাদের উপর নির্ভর করা চলে না। তারা কষ্ট, অসুবিধা, আশাভঙ্গ বা বাধাবিঘ্নে কাবু হ'য়ে পড়ে সহজে। **Unrepelling adherence** (অচ্যুত অনুরাগ) হ'লে কষ্টের বোধ থাকে না। তারা ইষ্টনেশায় মাতাল হ'য়ে থাকে। অসুবিধায় মিইয়ে যায় না, বরং আরো উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। তাদের পণ হ'লো—যেমন ক'রে হোক ইষ্টের ইচ্ছা পূরণ করাই চাই। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।' সে যে কী বস্তু, যার জীবনে জাগে সেই টের পায়। হাফেজ একে মদের নেশার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সত্যিই ইষ্টনেশা ছাড়া জীবনটা উপভোগ্য হয় না। ঐ নেশা নিয়ে যখন মানুষ যাজন সুরু করে, তখন তার সামনে পাহাড় ট'লে যায়। বাধা ব'লে কিছু থাকে না। পরমপিতাই তার ভিতরে ব'সে তাকে বুদ্ধি যোগান, শক্তি যোগান। তবে একটা কথা, এমনতর হ'তে গেলে, নিজেকে সর্ব্বদা ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে হয়। তবেই তাঁকে সুষ্ঠুভাবে ধারণ করা যায়, বহন করা যায়, প্রকাশ করা যায়। তাছাড়া যে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলে না, সে কিন্তু অন্যকেও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না।

কঠোর জীবন-সংগ্রামে কিভাবে টিকে থাকা যায়, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' তার মানে যে কৃষ্ণের অর্থাৎ ইষ্টের নীতিবিধি ও স্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলে তার বেঁচে থাকার পথ প্রশস্ত হয় এবং যে ঐগুলিকে অবজ্ঞা করে, জীবন তার পক্ষে ভয়সঙ্কুল হ'য়ে ওঠে।

কাজকর্ম্মের কথাপ্রসঙ্গে একজন বললেন—ঠাকুর! আপনি যখন চাচ্ছেন, হবেই।

সেই কথার পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও-কথা না ব'লে বলা ভাল, ঠাকুর! আপনি যখন চাচ্ছেন, তখন আমরা এটা হইয়ে তুলবই।

এরপর রামানন্দ পাণ্ডাজী এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাবার মন্দিরের স্নানজল দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরম ভক্তিভরে গ্রহণ করলেন।

পাশে একটা কুকুর দাঁড়িয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে দেখে বললেন—কেমন করুণভাবে তাকিয়ে আছে। হয়তো ক্ষিদে পেয়েছে। ওকে চারটে মুড়ি এনে দে।

গোপেনদা (রায়) এক জায়গা থেকে কিছু মুড়ি এনে দিলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে পড়লেন।

৮ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ২৩।৬।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় চৌকীতে এসে বসেছেন। খুব রোদ উঠেছে। আমগাছের ছায়ায় প্রফুল্লদা (মুখোপাধ্যায়), কান্তিদা (বিশ্বাস), হরিপদদা (সাহা), বিমলদা (নাগ), সুনীল (মিত্র), প্রমুখ ব'সে আছেন। হরিপদদা মাঝে-মাঝে তামাক, জল, সুপারি ইত্যাদি দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে সকলেরই মন অনাবিল তৃপ্তিতে ভরপুর।

সঙ্কীর্ণতামুক্ত উদার বিশ্বপ্রেম-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সঙ্কীর্ণতা ভাল না, কিন্তু নিজেদের আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি নিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। নিষ্ঠা না থাকলে ব্যক্তিত্বই গ'ড়ে ওঠে না। সে কাউকে কিছু দিতে পারে না। তরল জিনিসের মত যখন যে পাত্রে পড়ে, তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। আমরা যদি নিজের জাতকে, দেশকে, কৃষ্টিকে ভাল না বেসে, সে-সম্বন্ধে যা' করণীয় তা' না ক'রে, আগে বাইরে দরদ দেখাতে যাই, সেটা অবৈধ প্রেমের মত। আমি নিজের মা-বাবাকে ভালবাসি না, নিজের বাড়ীর service (সেবা) দিই না, দশজনের service (সেবা) নিয়ে ব্যস্ত, সেটা প্রবৃত্তিরই খেলা। উৎসকে বাদ দিয়ে মানুষ যাই করুক, তার কোন দাম নেই। প্রেম যেখানে উৎসে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উৎস-সার্থকতায় বিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে, সেখানেই বিশ্বপ্রেম সার্থক হয়। উৎসহারা যাযাবর ভালবাসা, ভালবাসার সুস্থ রূপ নয়।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লদার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললেন—পরমপিতার কাজ কর, কেউ তোমার দূরে থাকবে না, কেউ তোমার পর থাকবে না। সবাই তোমার হ'য়ে উঠবে, সবই তোমার হ'য়ে উঠবে। তোমার অনায়ত্ত কিছুই থাকবে না। সব দলের সব স্বার্থের সঙ্গতি হবে এতে। দ্বন্দ্ব থাকবে না, সংঘর্ষ থাকবে না। ভাল যারা চায় তারা সত্তাসংরক্ষণের খাতিরে মিলিত হবেই। মানুষকে হজম করতে—চাই তাকে ভালবাসা, চাই তার ভাল করা। তবে এ-ব্যাপারে এমন বুদ্ধি-বিবেচনা চাই যে কেউ বিষাক্ত ছোবল মারলেও

আমরা যেন তাতে affected (ব্যাহত) না হই। খারাপের জন্য প্রস্তুত থেকে সব precaution (সাবধানতা) নিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে।

একজন কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অনেক কর্ম্মী তাদের নিজেদের পরিবারের জন্য যা' করণীয় তা' করে না বা করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলো কি কখনও বলে যে আমি যেখানে থাকব সেখানে আলো দেব না—দূরে দেব! আমার তো মনে হয় কর্ম্মীরা যদি প্রকৃত কর্ম্মী হয়, তাদের চরিত্র ও অভ্যাস যদি ইষ্টপ্রাণ, লোকস্বার্থী হ'য়ে ওঠে, তবে তাদের সান্নিধ্যে পরিবারবর্গই তো সবচাইতে বেশী উপকৃত হবার কথা। ইষ্টসঞ্চারণা বা সেবাবুদ্ধি যদি শুধু লোক-দেখান ব্যাপার হয়, তাহ'লে অবশ্য অন্য কথা। ঐগুলি যদি লোক-দেখান রকমের হয়, তাতে অবশ্য কা'রও বড় বেশী উপকার হয় না। ওর পিছনে প্রায়ই প্রবৃত্তির উস্কানি থাকে।............কাজের জন্য যাদের বেশীর ভাগ সময়ই বাইরে থাকা লাগে, সে-সম্বন্ধে যদি অনুযোগ কর, তাহ'লে সে অনুযোগ অনেক কাজ-সম্বন্ধেই করা চলে। অনেক কাজেই জীবিকার্জ্জনের জন্য অনেক সময় বাইরে-বাইরে থাকতে হয়। কিন্তু ঐ কাজের ভিতর-দিয়ে পরিবার প্রতিপালিত হয় ব'লে, পরিবারের লোকের আপত্তির কোন কারণ না থাকাই সঙ্গত। ঋত্বিক্‌দের জীবিকা-সম্বন্ধেও বা তাদের বাড়ীর লোকের আপত্তি থাকবে কেন?

হরিপদদা—সাধারণতঃ শুধু ঋত্বিকতার কাজ যারা করে তাদের পরিবারবর্গের কিছুটা কৃচ্ছ্রতার ভিতর-দিয়ে চলতে হয়, তাই বোধহয় অসুবিধা বোধ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ইষ্টের কাজ নিয়ে যখন ঠিক-ঠিক ভাবে চলে, তখন তার প্রথমে হয় psychic development (মানসিক উন্নতি)। সেই psychic wealth (মানসিক সম্পদ্) active (সক্রিয়) হ'য়ে হয় materialised wealth (বস্তুগত সম্পদ)। অর্থাৎ তোমার দ্বারা organisation (সংঘ) ও environment (পরিবেশ) যতখানি materially profitable (বাস্তবে লাভবান) হবে, ঐ source (উৎস) থেকে ততখানি material resources (বাস্তব সম্পদ্) তোমাতে concentrated (কেন্দ্রায়িত) হবে, তোমার পাওয়া হবে প্রচুর। সে-পাওয়া এতখানি যা' তোমার নিজের প্রয়োজনে লাগে না। তখন বাদবাকী তুমি পরিবারবর্গকে দিতে পারবে। পরিবারের যাদের অন্য কোন বড় sentiment (ভাবানুকম্পিতা) নেই, তারা টাকার দিক থেকে interested (অন্তরাসী) হবে। তখন তারা হয়তো জিজ্ঞাসা করবে—এত পাস্ কোথায়? তুমি বলবে—'মানুষ দেয়, না নিলে আবার দুঃখিত হয়।' তারা বলবে—'ক'স কি পাগল? অমনি ক'রে তোকে দেয়?' ভাব জমে যাবে অতোখানি পেয়ে। আমাকেই দেখলে পার। আমার তো উঞ্ছবৃত্তি। আমাকে যে তোমরা এত দাও, আমি কি আমার জন্য কিছু চাই? অবশ্য মানুষের জন্য চাইতে-চাইতে হাড়

কচলাতে-কচলাতে আমার হাতের চেটো শক্ত হ'য়ে গেছে। আমি জানি, তোমরা যদি ভাল থাক, সেই আমার পরম স্বার্থ। আমার জন্য আমার কোন ভাবনা নেই। আমার ভাবনা তোমাদের নিয়ে। এইভাবে চলি ব'লে পরমপিতার দয়ায় তোমরা স্বতঃস্বেচ্ছভাবে আমাকে যা' দাও, তাতেই কতজনের চ'লে যায়। আমার এবং আমার পোষ্য যারা, তাদের চলতেও থাকবে এমনি ক'রে। তোমরা যদি এইভাবে চলতে থাক, তোমাদেরও আটকাবে না।

কান্তিদা ব্যক্তিগত দেনাদায়িকের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহব্যঞ্জক ভঙ্গীতে বললেন—ও-সব কথা না ভেবে কাম করা লাগে। অযথা না ভেবে যাতে সমস্যার সমাধান হয়, তাই করা ভাল।

মণিদা (ভাদুড়ী) এবং দেবেনদা (রায়চৌধুরী) আজ নূতন পাঞ্জা পেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পাঞ্জাদানের সময় বললেন—

ঋত্বিকের চরিত্র ঠিক রেখো, তোমরা যদি এক ইঞ্চি নাম, তবে যজমানরা দশ ইঞ্চি নেমে যাবে। Foolishly (নির্ব্বোধের মত) চ'লো না, sufferings. (দুঃখ-কষ্ট)-কে ভয় ক'রো না, ingenuity (উদ্ভাবনশক্তি)-কে ignore (উপেক্ষা) ক'রো না, go-between (দ্বন্দ্বী-বৃত্তি)-কে প্রশ্রয় দিও না। সর্ব্বপ্রথমেই হ'চ্ছে unrepelling active adherence to the Superior Beloved (প্রেষ্ঠের প্রতি অচ্যুত সক্রিয় অনুরাগ) সব সময় maintain (রক্ষা) করা।

পরক্ষণেই ভাবগম্ভীর কণ্ঠে দ্রুতবেগে বললেন—Do materialise with every immediacy in desired time the wishes of the Superior Beloved as you are asked for, managing all events and affairs for success. This is the foremost maxim, specially for the Ritwiks. It is the only way to thrive with efficiency and success.

(সমস্ত ঘটনা ও বিষয়কে সফলতার অনুকূল বিন্যস্ত ক'রে তোমার প্রেষ্ঠ-নির্দেশিত ইচ্ছা ও চাহিদাগুলিকে সর্ব্বপ্রকার ত্বরিত্যের সহিত ঈপ্সিত সময়ের মধ্যে বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে তোল। এই হ'লো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি, বিশেষতঃ ঋত্বিকদের পক্ষে। দক্ষতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত উন্নতিলাভ করবার এই হ'লো একমাত্র পন্থা।)

৯ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ২৪।৬।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর বড়াল বাংলোর প্রাঙ্গণে একখানি চৌকীতে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। খেপুদা, সুধাংশুদা (মৈত্র), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রমুখ কাছে আছেন। আজ দিনে বেশ বৃষ্টি হয়েছে, তাই আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা।

খেপুদা বললেন—দাদা! তোমার এই ঠাণ্ডায় ক্ষতি করবে না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না রে!

দেশবিভাগ হ'লে পাকিস্তান ও ভারত এই উভয় দেশের জনসাধারণের কিভাবে মঙ্গল করা যায়, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হয় লোকের কিসে ভাল হয়। নেতার পিছনে যদি দ্রষ্টাপুরুষ না থাকেন, তিনি ভাল করতে গিয়ে মন্দ ক'রে ফেলেন। অবস্থাগতিকে আজ দেশ ভাগ হ'তে যাচ্ছে। হিন্দু, মুসলমান কা'রও পক্ষে যে এটা ভাল হবে, আমার তেমন মনে হয় না। অনেকখানি ঠেকে ও ঠ'কে হয়তো মানুষ বুঝবে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ। প্রত্যেকের ভালর পথ যাতে খুলে যায়, মন্দের পথ যাতে সংকীর্ণ হ'য়ে আসে, তাই করাই তোমাদের কাজ। মুসলমানের ক্ষতি হ'য়ে হিন্দুর ভাল হো'ক, তাও আমি চাই না, আবার হিন্দুর ক্ষতি হ'য়ে মুসলমানের ভাল হো'ক তাও আমি চাই না। কা'রও ক্ষতি ক'রে কারও প্রকৃত ভাল হয় এমনতর বিশ্বাস আমার নেই। ওতে উভয়েরই ক্ষতি হয়। আমি বুঝি প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাঁচা-বাড়ার অবলম্বন হ'য়ে উঠুক। আর তাই-ই ধর্ম্ম। এতে কা'রও আদর্শ, কৃষ্টি বা বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দেওয়া লাগে না। ভগবান এমন ক'রেই জগৎটাকে সৃষ্টি করেছেন যে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হ'য়েই বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে। অন্যথায় নিজ অস্তিত্ব নিয়েই টান পাড়াপাড়ি সুরু হ'য়ে যায়। অস্তিত্বের পরিপন্থী যা' তাকেই বলে অসৎ। সেই অসৎকে নিরোধ করতে গেলেও অদ্রোহী হ'য়ে নিরোধ করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাংশুদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—রেডিও ধরেছিলে নাকি?

সুধাংশুদা বললেন—হ্যাঁ! তারপর সংক্ষেপে খবর বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যশোহরের প্রফুল্লদা (মুখোপাধ্যায়)-কে বললেন—ঋত্বিক্ হবার মত জন আটেক educated, sincere (শিক্ষিত, একনিষ্ঠ) বামুন যদি যোগাড় করতে পারিস্, তাহ'লে ভাল হয়। বামুনের সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকে না, এখনও সব জায়গায় সে-সংস্কার আছে। বামুন এমন নম্বরের নোট যে আজও নম্বরে চলে আর, সত্যি যদি হ'তো, তাহ'লে তো কথাই ছিল না।

যশোহরের এক দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—কি ক'রে চালাই? সংসারে অনটন, ব্যবসায় মন্দা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে-ধরণের দীক্ষা যে-সংখ্যায় বাড়াবার কথা বলছি, ঐ একটা কাজ হ'লে সব হয়। তবে successful (কৃতকার্য্য) হওয়া চাই। এটা successful (সফল) হ'লে কত দোকান হবে। সপরিবেশ বিরাট সৎসংহতি যদি গ'ড়ে ওঠে, তবে পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রত্যেকেরই দাঁড়াবার পক্ষে সুবিধা হয়। অবশ্য নিজের দোষগুলিও শোধরান লাগে। ভেবে-ভেবে বের করতে হয়—আমার অকৃতকার্য্যতার কারণ কী। আর সেগুলি নিবিষ্ট

চেষ্টায় অপসারণ করতে হয়।

উক্ত দাদাটি আর-একজনের নাম উল্লেখ ক'রে বললেন—যখনই সে আশ্রমে আসতে চায় তখনই তার কোন-না কোন বিপদ ঘটে, তাই আর আশ্রমে আসা হয় না। এমন হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে পেছনে আছে obsession (অভিভূত), আছে গ্রহবৈগুণ্য। গ্রহ ভাবে হাতের থেকে যদি বেরিয়ে যায়, তাহ'লে তো আর পাব না। তাই আসতে দেয় না, বাধার সৃষ্টি ক'রে। তা' সত্ত্বেও যদি চ'লে আসে তাহ'লেই ভাল হয়। গ্রহের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র পন্থা হ'লো গ্রহের কারসাজিকে অগ্রাহ্য ক'রে, উপেক্ষা ক'রে, জোর ক'রে ইষ্টের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কান্তিদাকে বললেন—আমরা একটা জিনিস বুঝি না যে, সময়ের দাম কতখানি। যখন যা' করার, তা' যদি না করা যায়, পরে হাজার করাতেও সেই কাজ হয় না। বিপদ এড়াবার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলেন পরমপিতা। আমরা সব সুযোগ নষ্ট করলাম। বাইরে থেকে লোকজন এসে পরিবারবর্গ-সহ বাংলায় বসবাস করতে রাজী ছিল, আসতে সুরুও করেছিল। কিন্তু যাদের এতে ভাল হবে, তারাই শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল। করা গেল না কিছু। এখন চাই ক্রমাগত দীক্ষা, ব্যাপক দীক্ষা। পরমপিতার নাম জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সবার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া চাই। বলতে-বলতে আমার গলার নলি ফাঁক হ'য়ে গেল, সুপুরি পক ক'রে ঢুকে যায়। এত বলি, তবু যেন আপনাদের চেতনা হয় না। আমারই দুর্ভাগ্য।

কান্তিদা—আমরা ভাল ক'রেই লাগব।

১২ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ২৭। ৬। ১৯৪৭)

রাত আন্দাজ আটটা। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। আকাশ বেশ পরিষ্কার। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে চৌকিতে ব'সে আছেন। দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকেই তাঁর আনন্দময় সান্নিধ্য উপভোগ করছেন। অনেকেরই চোখে-মুখে নিবিড় আত্মস্থতা ও নাম-তন্ময়তার আভাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লদা (মুখোপাধ্যায়)-কে বললেন—আপাততঃ যেমন বলেছি অমন দেড় লাখ ক'রে ফেল, তাহ'লে ছোট-বড় অনেকেই আসবে। Success-এ (সাফল্যে) মানুষের ওজন বাড়ে। যে যত fulfillingly successful (পরিপূরণীভাবে কৃতকার্য্য), তার তত ওজন বেশী, আদর বেশী।

প্রফুল্লদা—ইষ্টের কাজের জন্য প্রয়োজন-মত যে-কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারি তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার দ্বারা যেন কেউ deprived (বঞ্চিত) না হয়, উদ্বেজিত না হয়। অন্যকে লাভবান করিয়ে যদি লাভবান হও, ক্ষতি কি? লাভবান হ'তে গেলেই যে মানুষকে লাভবান করা লাগে। তাদের লাভই তোমার লাভ আনে।

প্রফুল্লদা—অন্য কোন সঙ্ঘ বা সংস্থা যদি কোন ভাল কাজ করে, আমরা ব্যক্তিগত-ভাবে তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারি তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। আমরা কোন সম্প্রদায় বা organisation (সংস্থা)-এর against-এ (বিরুদ্ধে) নই, যা' কিনা আমাদের principle (আদর্শ)-এর against-এ (বিরুদ্ধে) নয়। আমাদের বর্জনীয় সেগুলি, যেগুলি সাধারণতঃ সপারিপার্শ্বিক আমাদের বাঁচা-বাড়ার অন্তরায়। We worship everyone's life and growth (আমরা প্রত্যেকের বাঁচা-বাড়ার পূজারী)। যে সৎসঙ্গকে ignore (উপেক্ষা) করে, তার life and growth-এর (জীবন এবং বৃদ্ধির) জন্যও we should try our best (আমাদের খুব ভালভাবে চেষ্টা করা উচিত) and we should resist every one's evil to our best ability (এবং প্রত্যেকের ভিতর অসৎ যা' তাও আমাদের সাধ্যমত নিরোধ করা উচিত।) আমি সৎসঙ্গী তার মানে হ'চ্ছে I am the companion of every one's life and growth (আমি প্রত্যেকের জীবন-বৃদ্ধির সঙ্গী)। সৎসঙ্গী হওয়া মানে সবার বাঁচা-বাড়ার সেবক হওয়া।

হরেনদা (বসু)—আমি আজ বাড়ী আসতেই কলকাতা থেকে যে-সব ছেলেরা এসেছে, তারা আপনা থেকেই দীক্ষার জন্য আমাকে ধ'রে বসলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজনের criterion (নির্ণায়ক)-ই এই যে মানুষ তোমাকে ছাড়তে চাইবে না, নিজে থেকেই দীক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠবে। যাজন করতে-করতে এমন educated (শিক্ষিত) হওয়া যায় যে দুই মিনিটেই মানুষ দীক্ষার জন্য পাগল হ'য়ে ওঠে, fired up (অগ্নিদীপ্ত) হ'য়ে ওঠে, terrorist party-র (সন্ত্রাসবাদী দলের) লোকেরা এক সময় যেমন তাদের মত করতো। তাদের পন্থা সমর্থনযোগ্য কিনা সেটা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তাদের বিশ্বাস, চরিত্র ও উম্মাদনা প্রসংশনীয়। নাম নাও রোগ সেরে যাবে, মোকদ্দমা জিতবে অঢেল টাকা পাবে, কোন কামনা অপূর্ণ থাকবে না, ঠাকুর স্বয়ং ভগবান, আমি তাঁকে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে দেখেছি, আরো কতজনে দেখেছে—এমনতর বেলয় কথা যাজন নয়।

হরেনদা—আমি যে-কোন কাজে প্রথম দিকে বেশ পারি, পরে অগ্রসর হ'তে পারি না, এটা বোধহয় আমার weakness (দুর্ব্বলতা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Weakness (দুর্ব্বলতা) থাকে। Ignorance (অজ্ঞতা)-ই তো weakness (দুর্ব্বলতা)। Ignorance-এর (অজ্ঞতার) দরুন অবস্থাকে

আয়ত্তে আনতে পার না। যেমন তুমি তখন পট ক'রে প্রফুল্লর কথায় বাধা দিলে। তাকে hearing দেবে তো (তার কথা শুনবে তো)? তার feeling (বোধ)-টাকে full exposition (পূর্ণ প্রকাশ) দিতে দেবে তো? সেটা শুনবে তো? তাহ'লে তো তারটা বুঝতে পারবে। তা' না ক'রে তুমি তোমারটা চাপালে, সে যা' বলতে চায়, তা' জানা হ'লো না, বোঝা গেল না, তাকে হাতায়ে পেলে না, অতোখানি ঠ'কে গেলে।

ব্রহ্মানন্দদা এসে প্রণাম করতে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—কি ব্রহ্মানন্দ? ভাল? কাজ হয়েছে?

ব্রহ্মানন্দদা নিজের সুখ-দুঃখের খবরাখবর বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিমধুর কণ্ঠে বললেন—পরমপিতার নাম ক'রো, সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক'রো, যতটুকু পার অন্যের ভাল করতে চেষ্টা ক'রো, কাজে গাফিলতি ক'রো না। পরমপিতার দয়ায় সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

১৩ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৮।৬।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আমতলায় এসে বসেছেন। বিজয়দা (রায়), কালীদাসদা (মজুমদার), রাজেনদা (মজুমদার), ঈষদা-দা (বিশ্বাস), শরৎদা (সেন), কাশীদা (রায়চৌধুরী), মণিভাই (সেন), বিমলদা (মুখোপাধ্যায়), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রমুখ অনেকেই কাছে আছেন। বিহারের একজন বিশিষ্ট লোক এসেছেন। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও দেশের পরিস্থিতি-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সারা ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক সংস্থাপনা ও সমাবেশ এমনভাবে করা চলতো, যাতে ভেদ, বিদ্বেষ, বিচ্ছেদ বা বিভাগের প্রশ্নই উঠতো না। আমাদের গোড়ায় ভুল হয়েছে। আমরা integration (সংহতি) চাই, Ideal (আদর্শ) চাই না। ওতে পথ পাই না, মাথা খোলে না। আর, প্রতিলোম চারিয়ে মহা অন্যায় করা হয়েছে। জন্তু-জানোয়ারের বেলায় আমরা প্রতিলোম-সংমিশ্রণ পছন্দ করি না, জানি ওতে পিতা-মাতার মৌলিক গুণাবলী বিরুদ্ধ মিলনের দরুন বিধ্বস্ত হওয়ায় বাচ্চা বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মানুষের বেলায় এই সত্যটা আমরা স্বীকার করতে চাই না। মানুষের বংশ ঠিক রাখার চাইতে কুকুর বা ঘোড়ার বংশের মান ঠিক রাখার উপর আমরা আজ ঢের বেশী importance (গুরুত্ব) দিই। মানুষের বিবাহ ও জনন নিয়ে যদি এইভাবে ছিনিমিনি খেলা হয়, তবে প্রকৃতিও মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। মানুষের মধ্যে আর মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানব দানবে পরিণত হবে। পরস্পর পরস্পরকে নানাভাবে সাবাড় করার তালে

থাকবে। এখনও সাবধান না হ'লে এই বিষ জগৎকে জর্জ্জরিত ক'রে তুলবে। আজ সতীত্বের মান নীচু হ'য়ে যাচ্ছে। মায়েদের মধ্যে গলদ ঢুকলে, সন্তান-সন্ততির বুদ্ধি-বিবেচনা ও চলন-চরিত্র কদর্য্য হ'তে বাধ্য। এইসব গোড়ার দিকে নজর না দিয়ে গাছের আগায় জল ঢাললে কিছু হবে না। উদারতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিলে ফল যা' হবার, তাই হবে। যে-সব বিকৃত ধারণা শিকড় গেড়ে বসেছে, তার মূল উৎপাটন করতে গেলে চাই প্রচণ্ড যাজন। শুধু মৌখিক যাজন নয়। আচরণ ও চরিত্র-সমন্বিত যাজন। যাতে মানুষ মুগ্ধ, বুদ্ধ ও প্রত্যয়দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। যাজন সাধনার একটা অঙ্গও বটে। যাজন এত vitalising (প্রাণদ) জিনিস যে সমস্ত cell (কোষ)-গুলি উন্নত প্রাণন-পরিক্রমায় ক্রমে-ক্রমে spiritualised (আধ্যাত্মিক ভাবদীপ্ত) হ'য়ে ওঠে। স্বভাবতঃই যাজনমুখর যে সেই-ই সহজ ধ্যানের চাবিকাঠি হাতে পেয়ে যায়। গীতায় আছে—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু, মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।" "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" মামেকং শরণং ব্রজ মানে—এক আমাকে রক্ষা ক'রে চল, আমার নীতি-নির্দ্দেশ রক্ষা ক'রে চল। তা' যদি কর, তবে আমি তোমাকে রক্ষা করব। তবে কোন প্রত্যাশার অধীন না হওয়াই ভাল। তাই গীতার মধ্যেই আছে—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা,
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।"

কোন প্রত্যাশা বা পিছুটান থাকলে সর্ব্বতোভাবে surrender (আত্মসমর্পণ) করা হয় না। আর, তা' না হ'লে একমনা হ'য়ে তাঁর কাজ করার যোগ্যতা হয় না।

নবাগত ভদ্রলোক বললেন—আজকাল ভাল লোক পাওয়াই দুষ্কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুবিধার মধ্যেও সুবিধা আছে। মিরজাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ আজও সমাজের মধ্যে বেঁচে আছে, যারা প্রবৃত্তির খোরাক পেয়ে সিরাজকে sacrifice (বিসর্জ্জন) করেছিল। জগৎশেঠের টাকার অভাব ছিল না, তবু টাকার লোভ ছিল প্রবল। কতকগুলি ইষ্টপ্রাণ, প্রবৃত্তিজয়ী, নিরাশী, নির্ম্মম, নির্লোভ, দক্ষ, চতুর কর্ম্মী ও টাকা যদি থাকে, তবে খারাপ লোকগুলিকে দিয়েও অনেক ভাল কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। তারা স্বার্থের খাতিরেই তা' করে। কিন্তু যারা তাদের কাজে লাগাবে, তারা যদি হীনস্বার্থের ঊর্দ্ধে না ওঠে, তাহ'লে তারা কিন্তু পারবে না। কোন-কিছুর লোভে ইষ্টকে ভালবাসা ভালবাসাই নয়। Expectant love (প্রত্যাশী ভালবাসা) হ'লে enticed (প্রলুব্ধ) হ'তে পারে, unexpectant love (অপ্রত্যাশী ভালবাসা) হ'লে তাদের কিছুতেই ফেরান যায় না। কতকগুলি মানুষ আছে এমন প্রবৃত্তি-ঝোঁকা যে তারা কিছুতেই মহৎ ব্যাপারে সাড়া দিতে চায় না, অথচ তাদের

co-operation (সহযোগিতা) হয়তো সে-ব্যাপারে অপরিহার্য্য। সেখানে তাদের প্রবৃত্তির দরজা দিয়ে ঢুকেই সুকৌশলে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। এইভাবে কারও-কারও পরিবর্ত্তনও হ'য়ে যেতে পারে। আবার, কারও-কারও হয়তো পরিবর্ত্তন হবে না। কর্ম্মীদের এমন দেবোপম চরিত্র হওয়া চাই, যা' দেখে মানুষ শ্রদ্ধা না ক'রে পারে না। অমনতর শ্রদ্ধা-উদ্দীপী চরিত্রই লোকজীবনের উদ্ধাতা।

প্রফুল্ল—নোয়াখালীর দাঙ্গার সময় অনেকে বাঁচার জন্য গুণ্ডাদের টাকা দিয়েও তো রেহাই পায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকার ব্যবহার হয়নি। সৎ-সংগঠনের জন্য সময়-মত টাকা দিলে, আগে থাকতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হ'য়ে থাকত যে কোন বুদ্বুদই উঠতে পারত না। প্রত্যেকে নিজে বাঁচার জন্য দিল, কিন্তু কেউ একলা বাঁচতে পারে না। পাশের সবাই মরবে আর একজন একলা বেঁচে থাকবে, তা' হয় না। এই বিচ্ছিন্নতার দরুন, দুর্ব্বলতার দরুন টাকা খরচ হ'লো কিন্তু কোন কাজ হ'লো না। কিছু না, এক ডজন, দু' ডজন খাঁটি মানুষ হ'লে সারা ভারতের ভোল ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

এরপর ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। এমন সময় হাউজার-ম্যানদা, তার মা, আউটারব্রিজদা প্রমুখ আসলেন। দেখতে-দেখতে অনেক লোক জড় হ'য়ে গেল।

মাদ্রাজ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাদ্রাজ কিরকম ?

হাউজারম্যানদার মা—সুন্দর। আমার মনে হয়, ওখানে গরম বোধহয় একটু বেশী। কলকাতাও সুন্দর। আমি যা' ধারণা করেছিলাম, কলকাতা তা' থেকেও বড়।

কথাপ্রসঙ্গে মা জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষে রিক্সা টানে তা' কি আপনি পছন্দ করেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, আমার ভাল লাগে না। আমার মনে হয় তারা বাধ্য হয়েছে রিক্সা টানতে, অথচ আমরা তাদের জন্য কিছুই করতে পারছি না। আমি রিক্সায় চড়িনি, কদাচিৎ ঘোড়ার গাড়ীতে চড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর আউটারব্রিজদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ক্যাপেলের সঙ্গে দেখা হ'লো ? সে কবে আসবে ?

আউটারব্রিজদা—হ্যাঁ! দেখা হয়েছে। তিনি জুলাই মাসের মাঝামাঝি আসবেন।

একটু বৃষ্টি আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে থেকে বারান্দায় এসে চৌকিতে বসলেন। অন্য সবাইও সঙ্গে-সঙ্গে আসলেন।

মা প্রমুখ বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—গোলাপবাগে থাকার জায়গা আছে তো ?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ ?

মা—এ-জায়গা কলকাতার থেকে অনেক ভাল। বিদেশে এসে সবই নূতন-নূতন লাগে। কেমন যেন একটা নূতন জগৎ।

শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত বালক-বালিকা ও মায়েদের দেখিয়ে বললেন—এরা সবাই খুব খুশি হয়েছে। এরা মনে করছে, এদের নিজেদেরই পরমাত্মীয় বহুদিন পরে ঘরে ফিরে এসেছে। এরা কথা বলতে পারছে না ব'লে দুঃখ করছে।

মা—এটা তাদের হৃদয়বত্তারই পরিচয় দেয়।

প্রফুল্ল দোভাষীর কাজ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এতদিন পরে মাকে পেয়ে কেমন লাগছে ?

হাউজারম্যানদা নিস্বর্বাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই বললেন—মাকে কাছে পেলে মনে হয় যেন স্বর্গের নিঃশ্বাস আমাদের চুমু দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে মা'র চোখ ছলছল ক'রে উঠলো।

এরপর ও'রা বিদায় নিলেন।

পাবনা থেকে একদল বিশিষ্ট মুসলমান শ্রীশ্রীঠাকুরকে পাবনায় ফিরে যাবার জন্য আন্তরিক আহ্বান ও প্রার্থনা জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানি পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন এবং কেষ্টদাকে চিঠিখানি রেখে দিতে বললেন। প্রফুল্লকে বললেন—'ওর একটা নকল রেখে দে তোর কাছে, যাতে দরকার-মত যে-কোন সময় পাই।'

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মীদের অনুসরণীয় কয়েকটি নির্দ্দেশ-সম্বলিত একটি ইংরেজী বাণী দিলেন।

ঐ বাণী-সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—অন্যের সঙ্গে যতই দ্বন্দ্ব-বিরোধ বাধাব, ততই নেমে যাব। আমার একটাও শত্রু ছিল না, কিন্তু আমি কখনও আমার principle (আদর্শ) sacrifice ক'রে (বিসর্জ্জন দিয়ে) কিছু করিনি। আদর্শে অটুট থেকে ব্যবহারে নির্ব্বিরোধ হ'তে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে।

হরেনদা (বসু)—কখনও-কখনও কি মানুষ রাগে আত্মহারা হ'য়ে পড়ে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাগে আত্মহারা হ'লেই ঠ'কে গেলে।

১৪ই আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৯। ৬। ১৯৪৭)

প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। সুশীলদা (বসু), সুধাংশুদা (মৈত্র), স্মরজিৎদা (ঘোষ), সমস্তিপুরের এক দাদা এবং আরো কয়েকজন কাছে আছেন।

অবতার-মহাপুরুষদের ঐক্য-সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা হচ্ছে। এমন সময় হাউজারম্যানদা, তার মা ও আউটারব্রিজদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মা'র শরীর ভাল আছে তো ?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা কী খেলেন ?

মা নিজেই সব বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে বললেন—মা'র খাওয়া-সম্বন্ধে এমনভাবে নজর রাখা লাগবে, যাতে পেট খারাপ না হয়।

হাউজারম্যানদা—মা আমেরিকার বিবাহপদ্ধতি-সম্বন্ধে বড়মা এবং সানুর সঙ্গে গল্প করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমিও ফাঁকমত শুনব।

মা—আচ্ছা!

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের দেশে একটা কথা আছে, যে ছেলের মুখ মায়ের মুখের মত দেখতে হয়, সে বড় হয় জীবনে। হাউজারম্যানের মুখের মধ্যে মায়ের মুখের ছাপ আছে অনেকখানি।

এমন সময় ভোলানাথদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ভোলানাথের ইংরেজী কী ?

পরক্ষণেই বললেন—'Master of forgetfulness' (ভ্রান্তির নাথ) বলা যায় বোধহয়।

সুধাংশুদা—Master of forgiveness (ক্ষমার প্রভু) বললে বোধহয় মূল ভাবটা আরো পরিষ্কার হয়, যদিও তা' literal (আক্ষরিক) নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' মন্দ নয়।

বাংলা শেখা-সম্পর্কে কথা উঠলো।

হাউজারম্যানদা—ফোনগ্রাফ রেকর্ড আছে, তাতে বাংলা শেখার সুবিধা হবে।

এরপর ও'রা বিদায় নিলেন। কয়েকজন নব-দীক্ষিত যুবক এসে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কথা হ'লো—Make the time tamed and success may come with heavenly bliss (সময়কে দমন কর এবং স্বর্গীয় শান্তি-সহ সাফল্যের আবির্ভাব হ'তে পারে)। রাত পোহালেই লক্ষ্মণ মারা যাবে, তার আগেই বিশল্যকরণী নিয়ে পৌঁছান চাই। তাই হনুমান

সূর্য্য বগলে করলো, একেই বলে time (সময়)-কে tame করা (পোষ মানান)। সূর্য্য বগলে করা বলতে আমি বুঝি—এত দ্রুত কাজ করা যাতে সময়ের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। বিদ্যুৎকর্ম্মা হওয়া লাগে। চুম্বকমনা ও বিদ্যুৎশরীরী যদি হও, তবে পারবে। চুম্বক যেমন লোহা পেলেই ধ'রে ফেলে, তোমরাও তেমনি মানুষ পেয়েছ কি ধরেছ। আর, শরীরটাও ছোটা চাই বিদ্যুতের মতন।

যাজন-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বীরুদাকে (রায়) বললেন—এমনভাবে তাঁর কথা বলতে হবে যাতে মানুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হ'য়ে যায়। আর, মন্ত্রমুগ্ধ হওয়া মানেই দীক্ষিত হওয়া।

প্রফুল্ল—সাপে কাটলে দেখা যায় ওঝার মন্ত্র পড়লে ভাল হয়। এটা সম্ভব হয় কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোগীর মনে এমনতর psychical action (মানসিক ক্রিয়া) হয়, যার ফলে বিষক্রিয়াকে পরাভূত করার মত শক্তি গজায় শরীরে।

১৫ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ৩০। ৬। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে এসে বসেছেন। অনেকেই উপস্থিত আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবান অনন্ত, আমাদের চলাও অনন্ত। Becoming (বিবর্দ্ধন) eternal (চিরন্তন), তাই চলার শেষ নেই। কিন্তু এই চলাটা হওয়া চাই তাঁর দিকে, তাঁর পথে, নইলে আমরা না এগিয়ে পিছিয়ে যাই। অযথা দুঃখ-দুর্ভোগের সৃষ্টি করি। মানুষকে এ-থেকে রেহাই দিতে গেলে ভাল-ভাল কর্ম্মী সংগ্রহ করা চাই, যারা নিজেদের জ্বলন্ত ইষ্টানুরাগ সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারবে মানুষের ভিতর।

শ্রীশ্রীঠাকুর কুষ্টিয়ার একটি ভাইকে দেখিয়ে বললেন—ওর বাবা আমাকে অনেকদিন আগে একখানা খাট দিয়েছিলেন—ফিতের খাট।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে বসেছিলেন। সাতক্ষীরার হিন্দুমহাসভার প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সমস্ত মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা করা উচিত। এই শ্রদ্ধার নিদর্শনের ভিতর-দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়ে।

প্রশ্ন—সবাইকে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেওয়া কি উচিত নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদাচারী ও অদুষ্টকর্ম্মা হ'লে তাদের মন্দিরে ঢোকার নিষেধ নেই। তবে কারও ব্যক্তিগত মন্দির হ'লে সেখানে তার পছন্দমত ব্যবস্থা হওয়াই সমীচীন।

সংগঠন-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সংগঠন মানে বিভিন্ন লোককে এক আদর্শ ও উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত ক'রে, প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কাজে

নিয়োগ ক'রে, পরস্পরকে পরস্পরের সহায়ক ক'রে তোলা। সংগঠন যদি আমাদের শরীর-বিধানের মত স্বতঃ-সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠে, তাহ'লেই তা' সার্থক হয়।

প্রশ্ন—এমন দিন কি আসবে, যখন সবাই ব্রাহ্মণ হ'য়ে যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রাহ্মণত্বই ideal (আদর্শ)। ব্রাহ্মণত্ব মানে ব্রহ্মজ্ঞত্ব। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবাইকেই ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে হবে। কিন্তু প্রত্যেককে এই পথে অগ্রসর হ'তে হবে তার instinct (সহজাত সংস্কার) অনুযায়ী। বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে সব একাকার করার বুদ্ধি ভাল নয়। আর, তা' কার্য্যকরীও হয় না। রকমারি যেমন আছে, তেমনই থাকবে। তবে একাদর্শের প্রতি নিষ্ঠা যত বাড়বে, সবার মধ্যে ঐক্য ও সঙ্গতিও তত প্রবল হবে।

প্রশ্ন—উচ্চবর্ণের ভাল বংশের লোকদের মধ্যেও তো অনেককে খুব খারাপ হ'তে দেখা যায়, এর কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়ে-থাওয়ায় যদি গোলমাল না হয়, বংশের ধারা যদি ঠিক থাকে, তবে একটা উন্নত বংশের একটা লোক অবস্থা-বিপর্য্যয়ে বা খারাপ পরিবেশে প'ড়ে খারাপ হ'লেও তা'র instinct (সহজাত সংস্কার) কিন্তু নষ্ট হ'য়ে যায় না। তাকে তালিম দিয়ে নিতে পারলে সে আবার স্ব-বৈশিষ্ট্যে ফুটে ওঠে। যেমন হয়েছিল রত্নাকর দস্যুর। রত্নাকরের মধ্যে ছিল বাল্মীকি। নারদের হাতে পড়ে রত্নাকরের ভিতর আবির্ভাব হ'লো বাল্মীকির। বংশে প্রতিলোম ঢুকলে বা বিবাহ-বিধির ব্যত্যয় হ'লে বংশের ধারা নষ্ট হ'য়ে যায়। একটা প্রতিলোমজ কুকুর দেখতে-শুনতে খুব ভাল হ'তে পারে, কিন্তু সে আদতে কিছু না। লোভ দেখালে সহজেই সে আত্ম-সমর্পণ করবে। একটা pedigreed dog (বংশেদ কুকুর) তা' কখনও করবে না। জাত-জন্ম না মেনে উপায় নেই। ন্যাংড়া কখনও গোলাপখাস হবে না, গোলাপখাস কখনও ন্যাংড়া হবে না। এদের বীজ আলাদা, চেহারা আলাদা, স্বাদ আলাদা। ন্যাংড়া খারাপ হ'লেও তার মধ্যে ন্যাংড়ার বৈশিষ্ট্য থাকবে। তাকে nurture (পোষণ) দিয়ে কালে-কালে ভাল ন্যাংড়ায় পরিণত করা কঠিন কিছু না। বর্ণ-বিধান, বংশ-বিধান প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে। সহায়রামবাবুর কাছে শুনেছিলাম Botanical world-এ (উদ্ভিদ জগতে)-ও জননের ব্যাপারে সগোত্র সংযোগ খারাপ ফলই প্রসব করে।

প্রশ্ন—বিবাহ-বিচ্ছেদ কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর ফল ভাল হয় না কোন দিক দিয়েই।

প্রশ্ন—প্রজননের ক্ষেত্রে গণনা-গৌরব বুদ্ধির দিকে কি নজর দেওয়া ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা চাই super-intelligentsia (অত্যুন্নত বুদ্ধিদীপ্ত সম্প্রদায়) through proper marriage (বিহিত বিবাহের মাধ্যমে)। গণনা-গৌরব absolutely (পুরোপুরি) ignore (উপেক্ষা) করব না।

তবে সংখ্যা যদি বাড়াতে হয় better type (উৎকৃষ্ট ধরণ) বাড়াব। করিৎকর্ম্মা, সৎ, সুধী লোকের সংখ্যা যদি বাড়ে, তারা কখনও সমাজের ভার হবে না। বরং তারা অনেকের ভার বহন করতে পারবে।

প্রশ্ন—দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তো খুব খারাপ। এখন production (উৎপাদন) বাড়াবার দিকে নজর দিতে হবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকের efficiency (দক্ষতা) বাড়াতে পারলে সমস্যা থাকে না। যাই করতে চান, প্রথম চাই মানুষ তৈরী করা। মানুষকে যদি জাগাতে পারেন, মানুষকে যদি গজাতে পারেন, মানুষকে যদি আদর্শমুখী ক'রে তুলতে পারেন, কোন কাজই কঠিন হবে না। গণ চাই, কিন্তু কুত্তার মত নয়। আমরা চাই ঘরে-ঘরে ভগবান জন্মাক।

২৩শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ৮। ৭। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একখানি ইজিচেয়ারে এসে বসেছেন। ভোলানাথদা (সরকার), যতীনদা (দাস), বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ অনেকেই কাছে আছেন। এমন সময় হাউজারম্যানদার মা, চক্রপাণিদা (দাস) প্রমুখ আসলেন।

মাকে একখানি চেয়ারে বসতে দেওয়া হ'লো। বসার পর কথাপ্রসঙ্গে তিনি চক্রপাণিদাকে দেখিয়ে বললেন—উনি যীশুখ্রীষ্টকে একজন যোদ্ধার মত ভাবতে ভালবাসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তিনি যদি যোদ্ধা হন, তাঁর অস্ত্র হ'লো ভালবাসা।

মা—তিনি কাউকে আঘাত দিতে চাইতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আঘাত দিয়েছেন অন্যায়কে, অসৎ ও শাতনী-প্রবৃত্তিকে, যাতে তার কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে মানুষ আনন্দে বাঁচতে পারে। প্রবৃত্তির উপর mastery (আধিপত্য) থাকলে, প্রবৃত্তি খারাপ কিছু নয়, কিন্তু তার দ্বারা obsessed (অভিভূত) হ'লে, সেটা ক্ষতির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

মা—আমরা কখনও-কখনও কি অসৎ ভাবের দ্বারা অভিভূত হই না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Conscientious people may often be coloured but they are seldom obsessed (বিবেকী লোকেরা কখনও-কখনও রঙ্গিল দৃষ্টিসম্পন্ন হ'তে পারে, কিন্তু তারা অসৎ ভাবের দ্বারা অভিভূত হয় কমই)। যিনি প্রকৃত ভাল, তাঁর প্রতি আমাদের অন্তরের গভীর ভালবাসা থাকলে, আমরা obsessed (অভিভূত) হই কম। কারণ, তিনি যা' ভালবাসেন, আমরা তা' ভালবাসি, এবং তিনি যা' ভালবাসেন না, তার প্রতি আমাদের ঝোঁক থাকলেও আমরা সে-ঝোঁক নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করি। ভাল হওয়ার এই হ'লো

সোজা পথ।

পড়ন্ত রোদের সোনালী আভা এসে পড়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে। তাঁর আনন্দে ডগমগ মুখখানি আরো উজ্জ্বল ও মধুর হ'য়ে উঠেছে। সবাই একদৃষ্টে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে।

মা এইবার জিজ্ঞাসা করলেন—ভালবাসতে গেলে কি ব্যক্তিত্ব হারাতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Individuality (ব্যক্তিত্ব) নষ্ট হ'য়ে গেলে আমরা Beloved (প্রেষ্ঠ)-কে সেবাও করতে পারি না, উপভোগও করতে পারি না। ভালবাসা চায় প্রিয়কে অনন্তকাল ধ'রে সেবা করতে, উপভোগ করতে। সে কখনও আত্মবিলয় চায় না। ভালবাসলে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, ভালবাসা যথাযথ প্রয়োগের ভিতর-দিয়েই প্রকৃত ব্যক্তিত্ব গজায়। মানুষ যত সময় পর্য্যন্ত প্রবৃত্তির টানে চলে, তত সময় ব্যক্তিত্বের সন্ধান পায় না।

মা—সবার চলার জন্য কি একটা ধরা-বাঁধা পথ হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত রকমের চেহারা, তত রকমের বোধ, তত রকমের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেককে চলতে হবে তার বিশিষ্ট রকমে, কিন্তু একই লক্ষ্যাভিমুখে।

মা—নিছক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কি মানুষকে ভগবদনুভূতিতে পেঁছে দিতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love can realise God, love can import knowledge (ভালবাসা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে, ভালবাসাই জ্ঞান আনতে পারে)। আবার, Love (ভালবাসা) দিয়ে knowledge (জ্ঞান) enjoyed (উপভোগ করা) হয়। Without love, knowledge is sterile (ভালবাসা ছাড়া জ্ঞান বন্ধ্যা)। তবে বিজ্ঞানকে বাদ দেওয়া যায় না।

মা—যারা বৈজ্ঞানিক পন্থাকে বাদ দিয়ে, শুধু ভালবাসা নিয়ে চলতে চায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রিয়পরমকে ভালবাসতে গেলেই, তাঁকে অনুসরণ করতে গেলেই science (বিজ্ঞান) এসে পড়ে। তিনি যা'-কিছু বলেন তাই-ই scientific (বৈজ্ঞানিক)।

মা—কোরিন্থিয়ানদের কাছে লিখিত চিঠিতে সন্ত পল ভালবাসা-সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, তা' কি আপনি পড়েছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, আমি তো পড়িনি। আপনি বলেন, আমি শুনি।

মা আবৃত্তি ক'রে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! Love (ভালবাসা) যেখানে আছে, সেখানে hope, faith ও charity (আশা, বিশ্বাস ও বদান্যতা) আছে।

মা—Charity (বদান্যতা বা বিশ্বপ্রেম) ও love (ভালবাসা) সমার্থক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Charity (বদান্যতা) কথার মানে বুঝি প্রীণন। তাঁকে দিয়ে খুশি ক'রে খুশি হই। Love cherishes to serve (ভালবাসা সেবা করার

আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে)। Real love is ever unrepelling (প্রকৃত ভালবাসা সর্ব্বদা অচ্যুত)—lust (কাম)-এর উল্টো।

মা—Lust (কাম) বলতে আপনারা কী অর্থ করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Lust is expectant love (কাম মানে প্রত্যাশাপরায়ণ ভালবাসা)। Suppose I love you for a pen (ধরুন, একটা কলম পাওয়ার আশায় আমি আপনাকে ভালবাসি)।

মা—স্বামী-স্ত্রী যেখানে পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে, সেখানে সেটাকে শুধু কাম বলা কি ঠিক হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাম নিজের সুখ-সুবিধাকেই বড় ক'রে দেখে। প্রেম চায় প্রিয়কে সুখী ক'রে সুখী হ'তে।

মা—আমাদের দেশে আমরা ভালবাসা কথাটা সীমিতক্ষেত্রে ব্যবহার করি। আমরা অনেককে পছন্দ করতে পারি, কিন্তু ভালবাসি খুব কম লোককেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমনতর ক্ষেত্রে আমরাও তাকে পছন্দ করা বলি। ভালবাসা মানে to dwell in one's good (একজনের ভালতে বাস করা)। ভালবাসার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে এই যে ভালবাসার জনের যাতে ক্ষতি হয় তা' আমরা বরদাস্ত করি না। তার মধ্যে যদি এমন কোন গলদ থাকে, যা' তার পক্ষে ক্ষতিকর, তাও আমরা দূরীভূত করতে চাই। একেই বলে অসৎ-নিরোধ। Christ (যীশুখ্রীষ্ট) যে temple-এর (মন্দিরের) প্রাঙ্গণ থেকে ব্যবসাদারদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর ভালবাসার কমতি হয়নি। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন, তারা পরমপিতাকে ভালবাসতে শিখুক, নিজেদের স্বার্থের খাতিরে মন্দির-প্রাঙ্গণের পবিত্রতাকে নষ্ট না করুক।

মা—পাশ্চাত্ত্যে আমরা কর্ম্মের উপর জোর দিই, প্রাচ্যে মননশীলতার উপর জোর দেওয়া হয় বেশী। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য উভয় স্থানেই এই দুই দিকের সমন্বয় হওয়া কি ভাল নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! কোনটাই একক সম্পূর্ণ নয়। Thinking and doing should go hand in hand (চিন্তা এবং কর্ম্ম একযোগে চলা উচিত)। শুধু চিন্তায় বুঝ হ'তে পারে, কিন্তু না করলে জ্ঞান হয় না। আবার করার সঙ্গে যদি সার্থক ধ্যান না থাকে তবে অনেক ভুল জমে ওঠে, করাগুলি সব সময় সত্তাপোষণী হয় না। সার্থক মনন, করণ ও প্রাপণই knowledge and realisation (জ্ঞান ও উপলব্ধি)। এই দিকে লক্ষ্য রেখে do to be and be to have (হওয়ার জন্য কর এবং পাওয়ার জন্য হও)। Have (পাওয়া)-টা যখন হয়, তখন সেটা habit-এ (অভ্যাসে) আসে।

এরপর মা তখনকার মত বিদায় নিলেন।

২৪শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ৯ । ৭ । ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), হরিপদদা (সাহা), মহিমদা (দে), নগেনভাই (দে) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত আছেন।

আসন্ন দেশবিভাগ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপসোসের সুরে বললেন—কিছুই করা গেল না। মানুষ নিজে যদি ভাল না চায়, তবে বাইরে থেকে, চেষ্টা ক'রে তার ভাল করা যায় না। কি-কি হবে এবং কি-কি হ'তে পারে, আমি অনেকদিন আগে থেকেই আঁচ করেছিলাম। প্রতিকারের চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু যাদের ভালর জন্য সব ব্যবস্থা, তারাই ভুল বুঝলো। মানুষ যদি self-centric (স্বার্থপর) হয়, তাহ'লে সে short-sighted (স্বল্প-দৃষ্টিসম্পন্ন) হবেই। আবার, এমনতর মানুষ যারা, তারা অন্যকেও নিজেদের মাপকাঠিতেই বিচার করে। তারা ভাবতেই পারে না যে হীন স্বার্থ-সন্ধিৎসুতা ছাড়া মানুষের কাজের পেছনে অন্য কোন উচ্চ প্রেরণা থাকতে পারে। তবে নিরাশ হবার কিছু নেই। মন্দ অবস্থাকে ভালয় পর্য্যবসিত করার পথ সব সময়ই আমাদের খোলা।

কেষ্টদা—সময় বড় কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন ক'রেই লাগা লাগে যাতে সময়ের উপর সওয়ার হওয়া যায়। সময় যেখানে সংক্ষেপ, গতি সেখানে তীব্র ক'রে তুলতে হবে।

২৫শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ১০ । ৭ । ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়ালের বারান্দায় একখানি তক্তপোষের উপর উত্তরাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট। অদূরে অশথগাছের ডালে নানারকম পাখী কলরব করছে। পাতলা-পাতলা মেঘ ভেসে চলেছে আকাশে। চকচকে রোদ উঠেছে। মৃদুমধুর স্নিগ্ধ হাওয়া একটা আরামের আমেজ ব'য়ে আনছে। শান্ত সুখকর পরিবেশ। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। তামাকের মিষ্টি গন্ধে জায়গাটা ভুর-ভুর করছে। সবটা মিলিয়ে জীবনের এক অপরূপ সুধাস্বাদ যেন আস্বাদ্য হ'য়ে ধরা দিচ্ছে মানুষের কাছে। প্রফুল্ল অনেক আগে থাকতেই উপস্থিত ছিলেন। এইবার এলেন শরৎদা (হালদার), সত্যেনদা (মিত্র), হেমদা (মুখোপাধ্যায়), নীরদদা (মজুমদার) প্রমুখ। শ্রীশ্রীঠাকুর পরম স্নেহভরে সবার খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। পরে কাজ-কর্ম্মের সম্পর্কে বললেন—প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীকে actively (সক্রিয়ভাবে) fire up ও flare up (প্রবুদ্ধ ও দ্যুতিদীপ্ত) ক'রে যাজনে ব্রতী ক'রে তুলতে হবে। অল্পদিনের মধ্যে, যেমন চেয়েছি, তেমন দেড় লাখ লোক দীক্ষিত করাই লাগবে। এটা হ'লে

এর উপর দাঁড়িয়ে অনেক কাজ করা যাবে। এখন অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে এই কাজ করা লাগে। ঢিলে হ'লে হবে না। মনে রেখো—আচার্য্যে নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ থাকলে দীক্ষা মানুষকে দক্ষই ক'রে তোলে—প্রীতি-উচ্ছল সম্বেদনা নিয়ে। ধৃতি ও কৃতি দুই-ই দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। সাথে-সাথে মানুষের সংহতি ও দক্ষতাও বেড়ে যায়।

হেমদা—আমি চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিকী করিয়ে নিতে পারলে তো চাকরীর উপর হ'য়ে যাবে। টক-টক ক'রে কাম সেরে ফেলা লাগে। আর, চেষ্টা করা লাগে যাতে division (ভাগ) হ'লেও আত্রাই, বড়াল, পদ্মা, হরিণঘাটা, বিশখালি—এমনতর boundary (সীমানা) হয়।............একটা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে ব'সে সৎসঙ্গীদের খুব ক'রে মাতিয়ে তুলতে হয়, যাতে প্রত্যেকেই যাজন ক'রে maximum number (সবচাইতে বেশী সংখ্যা) initiate (দীক্ষিত) করায়। মানুষ সংগ্রহ হ'লে তার ভিতর-দিয়ে সব হবে।

সত্যেনদা—মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের সমাজের কল্যাণের জন্য টাকা দেবার প্রবৃত্তি খুব দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা দেবার প্রবৃত্তি সকলেরই আছে। টাকা দেয়ই বা কাকে? আর টাকা নেয়ই বা কে? লোক-কল্যাণই যার একমাত্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র স্বার্থের যে ধার ধারে না, তার হাতে টাকা তুলে দেবার জন্য মানুষ পাগল হ'য়ে ওঠে।

বিকালে হাউজারম্যানদার মা এলেন।

ভারতের স্বাধীনতা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যদি একজন British statesman (ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি) হতাম, তাহ'লে আমি ভারতকে এমনভাবে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলতাম, যাতে ভারত ব্রিটেনের প্রতি চিরকাল সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থাকে। Communal award (সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা) থেকে সুরু ক'রে ব্রিটেন পর-পর যা' করছে, তাতে বিভেদই প্রশ্রয় পাচ্ছে। ভারত যদি বিভক্ত হয়, তা' কোন অংশের পক্ষে শুভ হবে না। আর আমি বুঝি—অন্যকে দুর্ব্বল ক'রে রাখা মানে নিজেকেও প্রকারান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত করা।

মা—স্বাধীনতা-সংরক্ষণ সহজ ব্যাপার নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব জিনিসের জন্যই যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জ্জন করতে হয়। স্বাধীন বলতে বোঝা যায় তাকেই যে প্রবৃত্তির অধীন নয়। একটা দেশের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক প্রবৃত্তির অধীনতা থেকে অনেকখানি মুক্ত না হ'লে, সে দেশের সত্যিকার ভাল হ'তে পারে না।............এক সময় শুনেছিলাম, ব্রিটেন ভারতকে ডমিনিয়ন ষ্টেটাস দিতে চেয়েছিল। বর্ত্তমানে যা' হ'তে চলেছে, তার থেকে অখণ্ড ভারতের ডমিনিয়ন ষ্টেটাস হওয়া ভাল ছিল। তার উপর

দাঁড়িয়ে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারত। ভারত বিভাগের প্রস্তাব উঠেছে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের থেকে। দেশ-বিভাগ হ'য়ে গেলেই এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস মিলিয়ে যাবে না, বরং তখন আরও গাঢ় হবে। দু'টি দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ব্যবস্থার উপর তা' যেমন প্রভাব বিস্তার করবে, তেমনি দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককেও তা' কলুষিত করবে। দেশ বিভাগ করা মানে আমি বুঝি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে জীইয়ে রাখার ব্যবস্থা করা। এতে কোন অংশই স্বদেশের উন্নতির দিকে নিশ্চিন্ত মনে আত্মনিয়োগ করতে পারবে না। প্রত্যেকেরই অনেকখানি energy (শক্তি), ability (সামর্থ্য) ও resources (সম্পদ্)-এর অযথা অপব্যয় হবে।

মা—বাইরের কোন দেশ যদি ভারতের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে তাহ'লেই ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবস্থাদৃষ্টে অনেকের মনে হয় ইংরেজরাই চায় division of India (ভারত-বিভাগ)। তাতেই সমস্ত জিনিসটা ঘোলাটে হ'য়ে যাচ্ছে। কারও যদি এতে ভাল হ'তো, তাহ'লে একটা satisfaction (তৃপ্তি) ছিল যে এক পক্ষের অন্ততঃ লাভ হ'লো। কিন্তু এটা সবার পক্ষেই পুরোপুরি লোকসানের কারবার।

মা—অতীত-সম্বন্ধে বেশী ভেবে লাভ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতীত-সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা চিন্তা করা প্রয়োজন যাতে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা ভবিষ্যৎকে সুষ্ঠুভাবে mould (নিয়ন্ত্রিত) করতে পারি। আমরা অতীতে যদি কোন ভুল ক'রে থাকি, আত্মবিশ্লেষণ ক'রে নিজেদের শোধরাতে পারি, যাতে অমনতর ভুল আর না ঘটে। ভাল যা' করেছি তা' কিভাবে maintain (রক্ষা) করা যায় এবং আরও ভাল ক'রে করা যায় তাও আমরা ভেবে-চিন্তে স্থির করতে পারি। শুধু ভাবলে হবে না, করা চাই বিহিতভাবে।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় আব্দুলগণি ওয়ারসো নামক এক ভদ্রলোক আসলেন।

তাঁকে বসতে দেওয়া হ'লো।

বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিভরে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছেন ?

শ্রীযুত ওয়ারসো—ভাল আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায় ছিলেন ?

শ্রীযুত ওয়ারসো—আমি এখানে ছিলাম না, এখানে থাকলে তো মাঝে-মাঝে আসতাম।

এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা নিখুঁত না হ'তে পারে, কিন্তু আমার প্রকৃতিই হ'চ্ছে—যা'র উপর depend (নির্ভর) করি, কাটায়-কাটায় তা করি।

নইলে সুবিধা হয় না। ভাল-মন্দ গুণাগুণ ঠিকমত বোঝা যায় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—মুসলমানদের মধ্যে varietal grouping (বর্ণ) নেই?

শ্রীযুত ওয়ারসো প্রথমে কথাটার তাৎপর্য্য বুঝে নিলেন, তারপর বললেন—আমাদের মধ্যে আমাদের ভাবে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শুনে খুশি হ'য়ে বললেন—Fundamental (মূল) যা'-কিছু, এমন-কি detail-এও (খুঁটিনাটিতেও) সব এক। আলাদা নেই। পূর্ব্ববর্ত্তীকে, নিজ বংশকে ও পরবর্ত্তীকে যারা স্বীকার করে, হিন্দুরা তাদের সবাইকেই স্বীকার করে। এই তিনটেকে যদি স্বীকার না করা হয়, তাহ'লেই গোলমাল হয়। পূর্ব্ববর্ত্তীকে স্বীকার না-করাও অন্যায়, পরবর্ত্তীকে স্বীকার না-করাও অন্যায়। এতে বিচ্ছেদ এসে যায়। ধারাবাহিকতা থাকে না। মুসলমানরা যদি যীশুকে না মানে, তাও যেমন তাদের পক্ষে অন্যায়, আবার খ্রীষ্টানরা যদি রসুলকে না মানে, তাও তাদের পক্ষে তেমনি অন্যায়। আমাদের শাস্ত্রে তাই বলে, প্রেরিতপুরুষ পূর্ব্বে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে যেমন মানতে হবে, বর্ত্তমানে যদি কেউ এসে থাকেন, তাঁকেও তেমনি মানতে হবে, আর ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন, তাঁদের প্রত্যেককেও মানতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই রকমটা যদি চলে, তবে নানা সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থাকবে না।

শ্রীযুত ওয়ারসো—এ-কথা বলা চলে যে ভগবান গুরুরূপে দেখা দেন। যে প্রকৃত গুরুকে দেখেছে, সে ঈশ্বরকে দেখেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যদি হয় তবে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর বিদ্বেষ করলে দুই-ই কাফের হ'য়ে দাঁড়ালো।…………আমি যদি ইসলামের অনুবর্ত্তী হ'তে চাই, তাহ'লে আমাকে আজ নাম বদলাতে বলা হবে, কিন্তু রসুল তো তেমন কথা বলেননি। ইসলামকে যে-কোন লোক নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে অনুসরণ করতে পারে। আমি initiation-এর (দীক্ষার) মানে বুঝি, কিন্তু conversion-এর (ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের) মানে বুঝি না। আমি বুঝি, হজরত রসুলকে না ধরলে খোদাকে পাওয়া যায় না, আবার পীরকে না ধরলে রসুলকে পাওয়া যায় না। আমরা রসুলকে পরিবেষণ করতে পারিনি। আমরা অন্য মহাপুরুষদের নিন্দা ক'রে রসুলকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছি। এতে অনেক পাপ হয়েছে। আমাদের দোষে অনেক Prophet (প্রেরিতপুরুষ)-কে মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। Prophet-রা (প্রেরিতপুরুষরা) ভগবানের রাস্তা। যাজনের দোষে মানুষ Prophet (প্রেরিতপুরুষ) ও ভগবান থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এতবড় অপরাধ আর নেই। আমি ভাবি, মানুষ আর যেন বঞ্চিত না হয়!

শ্রীযুত ওয়ারসো—সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে এমন একটা আত্মীকরণী শক্তি আছে যাকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা ভয়ের চোখে দেখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভয় করা মানে না-জানা। সবাই যে মূলতঃ একই ধর্ম্মের অনুসরণ করছে। কারণ, ধর্ম্ম কখনও দুই হয় না। আর, ধর্ম্ম চিরকালই শাশ্বত ও সনাতন। একই তত্ত্ব নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গীতে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রকমে প্রকাশিত হ'চ্ছে। ধর্ম্ম মানে তাই, যা' দিয়ে সত্তা-সম্বর্দ্ধনা বিধৃত হয়। তাই, জীবনের কারবারে যা'-যা' লাগে সে-সবগুলি এমন ক'রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগে যাতে বৃদ্ধি ছাড়া ক্ষয়কে আমন্ত্রণ করতে না হয়। বিবাহ মানুষের জীবনে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ, বিবাহকে অবলম্বন ক'রেই মানুষ জন্মে ও জাতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। বিবাহকে ধর্ম্মের পরিপোষণী করাই বিধি। হিন্দুদের নিয়ম ছিল উঁচুকে নীচু করব না, নীচুকে উঁচু করব। তাই প্রতিলোম-বিবাহের সমর্থন ছিল না, কিন্তু অনুলোমের বিধান ছিল। সবর্ণ-বিবাহ তো ছিলই। আহার-বিহার-সম্বন্ধে সদাচারের বিধান ছিল যাতে শরীর-মন সুস্থ ও পবিত্র থাকে, আয়ু বৃদ্ধি পায়।

শ্রীযুত ওয়ারসো—বংশের পবিত্রতা রক্ষা ও আহারশুদ্ধির কথা ইসলামেও আছে। জন্মান্তর-সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও হাদীসে এমন কতকগুলি কথা আছে, যেগুলিকে জন্মান্তরের সমর্থনসূচক ব'লে মনে করা যেতে পারে, কোরবানির মূল তত্ত্বের সঙ্গেও হিন্দুশাস্ত্রের খুব মিল আছে। ইব্রাহিম তাঁর ছেলে ইসমাইলকে কোরবানি করতে গিয়েছিলেন। খোদাতালা তখন ইসমাইলকে সরিয়ে নিয়ে একটা দুম্বাকে সেখানে রেখে যান। পরে ইব্রাহিম নিরাশ হ'য়ে নির্জ্জনে ধ্যান করতে গেলেন। খোদাতালার বাণী হ'লো—'তখন আমি তোমাকে ইন্দ্রিয় কোরবানি করার কথা বলেছি। তুমি এ কী করতে গিয়েছিলে?'

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলি কথার অর্থ বর্দ্ধন। আর, বধ করতে হবে তাই যা বর্দ্ধনের বিপরীত।

শ্রীযুত ওয়ারসো উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আপনাদের কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ থেকে যে কথাই বেরোক না কেন তা' then and there (তৎক্ষণাৎ) record (লিপিবদ্ধ) করবেন। চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে attend ক'রে (তাঁর কাছে উপস্থিত থেকে), যখন যা' বেরোয় লিখবেন। আমার ধারণা গুরুবাক্যই মূল শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রপাঠে মানুষের প্রভূত উপকার হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাস্ত্র আমাদের জীবনকে শাসিত করতে সাহায্য করে। আমরা যদি শাস্ত্র পড়ি, অথচ জীবনকে তেমন ক'রে গঠন না করি তবে শাস্ত্র পড়াই হয় না।

২৭শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ১২।৭।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বাইরে একটা ইজিচেয়ারে বসেছেন। হাউজারম্যানদার মা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যোগেনদা (হালদার), শরৎদা (হালদার), আশুভাই (ভট্টাচার্য্য), প্রিয়নাথদা (সেনকর্ম্মকার) প্রমুখ কাছে আছেন।

শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষ শোকার্ত্ত হ'লে কিসে সত্যিকার সান্ত্বনা পায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহানুভূতি ও ভালবাসা হ'লো প্রথম প্রয়োজন। সহানুভূতি ও ভালবাসা যার কাছ থেকে পায় স্বভাবতঃই তার প্রতি ভালসবাসা গজায়। ঐ মানুষটি যদি আবার ভগবদ্ভক্ত হয়, তবে তাকে ভালবেসে ভগবানকে ভালবাসতে শেখে। আর, ভগবানকে ভালবাসতে পারলেই, শোকে প্রকৃত সান্ত্বনা হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদার মাকে বললেন—অবতার-মহাপুরুষকে ভাল না-বাসতে পারলে ভগবানকে ভালবাসা যায় না। অবতারপুরুষে প্রকৃত অনুরক্ত যাঁরা, তাঁদের ভালবেসেও মানুষ অনেকখানি উপকৃত হয়।

যুক্তির কার্য্যকারিতা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের যুক্তি যখন জীবন ও ভগবানকে অগ্রাহ্য করে, সে-যুক্তি শয়তানের। ভগবান মানে জীবনের উৎস যিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রিয়নাথদাকে বললেন—যেয়ে ভীমবেগে লেগে যাও। প্রত্যেকটি সৎসঙ্গী যদি ২০।২৫ জন initiate (দীক্ষিত) করায় তবে ক'দিন লাগে ?

প্রিয়নাথদা—আমি নানা প্রয়োজনে আটকে পড়ায় এদিকে তেমন সময় দিতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের প্রয়োজনের ধান্ধায় যখনই আমরা ভগবানের সেবা থেকে বিচ্যুত হই, তখনই আমরা পতিত হই।

আশুভাই কলকাতা থেকে এসেছেন। বাউণ্ডারী কমিশনের কাছে সৎসঙ্গের তরফ থেকে দরবার করা সম্পর্কে কী হয়েছে না হয়েছে, সে-সম্বন্ধে কেষ্টদা জানতে চাইলেন।

আশুভাই—আমি ভেবেছি, আপনি চিঠি পেয়েছেন, তাই অতো শুনে আসিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেও তোর শুনে আসা উচিত ছিল। এই যে শুনে আসিসনি এটা হ'লো want of inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসার অভাব), এতে নিজেরই ক্ষতি হয় বেশী।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—আমি দেখি, আমাদের প্রধান-প্রধান রীতিনীতির সঙ্গে কা'রও এতটুকু গোলমাল নেই। হাউজারম্যানের মা বললেন—সাধারণতঃ রোমান ক্যাথলিকরা প্রটেষ্ট্যাণ্টদের মেয়ে নেয়, কিন্তু প্রটেষ্ট্যাণ্টদের মেয়ে দেয় না। মুসলমানদের মধ্যেও বিয়ে-থাওয়ার প্রথা অনেকটা

ঐ ধরণের ব'লে শুনেছি।

হিন্দুস্থান-পাকিস্তান-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বুঝি, পাকিস্তানে হিন্দু অধীন নয়, হিন্দুস্থানেও মুসলমান অধীন নয়। উভয়ে সরিক, এক মায়ের পেটের দুই ভাইয়ের মত। একের সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্যে অন্যের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। সেই অনধিকার-চর্চা রোধ করার দায়িত্ব হ'লো রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র যদি সেই দায়িত্ব পালন করতে না পারে, তবে প্রমাণ হ'য়ে যায়, সে-রাষ্ট্র রাষ্ট্র নামের যোগ্য নয়।

২৮শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৩।৭।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে আমতলায় একখানি ইজিচেয়ারে এসে বসেছেন। শরৎদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), গুরুদাসভাই (বন্দ্যোপাধ্যায়), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান রামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে এরই মধ্যে লোকের মনে একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁকে আপনারা ভাল ক'রে পরিবেষণ করবেন যাতে লোকে বুঝতে পারে। তিনি ছিলেন জীবন্ত ধর্ম্ম, তাঁকে বোঝা মানে ধর্ম্মের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা। ধর্ম্ম তাঁর মধ্যে সহজ হ'য়ে ফুটে উঠেছিল। তাই, তাঁর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না। জীবনের সবক্ষেত্রে ধর্ম্ম যত সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে, ততই মানুষের বাঁচোয়া। ভক্তিযুক্ত সেই সহজ জীবনের কথাই ঠাকুর ব'লে গেছেন। এর মধ্যে কৃত্রিমতা, কপটতা বা কুণ্ঠার বালাই নাইকো। হজরত রসুল ব'লে গেছেন—'ধর্ম্ম'-সম্বন্ধে কখনও বাড়াবাড়ি করবে না।' অর্থাৎ just to the line, just to the level (ঠিক পথে, ঠিক মাত্রায়) চলবে। ধর্ম্ম হ'লো বিজ্ঞান। যথাযথতা এর একটা প্রধান কথা। যা' করলে ধর্ম্ম হয়, তাই করলেই ধর্ম্ম হয়। আবোল-তাবোল করলে হয় না। ইষ্টানুগ সঙ্গতি নিয়ে নিজের ও পরিবেশের বাঁচা-বাড়া যাতে অব্যাহত থাকে, তেমন ক'রে চলাই ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের গুরু ঘোর আঙ্গিরস নাকি তাঁকে বলেছিলেন—'অচ্যুতো ভব'। ঐটে হ'লো ধর্ম্মের প্রধান কথা। রসুলের কথাও কত চমৎকার। তিনি নাকি বলেছিলেন—তোমার নিজ ধর্ম্মমতে নিষ্ঠা রাখবে, কিন্তু অপরের ধর্ম্মমতকে শ্রদ্ধা করবে। এমন-কি, অপরের ধর্ম্মস্থান যদি অসংস্কৃত থাকে, তাও সংস্কার ক'রে দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলতে-বলতে ঘাড় ফিরিয়ে শরৎদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আছে না ?

শরৎদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায় ?

শরৎদা—আমি ছোটদের পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিলাম। কার লেখা স্মরণ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক রাখা উচিত ছিল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ উঠে যেয়ে ভাল হয়নি। শুনেছি, বৃহস্পতি রঘুনন্দনের ঠিক পূর্ব্বেকার স্মৃতিকার। তাঁর মধ্যেও অনুলোমের সমর্থন পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, রঘুনন্দন বাইরের কোন চাপে প'ড়ে অনুলোম নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। অনুলোম স্থগিত হ'লে যাদের স্বার্থ সিদ্ধ হয়, এমন কোন প্রবল পক্ষের চাপ বা কৌশল বা প্রলোভন এর পিছনে থাকা অসম্ভব নয়। এর পর থেকে চাকা ঘুরে গেল। আমাদের মেয়েরা বাইরে যেতে লাগলো। কিন্তু বাইরের যারা, তাদের আমাদের সমাজে স্থান পাওয়ার পথ রুদ্ধ হ'য়ে গেল। এমনি ক'রে সমাজ দুর্ব্বল হ'তে লাগলো। রঘুনন্দন নাকি নারদপুরাণের নজীর দেখান। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ হ'লে শ্রুতি যেমন গরীয়সী, প্রামাণ্য স্মৃতি ও পুরাণ-উপপুরাণে বিরোধ হ'লে তেমনি প্রামাণ্য স্মৃতিই অনুসরণীয়। এইতো আমি বুঝি। তাই, রঘুনন্দনের দোহাই দিয়ে অনুলোম বন্ধ ক'রে রাখা সঙ্গত নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কৌলীন্যপ্রথার বিকৃতি যা' হ'য়েছে, আমি তার সমর্থন করি না। কিন্তু প্রকৃত কৌলীন্য ও আভিজাত্যের মাথায় ডাঙ্গস না মেরে, তাকে গজিয়ে তোলাই ভাল ব'লে মনে হয়। সদ্‌গুণগুলিকে যদি কুলবৈশিষ্ট্যের পর্য্যায়ে নামিয়ে না-আনা যায়, তবে প্রত্যেক generation-এ (পুরুষে) কেঁচে গণ্ডূষ করতে হয়।

উপস্থিত কারও লক্ষ্য না পড়তেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদার মাকে দূর থেকে দেখেই একখানি চেয়ার আনতে বললেন।

অরুণ (জোয়ার্দ্দার) একখানি চেয়ার এনে পেতে দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটু সরিয়ে দে। যখনই যা' করবি, চারিদিকে ভেবে-চিন্তে করবি, যাতে সুন্দর হয়, সুখের হয়, সুবিধার হয়।

অরুণ শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত-মত চেয়ারটা সরিয়ে দিল।

তখন তিনি বললেন—চেয়ারটার সঙ্গে জায়গা ক'রে বেঞ্চখানাও ঠিকমত জায়গায় বসা। সুন্দর ও নিখুঁতভাবে কাজ করতে-করতে মানুষ নিজেও সুন্দর ও নিখুঁত হ'য়ে ওঠে।

শৈলেনদা—গীতায় আছে যে যখন-যখন ধর্ম্মের গ্লানি হবে, তখন-তখনই ধর্ম্ম সংস্কারের জন্য প্রেরিতপুরুষের আবির্ভাব হবে। মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে কি কোন গ্লানি হয়নি ? ওদের মধ্যে তাঁর আর আবির্ভাব হ'চ্ছে না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কোন জাতির মধ্যে তাঁর আবির্ভাব হোক না কেন, সে

আবির্ভাব সবার জন্যই। রামকৃষ্ণদেব শুধু বাংলার জন্য নন, শুধু ভারতের জন্য নন, তিনি সারা জগতের জন্য, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সবার জন্য। তিনি আসেন এক জায়গায়, এক জাতির মধ্যে। কিন্তু আসেন সবার পরিপূরণ-মানসে। আর, এই পরিপূরণ করতে গিয়ে কারও বৈশিষ্ট্যে আঘাত তো করেনই না, বরং তাকেই আরও উজ্জীবিত ও উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তোলেন। তাই, জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে যে-কেউ তাঁকে গ্রহণ ক'রে উপকৃত হ'তে পারে।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—এবার শরৎদারা তাহ'লে পারশব বিপ্রদের উপনয়নের কথা চারিয়ে দেবেন তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। আপনি শাস্ত্রে যা' পেয়েছেন, তার উপর দাঁড়িয়ে সাহস দিলেই হয়।

কেষ্টদা—'অশূদ্রানাম্ অদুষ্টকর্ম্মনাম্ উপনয়নম্'—শ্রুতির এই উক্তিই ঐখানে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আর, মনুসংহিতার মতে বিপ্রের অনুলোমজ সন্তান দ্বিজধর্ম্মী। সুতরাং পারশবরা যে অশূদ্র সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদের জীবিকা প্রধানতঃ কৃষি। কৃষি অতি পবিত্র কর্ম্ম। তাই কোন দিক দিয়ে আপত্তির কারণ দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেই হ'লো।

জননবিজ্ঞান-সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সন্তান gene-এর (জনির) মাধ্যমে পিতামাতা উভয়ের traits-ই (গুণাবলী) পায়। কিন্তু মায়ের gene (জনি)-গুলি mainly (প্রধানতঃ) nurturing agent (পরিপোষণী উপাদান) হিসাবে কাজ করে ব'লে মনে হয়। উভয়ের gene (জনি) যদি compatible (সঙ্গতিশীল) না হয়, তাহ'লে সন্তান কখনও সুস্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'তে পারে না। সবর্ণ বিবাহের ব্যাপারেও এই ব্যতিক্রম হ'তে পারে। তার ফল কখনও ভাল হয় না। তাই কুল, শীল, প্রকৃতি, সংস্কার, আচার, প্রথা ইত্যাদির মিল ক'রে বিয়ে দেওয়ার রীতি আছে আমাদের মধ্যে। বিয়ে যে কত বড় vital (গুরুত্বপূর্ণ) ব্যাপার, তা' অনেকে খেয়াল করে না। কিন্তু ওর উপর দাঁড়িয়েই সব। কারণ, ওর উপর দাঁড়িয়েই জন্ম। আর, জন্মগত adjustment (বিন্যাস)-এর উপর দাঁড়িয়েই মানুষের চলন, চরিত্র, কর্ম্ম ও প্রাপ্তি। টাকা থাকলে laboratory (পরীক্ষাগার) ক'রে মানুষ appoint (নিয়োগ) ক'রে আমি অনুলোম-প্রতিলোম ইত্যাদি সম্বন্ধে scientific research (বৈজ্ঞানিক গবেষণা) করাতাম। ওদের দেশে মানুষের জন্ম-ব্যাপারে এখনও এ line-এ (ধারায়) research (গবেষণা) হয়নি। ওদের এ conception (ধারণা) নেই।

শরৎদা—'প্রতিলোমে কুপোকাত, বিশ্বাসঘাতক বংশপাত।' বংশপাত মানে কী ? প্রতিলোমই তো বাড়ছে। এদের তো extinct (বিলুপ্ত) হ'তে দেখি না।

্র—বংশপাত মানে original pure trait perverted and lost (মূল পবিত্র গুণ বিকৃত এবং লুপ্ত)। আর, এতে যে প্রকৃতি হয়, তার দরুনই পরিণামে নিপাত হয়।

চক্রপাণিদা—বাইবেলে আছে—যদি কেউ স্ত্রীলোকের দিকে কামদৃষ্টিতে তাকায়, তাহ'লে সে ব্যভিচার করে। নিজের স্ত্রীর বেলায়ও কি একথা খাটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-কথা আমার কথার সঙ্গে মেলে। নিজের স্ত্রীর বেলায়ও সে যদি solicit (আমন্ত্রণ) না করে, আমি কখনও নিজে থেকে তাতে উপগত হ'তে যাব না। অমনতর উপগতি ব্যভিচারেরই নামান্তর। ওতে বংশ দুর্ব্বল হয়, deteriorate করে (অধোগামী হয়)।

প্রফুল্ল—অল্প পয়সার মধ্যে এমন কী খাওয়া যায়, যাতে শরীরে বেশ বল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের যা' ক'রে গেছে, তার তুলনা নেই। ঐ আতপ চাল, কাঁচকলা, ডাল, সৈন্ধব, দুধ, কলা, ঘি—এক-কথায় হবিষ্যান্নই সেরা খাদ্য। তিল ও কাঠবাদামটা খুব উপকারী। কাঠবাদাম ঘসে খেতে হয় মিষ্টি দিয়ে। কাঠবাদাম ও দুধ এই দু'টি জিনিসের নাকি প্রচুর soluble protein (দ্রবনীয় প্রোটিন) পাওয়া যায়। ছানা হজম করা শক্ত। তাই, দুধ কাটার কথা বারণ ছিল আগে। এখনও অনেক জায়গায় দুধ কাটে না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হিন্দুদের কৃষ্টিবিমুখতার একটা প্রধান কারণ চাকরী করা। চাকরী করতে গিয়ে অনেকে শুধু সাহেবদের খুশি করার তালে ছিল, আর কিছুর ধার ধারতো না। চাকুরে লোকগুলিই ছিল আবার সমাজে প্রতিপত্তিশালী। অনেকেই ওদের অনুকরণ করতে চাইতো। এইভাবে সাধারণ লোকের ঝোঁকই বিকৃত হ'য়ে গেছে। ঠাকুরদের এষ্টেটে চাকরী পেলাম, পঞ্চাশ টাকা মাইনে, ফ্রি-কোয়ার্টার। Appointment letter (নিয়োগ-পত্র) হাতে পেয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। শেষটা সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বাঁচি। তখন মা-বাবা কাউকে কিছু বলিনি। অনেক পরে বলেছিলাম। আমি ছিলাম rejected son (পরিত্যক্ত ছেলে)। আচার্য্য-ঠাকুরও আমার সম্বন্ধে কখনও কোন আশার কথা বলেনি। আর সবার কথা ভাল বলতো। আমার কথা উঠলে খারাপ ছাড়া কিছু বলতো না। কী আর করব? আপনমনে এৎফাকি কাম করতাম। হয়তো চাঁদের দিকে চেয়ে তন্ময় হ'য়ে নাম করতেছি। আর-একটা রোখ ছিল—কিছুই না বুঝে ছাড়তাম না। pursue (অনুসরণ) করতাম। ভাঁটির পাতা খেয়ে পেটের ব্যথা হয়, তাই দেখে মনে হ'লো, ভাঁটির পাতা না খেয়ে যদি ঐ রকম পেটের ব্যথা হয়, তবে ভাঁটির পাতায় তা' সারতে পারে। বাস্তবে ক'রে দেখলাম—সত্যিই তাই হয়। ঐরকম কত রকম যে করেছি। শুধুই ভেবে ক্ষান্ত হতাম না, ক'রে দেখতাম। এইভাবে যা' জানা যায়, সে-সম্বন্ধে

আর কোন সংশয় থাকে না। মনে জাগতো এক মাটিতে এত গাছ, এত ফল। এ কেমন ক'রে হয়, ভেবে কুল পেতাম না। রহস্য ভেদ করতে না-পেরে এক-এক দিন কেঁদে ফেলতাম। কত গাছ উপড়ে-উপড়ে দেখতাম। শেষটা লক্ষ্য গেল বীচির দিকে। তখন স্বস্তি পেলাম।

ছেলেবেলায় মনে হ'তো মেয়েছেলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের প্রাণী। পুরুষের বোধ-বিচার ইত্যাদির সঙ্গে ওদের কোন মিল নেই। ওরা বোধ করে একরকম। কিন্তু পুরুষের দেখাদেখি তার বোধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের বোধটাকে সেইভাবে প্রকাশ করে। একদিন যখন খবর পেলাম—একটা মেয়েছেলের পেটে ছেলে হয়েছে, তখন মেয়েদের প্রতি খুব সম্ভ্রম বেড়ে গেল। ভাবলাম, ওদের পেটে মেয়েও হয়, ছেলেও হয়। ওদের অসাধ্য তো কাণ্ড নেই। ওরা তাহ'লে সবই বোঝে।

একজন পড়াশুনাওয়ালা জ্যোতিষী-সম্বন্ধে কথা উঠলো, সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'অনেক বিদ্যা শিখিল, প্রসঙ্গ না বুঝিল', তেমনতর মানুষ দিয়ে কাজ হয় না। Application-টা (প্রয়োগটা) বড় জিনিস। অল্প জেনেও application (প্রয়োগ) ঠিকভাবে করতে পারলে কাজ বেশী হয়।

দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীদাকে (রায়চৌধুরী) বললেন—প্রত্যেককে এমন ক'রে ছেড়ে দেবে যাতে তার ভিতর একটা দুরন্ত লোভ জম্মে যায় রোজ যাজন ক'রে লোককে দীক্ষিত কারবার জন্য। নিজে পাগল সাজা লাগে, তবে অন্যে পাগল হয়।

২৯শে আষাঢ়, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ১৪। ৭। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষের উপর বিছানায় ব'সে আছেন। আকাশে মেঘ আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন। কেষ্টদা ও ছোড়দা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুশিমনে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কাজের পথে অনেক নিন্দামন্দ, সমালোচনা ইত্যাদি আসে। ওদিকে ভ্রূক্ষেপ করতে নেই। ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে করণীয় যা' নিখুঁতভাবে ক'রে যেতে হয়—পরিবেশের সঙ্গে শুভসঙ্গতি নিয়ে। আত্মবিশ্লেষণ করতে হয়, নিজের ভুলত্রুটি যেগুলি আছে, সেগুলি ক্রমাগত শুধরে চলতে হয়। কারও অহংকে অযথা আঘাত করতে নেই। মানুষের দোষত্রুটি একদিনে যায় না, সে-সম্বন্ধে কঠোর হ'তে নেই, স'য়ে-ব'য়ে ভালবেসে প্রত্যেককে আত্ম-সংশোধনে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়। তবে নিজের প্রতি কঠোর হওয়া লাগে। তাই দেখে মানুষ শেখে। নিজের নিরীখ ঠিক রেখে চলা লাগে। অমুকে এক কথা ক'লো,

অমুকে এক কথা ক'লো—তার দ্বারা coloured (রঙ্গিল) হ'লে কাজ করা মুশকিল। আমি সবার কথাই শুনি, কিন্তু কারও কথায় coloured (রঙ্গিল) হই না। বরং ভুল থাকলে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে চেষ্টা করি। অপরের সম্বন্ধে দোষদৃষ্টি রাখা ভাল নয়। ওতে চলার পথে অযথা একটা barrier (অন্তরায়) সৃষ্টি করা হয়। নিজেরও লাভ হয় না। অন্যেরও ভাল হয় না। দোষদৃষ্টি ও নিন্দার প্রবৃত্তি একটা positive disqualification (বাস্তব অবগুণ)। আমি বলি, অন্যের সমালোচনা দিয়ে কাম কী? তুমি নিজে ইষ্টের পথে অটুট হ'য়ে চল এবং অন্যকেও সেই পথে চলতে সাহায্য কর। তাই দিয়ে হবে তোমার ক্ষমতার বিচার। Environment (পরিবেশ) যদি খারাপই হয়, সেখানে তোমার করণীয় হ'চ্ছে—নিজের example (দৃষ্টান্ত) দিয়ে, effort (চেষ্টা) দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, তাদের mould (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে তোলা। এই করলেই মানুষ সপরিবেশ ঠেলে ওঠে। শুনেছি, বুদ্ধদেবকে সুজাতার হাতে পায়েস খেতে দেখে তাঁর পাঁচজন শিষ্য তাঁর উপর চটে গেল। তাদের মনে সন্দেহ আসলো এবং তারা তাঁকে ছেড়ে চ'লে গেল। বুদ্ধদেবকে অতো ঘনিষ্ঠভাবে জানা সত্ত্বেও যাদের তাঁর উপর সন্দেহ আসলো, বুঝে দেখো, তারা কী মেকদারের লোক। বুদ্ধদেব কিন্তু এ দেখে নিরাশ হলেন না। তিনি সারনাথে গিয়ে তাদের ধরলেন এবং তাদিগকেই প্রবুদ্ধ ক'রে তাদের দিয়ে কত কাম করালেন। মানুষের পিছনে ঐরকম লেগে থাকতে হয়। বড়খোকা ও মণির ঐ ধরণের trait (গুণ) আছে। কাজলও বেশ পারে। একটা লোক ওকে দারুণ hate (ঘৃণা) করতো। তা' ও কেমনভাবে intuitively (সহজ জ্ঞানে) যেন বুঝেছিল। কেমন ক'রে তার সঙ্গে মিশতো, তাকে আম-টাম, এটা-ওটা খেতে দিত, পাকা চুল তুলে দিত। ও যত আপ্যায়িত করতো, সে তত কাচুমাচু হ'য়ে যেত। এইভাবে তাকে ধীরে-ধীরে কাবেজ ক'রে ফেললো।

এরপর দেশের বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরমপিতার ইচ্ছাপূরণের জন্য যদি man (মানুষ), money (অর্থ) ও resource (সম্পদ্) বিপুলভাবে সংহত ক'রে তুলতে পারেন তবে তার মাধ্যমে সারা দেশকে একগাট্টা ক'রে তোলা শক্ত হবে না। একটা divine unifying platform (ভাগবত ঐক্যবিধায়নী মঞ্চ) create (সৃষ্টি) করা ছাড়া পথ নাই। আপনাদের এই যে platform (মঞ্চ) এতে কারও সত্তাপোষণী স্বার্থ ও বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হবার নয়। মানুষকে মারতে শেখান বা মরতে শেখানয় লাভ নেই। মানুষকে শেখাতে হবে, সে যাতে বাঁচতে পারে ও বাঁচাতে পারে এবং তার পরিপন্থী যা' তাকে বীর্য্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে পারে। এই জীবনীয় শিক্ষাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের ব্যত্যয় যেখানে যা' হয়েছে, তা' অপসারণ ক'রে প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তা' সব সম্প্রদায়ের মধ্যে,

সব দেশের মধ্যে, সব জাতির মধ্যে। আগে ভারতের মধ্যে এই জিনিসটার রূপ দিতে হবে, তারপর সারা জগতে তা' ছড়িয়ে দিতে হবে।

৩০শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ১৫।৭।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আমতলায় ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), অমূল্যভাই (সেন), প্রতিভামা (সন্দীপার মা), কালিদাসিমা, হেমপ্রভামা, সুষমামা, সুশীলাদি, রেণুমা, রাণীমা প্রমুখ কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যে স্বাভাবিক বাউণ্ডারীর কথা ভাবছি (আত্রাই, বড়াল, পদ্মা ইত্যাদি) বাউণ্ডারী কমিশনের কাছে সে-সম্বন্ধে অনেক জায়গা থেকে application (আবেদন) ও resolution (প্রস্তাব) গেলে ভাল হ'তো। Funds ও hands (অর্থ ও কর্ম্মী) দুই-ই দরকার। দীক্ষিতের সংখ্যা ও কর্ম্মীর সংখ্যা বাড়লে অনেক কিছুই করা যায়। এত যে বিপদের বেড়াজাল, তবু মানুষের হুঁশ হয় না। প্রত্যেকে যার-যার নিজের স্বার্থ নিয়ে আছে। কিন্তু integration (সংহতি) না হ'লে যে কারও স্বার্থ টিকবে না, সে-কথা ভাবে না। বেশীর ভাগ লোকের nerve (স্নায়ু) এমন হ'য়ে গেছে যে পারিপার্শ্বিকের দুঃখকে দুঃখ ব'লে বোধ করে না, নিজের পায় হাতুড়ির বাড়ি না পড়া পর্য্যন্ত চেতে না।

রাজসাহী থেকে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এবং খুলনা থেকে দু'জন ভদ্রলোক এলেন। তাঁদের বসতে দেওয়া হ'লো। প্রাথমিক পরিচয়ের পর আলাপ-আলোচনা সুরু হ'লো।

ডাক্তারবাবু নিজের সম্পর্কে বললেন—চিন্তা ক'রে নিজের বুদ্ধিমত মানুষ চলে, কিন্তু তাতে সব সময় কৃতকার্য্যতা আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প'ড়ে-শুনে মানুষের understanding (বুঝ) হ'তে পারে, কিন্তু knowledge (জ্ঞান) জিনিসটা হয় বিহিত practice (অনুশীলন)-এর ভিতর-দিয়ে। হোমিওপ্যাথির ব্যাপারই ধরুন না কেন? বিধিমাফিক practice (অনুশীলন)-এর ভিতর-দিয়েই intuitive knowledge (অন্তর্দৃষ্টিসমন্বিত জ্ঞান) হয়।

ডাক্তারবাবু—পরমেশ্বরের দয়া ছাড়া তা' হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইজন্য প্রত্যেকের জীবনে আদর্শ গুরুর দরকার। তিনি আবার আচার্য্য হওয়া চাই। আচার্য্য মানে যিনি বাঁচা-বাড়ার বিধিকে আচরণের ভিতর-দিয়ে জেনেছেন এবং অনুসরণ ক'রে চলছেন। Auto-initiative (স্বতঃ-প্রণোদনা) নিয়ে তাঁকে জীবনসর্ব্বস্ব ব'লে গ্রহণ করা চাই, অনুসরণ করা চাই। একেই বলে দীক্ষা। দীক্ষায় আনে দক্ষতা। সেইজন্য ছিল

আমাদের জীবনের প্রারম্ভেই উপনয়ন। আচার্য্য-গ্রহণের কালে দেখতে হয় আচার্য্যের আবার আচার্য্য আছে কিনা। এবং সেই আচার্য্যের প্রতি তার নিষ্ঠা ও অনুরাগ কতখানি সক্রিয়। সক্রিয় নিষ্ঠা যেখানে, জ্ঞান ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সেখানে স্বতঃ।

ডাক্তারবাবু সহাস্যে বললেন—আপনার সঙ্গে কথা ব'লে খুব ভাল লাগছে। শুনেছিলাম, আপনি সবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'ন না, কিন্তু এখন দেখছি তা' তো নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোন কথার উপর দাঁড়িয়ে চললে কান বড় হ'য়ে যায়, চোখ হ'য়ে যায় ছোট। দেখে চললে চোখ বড় হয়, কান হয় ছোট। আর, দেখতে গেলেও মনগড়া ধারণার চশমা প'রে দেখলে হয় না। তাতে বাস্তবতা নির্দ্ধারণ করা যায় না। বাস্তবকে যদি জানতে না পারি, তাহ'লে আমরা বঞ্চিত হই।

এমন সময় হাউজারম্যানদার মা ও আউটারব্রিজদা আসলেন।

তাঁদের বসতে দেওয়া হ'লো।

তাঁরা বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিস্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—মা'র শরীর ভাল তো? (আউটারব্রিজদাকে বললেন)—তুমি ভাল আছ?

উভয়েই উত্তর দিলেন—হ্যাঁ!

পরিমলের সঙ্গে একদল ছেলে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের বললেন—যা, কেষ্টদার কাছে ব'স্ গিয়ে। (প্রফুল্লকে বললেন)—তুইও সঙ্গে যা।

কেষ্টদার কাছে যাওয়া হ'লো। তিনি অনেক কথা আলোচনা করলেন। আলাপ-আলোচনার পর প্রফুল্ল-সহ সবাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ফিরে আসলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কেষ্টদার সঙ্গে কথা হ'লো?

প্রফুল্ল—খুব সুন্দর কথা হ'লো। এরা খুব আনন্দ পেয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী-কী কথা হ'লো বল্। আমিও শুনি, ওরাও আর একবার শুনুক।

প্রফুল্ল—স্বাধীনতা-সম্পর্কে কেষ্টদা বললেন—একজন স্বাধীন মানুষকে অবলম্বন ক'রে যখন একদল স্বাধীন (স্ব-এর অধীন) মানুষের সৃষ্টি হয় এবং তারা যখন তাদের সেবা ও প্রীতি-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে power-এ (ক্ষমতায়) দাঁড়ায়, তখনই হয় দেশ স্বাধীন। সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তির অধীন হ'লে তত ক্ষতি হয় না, যত ক্ষতি হয় নেতা প্রবৃত্তির অধীন হ'লে। একজন নেতা প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় বিপথে পরিচালিত হ'লে, তার দ্বারা সারা দেশের বিরাট ক্ষতি হ'য়ে যেতে পারে। অসৎ-প্রবৃত্তি যেন কিছুতেই আমাদের বিচলিত করতে না পারে। তাহ'লে আমাদের যতই গুণ থাকুক না কেন, আমাদের দিয়ে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। প্রবীর অর্জ্জুনের চাইতে কম বীর ছিল না।

কিন্তু অসময়ে হঠাৎ তার ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের দিকে দুর্নিবার আকর্ষণ জাগায় তার পতন হ'য়ে গেল। তাই আত্মশুদ্ধি না ক'রে যা' করতে যাব, তা' শেষ পর্যন্ত আবোল-তাবোল হ'য়ে যাবে। এই আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন ইষ্টকে গ্রহণ ক'রে তাঁতে সুনিষ্ঠ হ'য়ে চলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর কী-কী কথা হ'লো ?

প্রফুল্ল—দারিদ্র্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো। কেষ্টদা বললেন—দারিদ্র্য জিনিসটা ভগবানের দান নয়। আমাদের দারিদ্র্যের জন্য অপরকে দায়ী করলেও চলবে না। চরিত্রে যতদিন হাত না পড়বে, আলস্য, অকৃতজ্ঞতা, আত্মম্ভরিতা, আত্ম-অবিশ্বাস, ঠুনকো মান যতদিন না যাবে, ততদিন দারিদ্র্য ছাড়বে না। বড়লোককে ঈর্ষ্যা করলে দারিদ্র্য ঘুচবে না। নিজেদের যোগ্যতা ও কর্ম্মক্ষমতা বাড়াতে হবে। দেশজোড়া যে গলদ, তা' শুধু একক চেষ্টায় অপসারণ করা যাবে না। পারিপার্শ্বিককে নিয়ে ধর্ম্মের পথে চলতে হবে। অর্থনিষ্ঠ হ'লে অর্থ-সমস্যার সমাধান হবে না। ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কর্ম্ম করতে হবে। কোন্‌টা অকর্ম্ম, কোন্‌টা বিকর্ম্ম, কোন্‌টা প্রকৃত কর্ম্ম তা' বুঝতে হবে। কর্ম্মের কৌশলও জানতে হবে। গীতায় আছে 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'। ইষ্টের সঙ্গে ভালোবাসার যোগ হ'লে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, কর্ম্মশক্তি খুলে যায়। ঐ মূল ঠিক থাকলে সব adjusted (বিন্যস্ত) হ'য়ে যায়। নইলে সংসার সমুদ্রে নেমে প্রবৃত্তির তলছা টানে ডুবে যেতে হয়। প্রতিকূলতাকে অতিক্রম ক'রে তার উপর জয়ী হওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাগুলি কেমন সুন্দর! Fascinating conviction (মনোমুগ্ধকর প্রত্যয়) থাকলে, কথাগুলিও বেরোয় গোছালো convincing (প্রত্যয়সন্দীপী) রকমে।

৩২শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৭।৭।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় এসে বসেছেন। কলকাতা থেকে আগত কেষ্টদা (চট্টোপাধ্যায়) এবং কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিকল্পিত আর্য্যরাষ্ট্রসঙ্ঘ কিভাবে রূপায়িত ক'রে তোলা যায়, সেই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আর্য্যদের অনুসৃত ঋষি-পারম্পর্য্য, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি, বিবাহনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি, দীক্ষা, তপস্যা ইত্যাদি যে কতখানি বিজ্ঞানধর্ম্মী তা' ব'লে শেষ করা যায় না। মানুষের সুখশান্তি ও উন্নতি সাধনের জন্য এগুলি অপরিহার্য্য। এর একদিক নিলাম, আর একদিক নিলাম না, তাতে কিন্তু ফলে মিলবে না। এর প্রত্যেকটা দিক প্রত্যেকটা দিকের

সহায়ক হ'য়ে সামগ্রিকভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বাঁচা-বাড়াকে সফল ক'রে তোলে। আর তাকেই বলে ধর্ম্ম।

২রা শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৯।৭।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় চৌকিতে ব'সে তামাক খাচ্ছেন। এমন সময় বাইরে থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক আসলেন।

ভদ্রলোকদের বেঞ্চে বসতে দেওয়া হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা এইখানেই থাকেন?

ওরা বললেন—না, আমরা ২।৩ দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি। আপনার কথা অনেক শুনেছি, তাই দেখতে আসলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল।

এরপর কথা প্রসঙ্গে ওদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন—সর্ব্বম্ আত্মবশং সুখম্—এই কথার তাৎপর্য্য কী? মানুষ তো মানুষের সহযোগিতা ও সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। তা' পেতে গেলেই কি তাকে দুঃখ পেতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'সর্ব্বম্ আত্মবশং সুখম্' কথাটা খুবই ঠিক। আপনি যদি পরবশ হন, অর্থাৎ obsessed (অভিভুত) হন by complexes (প্রবৃত্তির দ্বারা), তা'হলে ঐগুলি আপনাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে, আপনার কোন স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, প্রবৃত্তির ঐ দাসত্বই ভুলভ্রান্তি ও অগণিত অবাঞ্ছনীয় ও অবাঞ্ছিত বাধ্যবাধকতা ও অসঙ্গতির সৃষ্টি ক'রে আপনার দুঃখ বাড়িয়ে তুলবে। কিন্তু সুকেন্দ্রিক সুধী চলনচর্য্যার ফলে আপনার internal ও external environment (ভিতরের ও বাইরের পরিবেশ) যদি আপনার control-এ (বশে) থাকে, তাহলেই তো আপনার সুখ। আপনার কর্ম্মফলে পরিবেশের সাহায্য-সহযোগিতা তখন আপনার প্রতি স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। তাছাড়া আত্মবশ যারা, তারা চেষ্টা করে যাতে পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল যথাসম্ভব কম হ'তে পারে, তারা অযথা প্রয়োজন ও চাহিদা বাড়ায় না, সেবা নেওয়ার থেকে সেবা দেওয়ার দিকেই তাদের ঝোঁক থাকে বেশী। আর, যার কাছ থেকে যাই নিক, নেওয়ার থেকে দেওয়াটা তাদের সাধারণতঃ ছাপিয়ে থাকে।

প্রশ্ন—আমরা বন্ধনমুক্ত হ'তে পারি কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যদি পরমপিতাকে প্রাণভ'রে ভালবাসি, তাঁতেই আসক্ত হই, তাঁতেই আবদ্ধ হই ভাল ক'রে, তাহলেই আমাদের সব বন্ধন মোচন হ'য়ে যায়। আমরা যখন একান্তমনে তাঁকে চাই, তখন তাঁকে পাওয়ার পথে অন্তরায় যা' তা' পুষে রাখা পছন্দ করি না। সেগুলি আপনা থেকে খ'সে পড়তে থাকে। তাই ঈশ্বর-প্রীতি বাড়িয়ে তোলাই প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ।

প্রবৃত্তির বন্ধনমুক্ত হওয়া মানে এ-নয় যে প্রবৃত্তিগুলির অস্তিত্ব থাকবে না। সেগুলি পুরোমাত্রায় থাকে, কিন্তু থাকে ঈশ্বরের অধীন হ'য়ে, ধর্ম্মের অধীন হ'য়ে, কারও ক্ষতির কারণ হ'য়ে থাকে না।

ইতিমধ্যে হাউজারম্যানদার মা এবং এ্যান্থনি এলেঞ্জি মিট্রাম ব'লে একজন বিশিষ্ট লেখক এসে বসেছেন। প্রফুল্ল তাঁদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার ইংরেজী তর্জ্জমা ক'রে শোনালেন।

মা সেই সূত্র ধ'রে প্রশ্ন করলেন—জীবনে যখন এতদিকে এত আকর্ষণ বিদ্যমান, সে-ক্ষেত্রে আমরা কি ক'রে মুক্ত হ'তে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখনই এমন হবে যে প্রিয়ের হওয়া ভিন্ন, সেই প্রিয় ভিন্ন আর কোন প্রলোভন নেই, তিনিই আমার মুখ্য কাম্য, তখনই জগতের সব আকর্ষণ এমনভাবে adjust ও manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারব, যাতে তারা সুফলপ্রসূ হয়। এমনি ক'রেই মানুষ সুখী হ'তে পারে, মুক্ত হ'তে পারে। জগতের আকর্ষণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করলেই যে মানুষ প'চে গেল, তেমন কোন কথা নয়। মন থাকলেই তা' নানা দিকে ধাবিত হবেই, কিন্তু Lord-এর (প্রভুর) উপর এতখানি টান চাই, যে-টান অন্য কোন টানে ক্ষণেকের তরেও ছিন্ন হবার নয়। ইষ্টটান ও প্রবৃত্তিটানের দ্বন্দ্বের ভিতর-দিয়ে প্রবৃত্তিটান যখন ইষ্টানুগ বিন্যাস ও সমাধান লাভ করে তখনই হয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের জাগরণ।

মা—ভগবানকে ভালবাসা ও উপাসনা করার সহজ পথ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যদি Christ-কে (যীশুখ্রীষ্টকে) ভালবাসি ও তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলি, তাহলেই ভগবানকে ভালবাসা ও উপাসনা করা হয়। তাঁকে বা তাঁর মত যাঁরা, তাঁদের কাউকে যে ধরে না, ভালবাসে না, সে ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পারে না।

এলেঞ্জি মিট্রাম—শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট প্রমুখ সবাই বলেছেন জীবনের তত্ত্ব। আমি সবার কথা থেকে বুঝেছি যে ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া ভগবানের পথে যাওয়া যায় না। আমার এ-সিদ্ধান্ত কি ঠিক নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও তো তাই বলি, তাই-ই তো কথা। ইষ্টানুগ বৃদ্ধি ও বিস্তারের পথে যেতে হবে আমাদের। তাই-ই ধর্ম্ম। তদনুগ চলনই ব্রহ্মচর্য্য। কাম যদি ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন ক'রে চলে, তাহ'লে তা' সর্ব্বনাশ হ'য়ে দাঁড়ায়। ধর্ম্মের অধীন ও অনুগত হ'লে, সুনিয়ন্ত্রিত ও সংযত হ'লে তা' ভাল বই মন্দ করে না। গীতায় আছে—

'ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ'।

এলেঞ্জি মিট্রাম—মহাত্মাজী বলেছেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর-দিয়েই শ্রেষ্ঠত্ব

অর্জ্জন করেছেন। হিন্দুশাস্ত্রে চতুরাশ্রমের কথা আছে। এই আশ্রমগুলির তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম আশ্রম হ'লো ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম। আচার্য্যনিষ্ঠাকে মেরুদণ্ড ক'রে হাতে-কলমে করার ভিতর-দিয়ে বৃদ্ধিমুখী জ্ঞান, যোগ্যতা ও চরিত্র-অর্জ্জনই এর প্রধান কথা। এই যা' পেল, তা' apply (প্রয়োগ) করার ক্ষেত্র হ'লো গার্হস্থ্য আশ্রম। সংসারটা তাঁতে সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে গ'ড়ে ওঠে। কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে প'ড়েও মানুষ তার বশীভূত হয় না। কারণ, আদর্শপ্রাণতাই তাকে সব অভিভূতির ঊর্দ্ধে তুলে ধ'রে রাখে। এই সংসার হয় ধর্ম্মের সংসার। তারপর ছেলেপুলেরা মানুষ হ'লে, তাদের উপর ভার দিয়ে সে তখন বৃহত্তর পরিবেশের সেবায় ব্যাপৃত হয়। একে বলে বানপ্রস্থ অর্থাৎ বিস্তারের জীবন। তারপর আসে সন্ন্যাস অর্থাৎ আদর্শে সম্যকভাবে কায়মনোবাক্যে ন্যস্ত করা নিজেকে এবং তাও সক্রিয়ভাবে। প্রতি আশ্রমের ধ্রুবতারা হ'লেন আচার্য্য বা আদর্শ। তাঁর পথে সপরিবেশ আরো-আরো এগিয়ে চলাই জীবনের কাম্য। আমি বই-টই পড়িনি, জানবে আমি যা' বলি তার ভিত্তি আমার experience (অভিজ্ঞতা)। তার সঙ্গে শাস্ত্রের মিল থাকে যতখানি, ততখানি তা' শাস্ত্র। যদি কোথাও মিল না থাকে, সেখানে আমি নাচার। কারণ, আমি যা' জেনেছি, বুঝেছি, দেখেছি, তাছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই আমার, আমি বিদ্বান নই, আমি crude man, foolish man (অপক্ক, মূর্খ মানুষ)। তবে আমি ক'রে যা' পেয়েছি এবং সেটা আরও অনেকে ক'রে যা' দেখেছে তাতে আমার বিশ্বাস, সেই অনুযায়ী চ'লে অন্য সকলেও তা' পেতে পারে।

মা—আপনার কি মনে হয় যে ভগবানকে পেতে গেলে আপনাকে অনুসরণ করা প্রয়োজন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বলি না, তবে আমি মনে করি আমি যা' বলি তা' অর্থাৎ আমার experience (অভিজ্ঞতা) যদি কেউ অনুসরণ করে, তবে সে তার মত ক'রে সেই experience (অভিজ্ঞতা) পাবে।

মা—কী সেই অভিজ্ঞতা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-experience (অভিজ্ঞতা)—আমি যাঁকে God (ঈশ্বর) বলি, Bliss (আনন্দ) বলি, heaven (স্বর্গ) বলি, সে সম্পর্কিত experience (অভিজ্ঞতা)।

মা—প্রত্যেকের সে-সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি সেটাকে অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি জানি আমার experience-কে (অভিজ্ঞতাকে)। এবং সে-experience (অভিজ্ঞতা) যদি কেউ পেতে চায়, সেই experience-কে (অভিজ্ঞতাকে) অনুসরণ করা লাগবে।

মা—একজন আর-এক জনকে কেন অনুসরণ করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার প্রয়োজন নেই, সে অনুসরণ করতে যাবে কেন ? তবে কারও যদি প্রয়োজন থাকে, তাকে বঞ্চিত করা ভাল না।

এলেঞ্জি মিট্রাম—আপনার অভিজ্ঞতা পেতে গেলে, আপনি যেভাবে করেছেন, সেইভাবেই কি করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার কাছ থেকে অঙ্ক শিখতে গেলে আপনার কাছে যেতে হবে, শুনতে হবে, সেই পথে চলতে হবে, করতে হবে, তবে তো তা' পারব। একটা করলে তখন আর পাঁচটার তুলনামূলক বিচার করতে পারব।

একজন নবাগত ভদ্রলোক বললেন—চারিদিকের যেমন অবস্থা, মানুষের বাঁচার উপায় দেখি না, মানুষ বাঁচবে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করার উপরই বাঁচতে হবে। যেমন খুশি তেমন করলে হবে না। বিধিমাফিক করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আমতলায় ইজিচেয়ারে এসে বসেছেন। তাঁর মুখের উপর রোদের আভা এসে পড়ায় মুখখানি খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অনেকেই কাছে আছেন। কলকাতা থেকে আগত পরিমলভাই কতিপয় যুবকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো—ওদের আপনার কেমন মনে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলেই ভাল যদি কিনা unrepelling adherence (অচ্যুত নিষ্ঠা) থাকে। তা' না থাকলে লাখ good traits (ভাল গুণ) থাকলেও কাজে আসে না। (এরপর হাউজারম্যানদা, তাঁর মা, আউটারব্রিজদা, এলেঞ্জি মিট্রাম প্রমুখ আসলেন।)

গুরুর প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সে-কথার জবাব সরাসরি না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—জলের ভিতর আছি। যদি আমার হাত-পা বাঁধা থাকে এবং অন্য কোন কৌশল জানা না থাকে, তাহ'লে উঠব কি ক'রে ?

এলেঞ্জি মিট্রাম—আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলে সাহায্য আসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসবে তো ! কিন্তু কি ক'রে আসবে ?

এলেঞ্জি মিট্রাম ঐ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বললেন—অদ্বৈততত্ত্বে আছে—'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শঙ্করাচার্য্যের সব কথাই আমরা নিই, কিন্তু তিনি যে ব'লে গেছেন 'অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু, নাদ্বৈতং গুরুণা সহ'—তা' আমরা নিই না। মূলে ঐ গুরুকে নিয়ে নেতি-নেতি বিচারের পথ জ্ঞানের পথ।

আবার আছে ভক্তিমার্গ—ভালবেসে ইষ্টকে অনুসরণ করা, ভজনা করা অর্থাৎ সেবা করা, তাঁর প্রীতিজনক কর্ম্ম করা, তাঁর গুণ-কীর্ত্তন করা, তাঁকে

সবার মধ্যে সঞ্চারিত করা, তাঁর স্মরণ-মনন করা, নিজের চরিত্রকে তাঁর নীতি-অনুযায়ী, দৃষ্টান্ত-অনুযায়ী গঠিত করা ইত্যাদি। এমনি ক'রেই মানুষ তদ্‌গতচিত্ত হয়, তাঁকে পায়। যীশু বলেছেন—'আমি পথ'। এ-কথার মানে আমি বুঝি, তিনি যা' জানেন তা' আমাকে পেতে হ'লে তাঁর জানার পথে চলতে হবে। এবং তাঁর উপর প্রীতি যত থাকবে, আমার চলা ও বোধটাও হবে তত perfect (সুষ্ঠু)। Unrepelling attachment-কে (অচ্যুত অনুরাগকে) বলে ভক্তি। স্বার্থপ্রত্যাশা ও কাম-কামনা পূরণের ধান্ধা থাকলে unrepelling attachment (অচ্যুত অনুরাগ) হয় না। একটা প্রবৃত্তিও যদি ইষ্টসংন্যস্ত না হওয়ার দরুন unadjusted (অনিয়ন্ত্রিত) থাকে, তবে তাই-ই মানুষকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তাই একমাত্র তাঁকেই চাইতে হয় এবং তা' তাঁরই জন্য, অন্য কোন জন্য নয়। তাঁকে খুশি করাই হবে আমার একমাত্র ও চরম চাহিদা। এমনটা হ'লে কিছুই আমাকে আর টলাতে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে প্রাণকাড়া ভঙ্গীতে হাসতে-হাসতে এলেঞ্জি মিট্রামের দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ! আমার গোড়ার কথার তো উত্তর হ'লো না—কেমন ক'রে সাহায্য পাবে।

এলেঞ্জি মিট্রাম—প্রার্থনা দিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রার্থনা কী?

এলেঞ্জি মিট্রাম—ভগবানের সঙ্গে সচেতন যোগই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা! যীশুর শিষ্যরা যখন বলেছিলেন, 'আমরা ভগবানকে দেখলাম না', তখন যীশু কী বলেছিলেন তো?

এলেঞ্জি মিট্রাম—তিনি বললেন—এ-কেমন কথা যে তোমরা আমাকে দেখেছ অথচ পরমপিতাকে দেখনি। যে আমাকে দেখেছে সে আমার পিতাকেও দেখেছে—যাঁর কাছ থেকে আমি এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য সদ্‌গুরুতে প্রবল, সক্রিয় টান হ'লে, নেশা হ'লে আর কোন ভাবনা নেই, সে জায়গামত পৌঁছে যাবেই। গুরু ছাড়া ভগবান পাওয়া mathematically (গাণিতিকভাবে) tenable (সমর্থনীয়) হ'তে পারে,—যেমন infinity (অসম্ভব) দিয়ে অঙ্ক কষা,—reason (যুক্তি) দিয়ে তা' বোঝানও যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবতঃ তা' অতি কষ্টকর। "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।" বেশী কষ্টকর ব'লে বলেছেন কিন্তু বাস্তবে প্রায় অসম্ভব।

মা—বাইবেলে আছে, যদি কেউ ভগবানকে সত্যি ক'রে চায় ও খোঁজে তাহ'লে সে তাঁকে পাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যেই সব কথা আছে।

এলেঞ্জি মিট্রাম—যোগের অনুশীলনে আত্ম-উপলব্ধি আসে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগ মানে the science of communion (যুক্ত হওয়ার

বিজ্ঞান), the science of love (ভালবাসার বিজ্ঞান)। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। যোগ হ'লে ঈশ্বরবিমুখ মনোবৃত্তির নিরোধ হয়, সব বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হ'য়ে ওঠে। তা' যত হয়, ততই মানুষ আত্মোপলব্ধি করে।

এলেঞ্জি মিট্রাম—আপনার মতে গুরু তো ঈশ্বরজানিত পুরুষ, তিনি নিজে তো ঈশ্বর নন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! গুরু ঈশ্বরজানিত পুরুষ। তিনি ঈশ্বরের বার্ত্তাবহ, তাঁর মাধ্যমেই ঈশ্বরে পৌঁছাতে হয়। যীশুর মত গুরু যিনি, তিনি একাধারে পথ ও গন্তব্য।

এলেঞ্জি মিট্রাম—কেউ ঈশ্বরজানিত কিনা তা' বোধ করা যাবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে শ্রদ্ধা
শ্রদ্ধয়া দৃষ্টিশুদ্ধতা
দৃষ্টিশুদ্ধের্হি বিশ্বাসঃ
বিশ্বাসাৎ নির্ব্বিচারতা
নির্ব্বিচারাৎ ভবেৎ প্রেম
প্রেম্নশ্চাত্মসমর্পণম্।

এলেঞ্জি মিট্রাম—প্রেমই বা কী আর কামই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেম—প্রিয়স্বার্থপরতা, আর কাম—আত্মভোগলিপ্সুতা।

এমন সময় যামিনীদা (রায়চৌধুরী) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দেখে মহা-আনন্দে উল্লসিত কণ্ঠে বললেন—আইছিস্? কেমন আছিস্?

যামিনীদা—শরীর এখনও তত ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচে যে আইছিস্, সেই মহাভাগ্যি। এইবার শরীর ঠিক ক'রে নে।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর এলেঞ্জি মিট্রামকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি গান জানেন?

এলেঞ্জি মিট্রাম—একটু-একটু জানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি শুনতে চাই, তাহ'লে কি কষ্ট হবে?

এলেঞ্জি মিট্রাম—না! কষ্ট কি?—এই ব'লে একটা গান ধরলেন। সেটা প্রকৃত-পক্ষে একটা সংস্কৃত স্তোত্র।

গানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুব ভাল, সংস্কৃত গান।

এলেঞ্জি মিট্রাম—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদিও সব বুঝতে পারলাম না, তাহ'লেও খুব ভাল লাগল।

ওরা কয়েকজন এবার বিদায় নিলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটু তামুক খাওয়াও তো।

তাঁকে তামাক সেজে দেওয়া হ'লো। তামাক খাচ্ছেন। এমন সময় নগেনদাকে (সেন) দেখে বললেন—ও, তুমি আছ ?

নগেনদা—হ্যাঁ! তবে আজ সারাদিন শরীরটা খুব দুর্ব্বল লাগছিল, তাই বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন ?

নগেনদা—বদহজম হ'লে তার পরদিন শরীর দুর্ব্বল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও, তাই! আমারও অমনি হয়। যেদিন indigestion (বদহজম) হয়, তার পরদিন যেন হাঁটতে পারি না। আচ্ছা! দুধ কেমন সহ্য হয় ?

নগেনদা—সামান্য হয়।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর নগেনদার সঙ্গে নিভৃতে কথা বললেন। ইতিমধ্যে পরিমল তার দলবল-সহ আস্‌লো। নগেনদার সঙ্গে কথা বলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের বললেন—আমি একটু প্রস্রাব ক'রে আসি। এই ব'লে উঠলেন। সঙ্গে সরোজিনীমা গাড়ু-গামছাটা নিয়ে গেলেন।

ফিরে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর ওদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—যেমনতর বলেছি ঐ-রকম দেড় লাখ লোক তাড়াতাড়ি দীক্ষা দিতে পারলে, মন তুই আছিস্ কোন্ তালে ? তখন আর ভয়-ভীত থাকে না। বিপন্ন যারা তাদেরও ধ'রে তোলা যায়। সবার একটা বাঁচার দাঁড়া হয়। আমাদের ঋষিদের কথা মনে হ'লে ইচ্ছে করে মাথাটা তাঁদের চরণে দিয়ে দিই। তাঁদের বিধান-অনুযায়ী চললে কা'রও দুঃখ থাকে না। সেই চলন ফিরিয়ে আনবে তোমরা। তোমরাই ইচ্ছা করলে দেড় লাখ কলকাতা থেকে করতে পার।

বাইরে থেকে কয়েকজন সৎসঙ্গী এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য জিনিসপত্র ও ফলমূল নিয়ে। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে অর্ঘ্যসহ প্রণাম ক'রে জিনিসগুলি নিয়ে গেলেন শ্রীশ্রীবড়-মাকে দিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই বামুনের আয়। একে বলে উঞ্ছবৃত্তি। আজ লোকে উঞ্ছবৃত্তি ব'লে গাল দেয়। কিন্তু মানুষ প্রাণের টান থেকে, শ্রদ্ধা-ভক্তি থেকে যা' দেয় তার কোন তুলনা হয় না। অন্য পয়সার থেকে এ-পয়সার দাম কত বেশী, জোর কত বেশী, খুনই আলাদা।

এমন সময় কেষ্টদা পাঞ্জা দেওয়াবার জন্য নীহারদা ও পূর্ণদাকে নিয়ে আসলেন।

পাঞ্জাদানের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগভরে বললেন—লও নীহার! এমনতর ভার নিলে, দায়িত্ব নিলে, মানুষের জগতে যার চাইতে বড় জিনিস আর হয় না। এই কাজ হ'লো ব্রাহ্মণের কাজ।

পূর্ণদাকে পাঞ্জা দিয়ে বললেন—এইবার ভগবানের এম-এল-এ হ'লে।

(পূর্ণদা নিজে একজন এম-এল-এ)।

একটু পরে আবার আকুলকণ্ঠে বললেন—পরম হাভাতে আমি। তাই আপনাদের কাছে মানুষ-মানুষ করি।

কারও মুখে কোন কথা নেই। সবাই অন্তরে-অন্তরে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণস্পর্শী কথাগুলি।

একটু পরে যামিনীদা বললেন—আমি চার দিনে বাইশ জনকে দীক্ষা দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই আগে শরীর ঠিক কর্।

যামিনীদা—দীক্ষা তো হয়, এখন তাদের ঠিকভাবে সংগঠিত করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইটেই তো তোমাদের কাজ। সংগঠন মানে প্রত্যেককে তার মত ক'রে ইষ্টার্থে সচল ক'রে তোলা। এই চলার পথেই আসে পারস্পরিকতা, প্রত্যেকের প্রত্যেককে দেখা—যাতে কেউ খাটো হ'য়ে না থাকে, প্রত্যেকে তার ধরণে বেড়ে উঠতে পারে। লোকগুলি যতদিন একটা incoherent floating (অসংলগ্ন ভাসমান) রকমে চলে, ততদিন তা'রা বল হ'য়ে ওঠে না। প্রত্যেকের পিছনে খাটা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—এদের সঙ্গে গল্প ক'রে-ক'রে কাজের root-টা (মূলটা) ধরায়ে দেন। Ground-টা (ভূমিটা) পাকা ক'রে না রাখলে আমরা নিজেদের speed-ই (বেগই) নিজেরা সামাল দিতে পারব না। পা পিছলে প'ড়ে যাব। পরিস্থিতির গুরুত্ব-সম্বন্ধে যদি খেয়াল না থাকে, যা' করণীয় তা' যদি দ্রুত না করা যায়, তবে কালের হাতের থাপ্পড় খেতে-খেতে জান যাবে।

পরক্ষণেই স্ফূর্ত্তি-সহকারে বললেন—ক'রে ফেললেই হয়। (গানের সুরে উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন)—'মানুষ আমরা নহি তো মেষ'।

পরিমল—গ্রামের ছেলেদের তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। সহরের ছেলেগুলি বড় ধুরন্ধর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রত্নাকরের গল্প জান তো? সে ছিল দস্যু। একদিন নারদের সঙ্গে দেখা। নারদকে আক্রমণ করলো। নারদ বললেন—আচ্ছা! তুমি এ-সব কেন কর? রত্নাকর বলল—সংসার প্রতিপালনের জন্য। নারদ বললেন—তুমি যে এই পাপকর্ম্ম ক'রে সংসার প্রতিপালন কর, তোমার সংসারের লোক কি তোমার পাপজনিত দুর্ভোগের ভাগ নিতে রাজী? রত্নাকর বলল—ভাগ নিতে রাজী থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই নেবে। তাদের জন্যই তো আমি এইসব করি। নারদঠাকুর বললেন—তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ তো। রত্নাকর ভাবল, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নারদ এই বুদ্ধি খেলেছেন। তাই তাঁকে লতাপাতা দিয়ে বেঁধে রেখে বাড়ীতে গেল খোঁজ নিতে। বেঁধে রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্য—যাতে তিনি পালিয়ে যেতে না পারেন। বাড়ী গিয়ে জনে-জনে সকলকে জিজ্ঞাসা

করল। কিন্তু কেউ তার পাপের দুর্ভোগ নিতে রাজী নয়। প্রত্যেকেই বলল—তোমার কর্ত্তব্য আমাদের প্রতিপালন করা। তা' করতে তুমি বাধ্য। সেজন্য তুমি যদি অন্যায় কর, তার ফল আমরা ভুগতে যাব কেন? তখন রত্নাকর হতাশ হ'য়ে পড়ল। ছুটে এসে ঠাকুরকে খুলে দিয়ে সব কথা বলল। আকুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল—এখন আমার উপায়? নারদ তখন তাকে দীক্ষা দিয়ে নাম করার উপদেশ দিলেন। রামনাম দিলেন। কিন্তু তার মুখে রামনাম আসে না। সে প্রথমটা মরা-মরা জপ করতে লাগল। পরে সেই রত্নাকর হ'য়ে উঠলো বাল্মীকি। তাই একজন দুষমন হ'লেও কিছু আসে যায় না যদি সে আচার্য্যে সুনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। শিবাজীও কম ধুরন্ধর ছিল না। কিন্তু গুরুর কথা প্রাণে গেঁথে নিয়েছিল—'মুখ্য হরিকথা নিরূপণ।' তাই আওরঙ্গজেবের মত মহাশক্তিমান লোকও তার সঙ্গে পেরে ওঠেনি। সে ছিল নরমে-নরম, গরমে-গরম, জায়গামত ন্যাকা। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে গুরুর ইচ্ছা পূরণ করা। গুরুর ইচ্ছা পূরণের ধান্ধা থাকলে তাকে আর কেউ রুখতে পারে না। আমি বলি, Never die, never cause death, cause death to die (মরো না, মেরো না, মৃত্যুকেই মারার ব্যবস্থা কর)। তোমরা এইভাবে লেগে পড়। এমন অবস্থার সৃষ্টি কর যাতে কাউকে বেঘোরে প্রাণ দিতে না হয়। হিন্দুদের আজ বড় দুরবস্থা। তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই আজ। তোমরা তাদের বাঁচাবার দায়িত্ব গ্রহণ কর। কারও সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই, কিন্তু কেউ যদি কাউকে মারতে চায়, সেখানে রুখে না দাঁড়ালে ধর্ম্মের কাছে দায়ী হব আমরা। এই রুখে দাঁড়াতে গেলেই চাই সংহতি ও শক্তি। তার জন্যই চাই এন্তার দীক্ষা। আমি বলি, কন্‌ফারেন্সের আগেই কাজ সেরে আস। কী করেছ, তা' ক'য়ো না, কী করছ তা' ক'য়ো না, অবস্থা কী হয়েছে তাই কও। আর, প্রত্যেককেই দীক্ষার জন্য পাগল ক'রে তোল। দীক্ষা দিয়ে তাদেরও আবার কাজে লাগিয়ে দাও।

একটি ভাই—আমাদের মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা, তাই এত অনৈক্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবতা-সম্বন্ধে ভুল বুঝে আছ। দেবতা মানে দীপ্তিমান পুরুষ। দেবতা কখনও অনৈক্যের কারণ হন না। ঋষিদের মধ্যে গরমিল নেই। গরমিল আমাদের মধ্যে। Fulfilling (পরিপূরণী) যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ভেদ ক'রো না। Unfulfilling (পরিপূরণী নন) যাঁরা, তাঁদের মেনো না। ঠিক দাঁড়ায় দাঁড় করাতে পারলে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোককেই একতাবদ্ধ ক'রে তোলা যায়। কাউকে তার মত ও পথ ছাড়ান লাগে না। প্রত্যেকে যাতে আরও ভাল ক'রে চলতে পারে, সেই পথ দেখিয়ে দেওয়া লাগে। সদ্‌গুরু আসেন সেই পথ দেখাতে। তাই সদ্‌গুরু-নির্দ্দেশিত দীক্ষার ব্যাপারে 'নাত্র কাল-বিচারণা'। এই দীক্ষায় কাউকে ভাল-কিছু ত্যাগ করতে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সতুদাকে (সান্যাল) লক্ষ্য ক'রে বললেন—সাধারণতঃ সেই মানুষগুলিই devoted (অনুরক্ত) হ'তে পারে যাদের পয়সার চাহিদা বা আবোল-তাবোল চাহিদা নেই। ঐ ধরণের কতকগুলি সাহসী, সৎ, বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ এম-এ, এম-এস-সি জোগাড় ক'রে কামে লাগিয়ে দাও। পরমপিতার সেবায় লোকবল, মনোবল, ধনবল, সংহত ক'রে তোল। কতকগুলি লোক চাই যারা ঋত্বিকতার কাজ করবে, কতকগুলি লোক চাই যারা লিখবে, গবেষণা করবে। ডাক্তারও চাই ভাল-ভাল। ঋত্বিক্ যারা হবে, তারা বামুন হ'লে ভাল হয়।

একটু থেমে বললেন—ছোটবেলায় পড়েছিলাম—'দে রামা! আমায় একটা মানুষ দে।' মানুষ না হ'লে আর মানুষ বাঁচে না। বাবা আমার! দেরী ক'রো না। আমার আশা করতে ইচ্ছা করে, আবার ভয়-ভয়ও করে। দেরী করলে অবস্থা হাতের বাইরে চ'লে যাবে। আগে থাকতে করলে মানুষ দুর্দ্দশায় পড়তো না। কাজ করতে হবে দ্রুত। আর, বিপদকে ঠেকিয়ে যাওয়া লাগবে diverting tactics-এ (গতি-পরিবর্ত্তনী কৌশলে)। ফলকথা, আমরা যদি আদর্শের সেবায় উঠে-প'ড়ে না লাগি, তবে দেশের সেবা হবে না। স্বামীজী বলেছেন—সন্দেহ ও দ্বিধা ত্যাগ ক'রে নির্ব্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করার কথা। এই বাণী অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা দরকার। Do to be and be to have (হওয়ার জন্য কর এবং হ'য়ে পাও)।

মৃগাঙ্কদাকে (বেরা) তাঁর আপন-জন বৈষয়িক-ব্যাপারে ফাঁকি দিচ্ছেন। তিনি সেইসব ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুরকে ব'লে উপদেশ চাইলেন—এই অবস্থায় তাঁর কী করণীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাদের বলা ভাল—আমাকে ফাঁকি দিও না। আমাকে ফাঁকি দিলে আমার বড় কষ্ট লাগে। তোমরা যে ফাঁকি দিচ্ছ, তা' কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। এমনি চেয়ে নাও, তাতে আমার আত্মপ্রসাদ আছে।

একটু পরে মৃগাঙ্কদাকে বললেন—লক্ষ্য রেখো—তোমাকে দিয়ে মানুষের সুবিধা যতটা হয় হো'ক, কিন্তু অসুবিধা যেন না হয়। আবার, তুমিও এমন বিধি-ব্যবস্থা ক'রে চলবে, যা'তে নিজেও অসুবিধার মধ্যে না পড়। বিপন্ন না হওয়ার জন্য যা'-যা' করণীয়, সে-করায় যেন খাঁকতি না থাকে। Be untussling in your behaviour to all (সবার সঙ্গে ব্যবহারে নির্ব্বিরোধ হও)।

কুষ্টিয়ার ননীদা (সরকার) দোকান উঠিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র যাজনকর্ম্ম নিয়ে ব্যাপৃত থাকবেন কিনা সেই বিষয়ে জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ফলকথা, দোকানও চললো না, এও হ'লো না, তাতে এ-কূলও গেল, ও-কূলও গেল,—তা' কিন্তু চাই না। Wholetime (পূর্ণকালের জন্য) নাবলে successful (কৃতকার্য্য) হওয়া চাই।

কাজের অগ্রগতি-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর হরেনদাকে (বসু) বললেন—উম্মাদনাই

আসল জিনিস।

একজনের অবাঞ্ছিত চরিত্র-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই-সম্পর্কে বললেন—কারও সম্বন্ধে হতাশ হ'তে নেই। একদিন-না-একদিন প্রত্যেকের পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। আর, পরিবর্ত্তন যদি না-ও হয়, তাও কামে লাগে না এমন মানুষ বড় দেখা যায় না। জানা চাই, কেমন ক'রে কাকে দিয়ে কী করতে হয়। জানলে সাপের বিষও অনেক সময় কামে লাগান যায়।

৪ঠা শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ২১।৭।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় এসে বসেছেন। যামিনীদা (রায়চৌধুরী), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), সুনীল (মিত্র), এলোঞ্জি মিট্টাম প্রমুখ অনেকেই কাছে আছেন। প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ উঠছে, আর শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আগ্রহ-সহকারে আলাপ ক'রে চলেছেন।

গুরু, ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে কথা উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গুরু চাই এমনতর যাঁর মধ্যে কোন বৈষম্যমূলক বুদ্ধি নেই। ভেদের মধ্যে যিনি অভেদকে দেখতে পান তিনিই প্রাজ্ঞ। তাই তিনি মানুষের মিলন ঘটাতে পারেন। বাস্তবতার বোধ নেই যার, অবাস্তব দার্শনিকতা নিয়ে চলে যে, তার জ্ঞানের খাঁকতি আছে। যে বলে—আমি ব্রহ্মকে জানি, বিশ্বকে জানি না, সে ভ্রান্ত। যে বলে আমি বিশ্বকে জানি, ব্রহ্মকে জানি না, সে-ও ভ্রান্ত। এরা উভয়েই ভ্রান্ত। কিন্তু যিনি বিশ্বের মধ্যে ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই জানেন। সবই ব্রহ্ম, এই যুক্তিতে যে বলে—কুকুর, মানুষ, গাছ সবই এক জিনিস, তার বোধ ঠিক নয়। যে বলে, ব্রহ্ম কুকুররূপে এই, ব্রহ্ম মানুষরূপে এই, ব্রহ্ম গাছরূপে এই—সেই ঠিক বলে। সবই এক, ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন পরিণয়ন। একত্বটাও এখানে যেমন সত্য, বিভিন্নতাও তেমনি সত্য। পশুর সঙ্গে মানুষের মিল আছে আবার অমিলও আছে। জীবদেহ হিসাবে কতকগুলি ব্যাপারে মিল আছে। প্রাণনাশক বিষ যদি পশুর শরীরে ঢোকে তারও ক্ষতি হবে আবার মানুষের শরীরে যদি ঢোকে, তারও ক্ষতি হবে। Eugenic law-এর (প্রজনন-নীতির) ব্যত্যয় হ'লে পশুও খারাপ হবে, মানুষও খারাপ হবে। মানুষের জন্ম যদি খারাপ হয়, তাহ'লে তার wanton passionate (যথেচ্ছ প্রবৃত্তিপরায়ণ)-রকমে চলার বুদ্ধি হয়। ওতে সবই lose করে (হারায়)। Superior pedigree (উন্নত বংশ)-ওয়ালা female (নারী) যদি inferior pedigree (অপকৃষ্ট বংশ)-ওয়ালা male-এর (পুরুষের) সাথে বিবাহ হয়, তবে সন্তান হবে বিপর্য্যয়ী প্রকৃতির। বীজেরই গাছ, মাটি শুধু গজিয়ে তোলে। বীজ-অনুপাতিক মাটি হওয়া চাই।

এলেঞ্জি মিট্রাম—ভালবাসার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকা কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা প্রিয়ের ভালোতে বাস করে, তার কল্যাণ চায়। তার অকল্যাণ যাতে হয়, সে-পথে পা বাড়ায় না। বিয়ের ব্যাপার যেখানে, সেখানে দেখতে হবে—বংশ, প্রকৃতি ইত্যাদি সব দিক-দিয়ে compatibility (সঙ্গতি) আছে কিনা। প্রবৃত্তির নেশায় ভুল করলে, ভুলের ফল যা' তার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। Love-এর (ভালবাসার) সঙ্গে knowledge (জ্ঞান) থাকে, love is ever-conscious (ভালবাসা চিরচেতন)। সে খেয়ালখুশি মত চলে না। Love (ভালবাসা) যত sublimated (ভূমায়িত) হয়, ততই মানুষ প্রত্যেককেই নিজের মত ক'রে ভালবাসে। যে ভালবাসে, সে নিজেরও সর্ব্বনাশ চায় না, অন্যেরও সর্ব্বনাশ চায় না। ভালবাসা মৃত্যু চায় না, পতন চায় না। সে মরাকে বাঁচাতে চায়, পতিতকে উন্নত করতে চায়। লক্ষ্মণের যখন শক্তিশেল হ'লো, রামচন্দ্র ভেবে আকুল, কিভাবে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে বাঁচান যায়। সুষেণ বৈদ্যের কাছে শোনা গেল বিশল্যকরণী হ'লে লক্ষ্মণকে বাঁচান যায়। হনুমান এক পায় খাড়া। সে ছুটলো গন্ধমাদন পর্ব্বতে, যেখানে বিশল্যকরণী পাওয়া যায়। গন্ধমাদন পর্ব্বতে তো পৌঁছাল, কিন্তু বিশল্যকরণী চেনে না। তখন করে কি? সোজাসুজি গন্ধমাদন পর্ব্বত-শুদ্ধ নিয়ে এসে হাজির। ভালবাসার কারবারই এই। কেউ কাউকে ভালবাসলে সে তার ক্ষতির কারণ হ'তে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি না। সে অত্যন্ত হুঁশিয়ার হ'য়ে পড়ে, যাতে ভাল বই মন্দ না হয়।

এলেঞ্জি মিট্রাম—রামকৃষ্ণদেবের গল্পের মধ্যে আছে একজন বিশ্বাসের জোরে হেঁটে নদী পার হয়েছিল। এমনতর কি সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসম্ভব হবে কেন ? সে হয়তো এমনতর কোন বুদ্ধি বের করেছিল যাতে হেঁটে নদী পার হওয়া যায়। এমনতর যদি ঘটেই থাকে, তাকে miracle (অলৌকিক ঘটনা) ব'লে ভাবা ঠিক নয়। ওর পিছনেও বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, যা' হয়তো আমরা জানি না।

এলেঞ্জি মিট্রাম—গুরু ছাড়া কি ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশু বলেছেন—None can come to the Father but by me (আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ পরমপিতার কাছে আসতে পারে না)। স্পষ্ট কথা। No compromise (কোন আপোষরফা নয়)। সব সময় complex (প্রবৃত্তি) নিয়ে আছি হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। হাত-পা যার খোলা বাইরের এমনতর কারও সাহায্য ছাড়া আমি নিজেকে নিজে খুলি কী ক'রে ? তবে সাহায্যকারী পেলাম, অথচ বাঁধন খুলতে চাইলাম না, খোলার সময় ব্যথা লাগে ব'লে যে খুলতে আসলো তাকেই কামড়ে দিলাম, তাতেও কিন্তু বাঁধন খোলার অন্তরায় হবে। সেইজন্য গুরু পেলাম, শুধু তাতেই হবে না। তাঁকে

ভালবেসে তাঁর অনুশাসন মাথা পেতে নিতে হবে। Unrepelling way-তে (অচ্যুতভাবে) তাঁকে follow (অনুসরণ) করতে হবে, তবেই কাজ হাসিল হবে। যে জানে তাকে ছাড়া জানায় পৌঁছান কঠিন। আমি বলছি কঠিন, Christ বলেছেন অসম্ভব। ভগবানকে জানা মানে নরদেহধারী ভগবান যিনি তাঁকে তত্ত্বতঃ জানা। তাই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।"

জ্ঞানী বহু জন্মের সাধনফলে শেষ জন্মে 'সমুদয় জীবজগৎ বাসুদেবই' এরূপ জেনে আমাকে প্রেমাস্পদরূপে ভজনা করেন। সেরূপ মহাপুরুষ অতিশয় দুর্লভ।

এলেঞ্জি মিট্রাম—অনেক উচ্চস্তরের লোককেও তো দেখা যায়, যাঁদের কোন গুরু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা অনেক সময় at the subtle top of our ego (অহং-এর সূক্ষ্মতর শীর্ষে) থাকি, সেখানে দাঁড়িয়ে subtle ego (সূক্ষ্ম অহং)-কে support (সমর্থন) করি। ওর মধ্যেও কিছুটা inferiority (হীনম্মন্যতা) থাকে, যা' গুরুকরণে বাধা দেয়। সি, আর, দাশ এসেছিলেন। বিশেষ কোন যাজন করতে হয়নি। নিজে থেকে দীক্ষা নিতে চাইলেন। আমি মা'র কাছে পাঠালাম। মা প্রথমে আপত্তি করলেন। বললেন—'তোমরা বড়লোক, হয়তো করবে না কিছুই, পরে আবার উল্টো কথা বলবে। বড়লোকেরা মনে করে, তারা বুঝি ভগবানকেও ধন্য করে।' দাশদা তখন চোখের জল ফেলে বললেন—'আমি মহাপাপী, জানি আমার উপর দয়া হবে না। তবে এইটুকু বলতে পারি—চিত্তরঞ্জন যেখানে-সেখানে মাথা নোয়ায় না, কিন্তু যেখানে নোয়ায় সেখানে চিরকালের জন্যই নোয়ায়।' এইসব কী-কী যেন বলেছিলেন। আমার সব ভাল ক'রে মনে নেই। কিন্তু এমন ব্যাকুলভাবেই বললেন যে মা'র মন গ'লে গেল, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। শেষটা মা দীক্ষা দিলেন। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন—আমবাগানে ঢুকে বাগানে কতগুলি গাছ, কোন্ গাছে কতগুলি ডাল, কতগুলি পাতা, কত আম হয়, এত সব হিসেব-নিকেশে তোর কী কাম? হিসেব-নিকেশ ক'রেই যদি তোর সময় কেটে যায় তবে আম খাবি কখন? বরং যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে, আগে আম খেয়ে পেট ঠাণ্ডা ক'রে নে।............সারাজীবন যদি কেবল তর্ক-বিচারে কাটিয়ে দেয়, তার মানে ক্ষিদে লাগেনি। ক্ষিদে পেলে সে খাদ্য খুঁজে বের করেই। যে যত বড়ই হোক সদ্গুরু লাভের ক্ষুধা যদি না জাগে, তবে বুঝতে হবে অন্য-কিছুতে আটকে আছে।

এলেঞ্জি মিট্রাম—অহং কি একেবারেই যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহং প্রত্যেকেরই থাকে, অহং না হ'লে existence-ই

(অস্তিত্বই) থাকে না। তবে চাই flexible ego (নমনীয় অহং), rigid ego (অনমনীয় অহং) ভাল নয়। Flexible ego (নমনীয় অহং) মানে বড় আমি। তার কাজ হ'ল সকলকেই বড় ক'রে তোলা, কাউকে দাবান নয়। Rigid ego (অনমনীয় অহং) অন্যকে দাবিয়ে, খাটো ক'রে, অস্বীকার ক'রে নিজে বড় হ'তে চায়।

শুনেছি বিশ্বামিত্র একসময় নাকি ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জনের জন্য কঠোর তপস্যা সুরু করেছিলেন। তখন ব্রহ্মা বললেন—বশিষ্ঠ তোমাকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার না করলে তুমি ব্রাহ্মণ ব'লে পরিগণিত হবে না। এখানে ব্রহ্মা বলতে আমি বুঝি, the common mind, i. e., the common people (সাধারণ মন অর্থাৎ জনসাধারণ)। আর, বশিষ্ঠ মানে, man of special wisdom and experience. He can discern who has achieved real greatness (বিশেষ প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ। তিনি নির্ণয় করতে পারেন, কে প্রকৃত মহত্ত্ব অর্জ্জন করেছে)। বশিষ্ঠ কিন্তু বুঝতে পারলেন যে, বিশ্বামিত্র তখনও ব্রাহ্মণত্বের স্তরে পেঁছাননি, তখনও তিনি rigid ego (অনমনীয় অহং)-এর হাত থেকে রেহাই পাননি। তাই তিনি তাঁকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করতে পারলেন না। এতে বিশ্বামিত্র খুব চ'টে গেলেন। নানাভাবে বশিষ্ঠকে কষ্ট দিতে লাগলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তবু তাঁর প্রতি সদয় ও ক্ষমাশীল। তবে তাঁকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করেন না। কারণ, তাঁর যে সে-অবস্থা আসেনি। শেষটা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠমেধ যজ্ঞ করার পরিকল্পনা ক'রে বশিষ্ঠকেই তাঁর পৌরোহিত্যে বরণ করলেন। বশিষ্ঠ তাতেও রাজী। যজ্ঞ আরম্ভ হ'লো। বশিষ্ঠ নিজেকে আহুতি দিতে লাগলেন অগ্নিকুণ্ডে, আগুনের দিকে চ'লে যেতে লাগলেন। বিশ্বামিত্রের তখন মনে অনুতাপ হ'লো। প্রাণপণে বারণ করতে লাগলেন বশিষ্ঠকে—আর আহুতি দেবেন না, আমার ব্রাহ্মণত্ব চাই না। আপনি বেঁচে থাকুন, আমি আপনার মতো মহৎ মানুষের সেবা নিয়ে থাকব। ব্রাহ্মণত্বে আর আমার কোন সাধ নেই। এই বলতে-বলতে জল দিয়ে যজ্ঞকুণ্ড নিভিয়ে দিলেন। হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে বশিষ্ঠের পা জড়িয়ে ধরলেন। বশিষ্ঠ তম্মুহূর্ত্তেই বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করলেন। ব্রাহ্মণ মান ব্রহ্মজ্ঞ। মানুষ যখন ঈশ্বর হ'তে চায় না বা কিছুই চায় না, অথচ অনাসক্তভাবে অর্থাৎ স্বার্থপ্রত্যাশাশূন্য হ'য়ে তাঁকে ভালবাসে, তাঁর সেবায় জীবন উৎসর্গ করে তখন থেকেই ঈশ্বর বাস করতে থাকেন তার ভিতর, তার শরীর হ'য়ে ওঠে temple of God (ঈশ্বরের মন্দির)। বিশ্বামিত্রের ভিতর বশিষ্ঠের প্রতি যখন অহৈতুক অনুরাগ গজিয়ে উঠলো, সেই অনুরাগের অনুশাসনে যখন তিনি প্রাণসম-প্রিয় ব্রাহ্মণত্বের আকাঙ্ক্ষা, লহমায় তুচ্ছ করতে পারলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি হ'য়ে গেলেন ব্রাহ্মণ। প্রকৃত ব্রাহ্মণের চরণে total surrender

(সামগ্রিক আত্মসমর্পণ) হ'লে, তার ভিতর-দিয়েই জাগে ব্রাহ্মণত্ব। তখন মানুষ ব্রাহ্মণের স্বভাব পায়। Ego (অহং) তখন sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে পড়ে। Inferiority (হীনম্মন্যতা) নিয়ে সাধনা করলে মানুষ যত বড়ই হোক, সে তখনও inferior (হীন)।

এলোঞ্জি মিট্রাম—সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টোটল, আলেকজান্দার প্রমুখদের মধ্যে কি ভারতীয় ধরণে গুরু-শিষ্য প্রথা ছিল? আমার তো মনে হয় ওদের ধরণটা আলাদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূলতঃ ব্যাপারটা এক। শুনেছি, প্লেটো নাকি প্রাণপণে গুরুর সেবা করতেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট প্রমুখের বাণীবহ প্রচারকদের বলা যায় ঋত্বিক্। তাঁরা সবাই জনসাধারণের মধ্যে প্রভুকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, যাঁর অনুসরণে মানুষ সপরিবেশ বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে।

এলোঞ্জি মিট্রাম—মৃত্যুর পূর্ব্বে যীশুখ্রীষ্ট যখন শিষ্যদের সঙ্গে শেষবারের মতো একসঙ্গে খেলেন, তখন তিনি সেবকের মতো শিষ্যদের পা ধুইয়ে-মুছিয়ে পর্য্যন্ত দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি দেখালেন মানুষকে কতখানি ভালবাসতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয়, সেবা করতে হয়। দেখালেন এইজন্য, যাতে শিষ্যরাও অপরের জন্য অমনতর করে। গুরুর বাণী যারা পরিবেষণ করবে তাদের একাধারে যেমন চাই অস্খলিত গুরুনিষ্ঠা, গুরুসেবা, তেমনি চাই গুরুগতপ্রাণ হ'য়ে প্রত্যেককে সেবা করার বুদ্ধি। এই সেবার ভিতর-দিয়েই মানুষ আপন হয়। মানুষকে আপন করতে হয় নিজের স্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য নয়, গুরুর স্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য। ক্রাইস্ট দেখিয়েছেন—কেমন ক'রে চলতে হয়। তাই He is the way (তিনিই চলার পথ)। আবার তিনিই সত্য, তিনিই গন্তব্য।

এলোঞ্জি মিট্রাম—ক্রাইস্ট চরম ত্যাগ ও নির্ভরতার কথা বলেছেন। তিনি শিষ্যদের বলেছেন—পাখীদের বাসা আছে, শেয়ালের গর্ত্ত আছে, কিন্তু তোমাদের মাথা গোঁজবার স্থান থাকবে না, কোন-কিছুরই সংস্থান থাকবে না। ঈশ্বরের উপর নির্ভর ক'রে নিঃস্ব ও চাহিদাশূন্য হ'য়ে তোমরা শুধু মানুষের মঙ্গল ক'রে চলবে, নিজেদের জন্য কোন ভাবনা রাখবে না। ঈশ্বরের দয়ায় যখন যেমন জোটে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে বললেন—সুন্দর! অতি সুন্দর! মানুষ যখন সত্যই Ideal-কে (আদর্শকে) ভালবাসতে শেখে, তখন তাঁকে fulfil (পরিপূরণ) করতে গিয়ে যত sufferings-ই (দুর্ভোগই) আসুক না কেন, তাতে সে কোন কষ্ট বোধ ক'রে না। সেইটেই তার কাছে আনন্দের মনে হয়।

এলোঞ্জি মিট্রাম—Ideal (আদর্শ) যদি অসম্ভব কিছু করতে বলেন আমাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরও beautiful (সুন্দর) হয়। যাঁকে ভালবাসি, তিনি

যদি বলেন—আমাকে আকাশের চাঁদখানা এনে দাও—মনে হবে how to achieve (কেমন ক'রে করা যায়), মনে হবে না impossible (অসম্ভব)। ভালবাসার টানেই মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তোলে।

এলেঞ্জি মিট্রাম—গান্ধীজী স্বতঃস্বেচ্ছ দারিদ্র্য, সত্যাগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত গ্রহণ করার কথা বলেছেন। এ-সম্বন্ধে আপনার কী মত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্মচর্য্য মানে বৃদ্ধির পথে চলা। যখন আমরা environment-এর (পারিপার্শ্বিকের) বাঁচা-বাড়ার সেবা নিয়ে ইষ্টানুগ চলনে রত থাকি, তখন আমাদের মন স্বতঃই বৃদ্ধি ও বিস্তারমুখী হয়। তাই passions-ও (প্রবৃত্তিগুলিও) তখন controlled (সংযত) হয়। এতেই ব্রহ্মচর্য্য স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। নইলে জোরজার ক'রে ব্রহ্মচর্য্য হয় না। আর, দারিদ্র্যের জন্য দারিদ্র্য বরণ করা আমার পক্ষে ভাল লাগে না। আদর্শের সেবার জন্য যদি দারিদ্র্য ও ক্লেশ বরণ করা প্রয়োজন হয়, তবে তা' অবশ্যই বরণীয়। আর, মানুষ যদি আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে আদর্শের সেবায় আপ্রাণ হ'য়ে ওঠে, দেখা যায় সে চা'ক বা না চা'ক, সম্পদ তাকে আলিঙ্গন করেই। অবশ্য সে-সম্পদ্ সে অপরের সেবায় লাগিয়ে নিজে খুব কমের ভিতর-দিয়েও চলতে পারে। আর, সত্যাগ্রহ বলতে আমি বুঝি, acceptance of principles of life and growth (জীবন এবং বৃদ্ধির নীতি অবলম্বন)। এ-গুলি তো চাই-ই।

এলেঞ্জি মিট্রাম—আমরা তো সঙ্কীর্ণ 'আমি'কে নিয়ে ব্যস্ত, প্রকৃত 'আমি'কে উপলব্ধি করব কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের প্রকৃত আমি complex-এর (প্রবৃত্তির) তলে buried (মাটি চাপা দেওয়া) হ'য়ে আছে, যখন সব complex (প্রবৃত্তি)-সহ Lord-কে (প্রভুকে) ভালবাসব, তখন তা' resurrected (পুনরুত্থিত) হ'য়ে উঠবে।

এলেঞ্জি মিট্রাম—আমাদের সত্তা নানাপ্রকার বৈষয়িক চাহিদার মধ্যে অবলুপ্ত হ'য়ে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা কিন্তু মূলতঃ চাই নিজেদের উপভোগ করতে। আর, নিজেকে নিজে উপভোগ করা যায় না, যদি Beloved (প্রিয়) ব'লে কেউ না থাকে। তবে খুশি ক'রেই মানুষ খুশি হয়। এই Beloved (প্রিয়) যত বড় হয়, মানুষ তত বড় হ'য়ে ওঠে। মানুষ টাকার জন্য টাকা চায় না। Beloved-কে (প্রিয়কে) fulfil (পরিপূরণ) করার জন্যই টাকা চায়। প্রকৃত প্রেম সর্ব্বদাই প্রিয়স্বার্থী। সে আত্মস্বার্থকে উপেক্ষা ক'রেও প্রিয়ের স্বার্থ চায়। নিজের খেয়াল চরিতার্থ করা নিয়েই যে ব্যস্ত, সে প্রেমের রাজ্যে ঢোকেনি।

অবতার-পারম্পর্য্য-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পূর্ব্বতনকে অধিকার ক'রেই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব।

তাই পরবর্ত্তী সর্ব্বদাই পূর্ব্ববর্ত্তীকে স্বীকার করেন। শুধু স্বীকার করা নয়, fulfil (পরিপূরণ) করেন। Fulfilment (পরিপূরণ) এক জিনিস, আর contradiction (বিরোধ) আর-এক জিনিস। fulfilment-এর (পরিপূরণের) মধ্যে অবিকল আগের মত না হ'তে পারে, furtherance (অগ্রগতি) থাকতে পারে, কিন্তু contradiction-এর (বিরোধের) মধ্যে থাকে deviation (বিচ্যুতি)। অনেকে বুঝতে না পেরে fulfilment-কে (পরিপূরণকে) deviation (বিচ্যুতি) মনে করে। যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন তো কিছু হবেই fundamental-এর (মূলের) উপর দাঁড়িয়ে। এ না হ'লে কিন্তু evolution (বিবর্ত্তন) হ'তে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষকে স্বীকার করতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তীকে স্বীকার ও পরিপূরণ করেন এমনতর পূরয়মাণ যদি কেউ থাকেন বর্ত্তমানে তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। এবং পরে যে তাঁর আবার আবির্ভাব হবে তাও মানতে হয়। কোথাও ইতি নেই। তিনি আর আসবেন না এমনতর হয় না। অবতার-পরম্পরার যেমন স্বীকৃতি চাই, তেমনি চাই বংশ-পারম্পর্য্যের স্বীকৃতি। পিতৃপুরুষকে কখনও অস্বীকার করতে নেই। তাহ'লেই আসে betrayal (বিশ্বাসঘাতকতা)। অবতার-পরম্পরা ও বংশ-পরম্পরাকে অস্বীকার ক'রলে culture (কৃষ্টি) ও blood কে (রক্তকে) অর্থাৎ নিজেকে অস্বীকার করা হয়। যাঁদের উপর দাঁড়িয়ে আছি, তাঁদের অস্বীকার ক'রলে আমিও থাকি না। একজন মহাপুরুষকে গ্রহণ করতে গেলে আমার blood-কে (রক্তকে) deny (অস্বীকার) করতে হবে—এ কেমন ধরণের কথা তা' আমি বুঝতে পারি না। বরং আমার পূর্ব্বপুরুষের উপর তো আমি বেশী কৃতজ্ঞ হব। আমার মনে হয়, ধর্ম্মজগতে সবচাইতে বেশী সর্ব্বনাশ হয়েছে অবতার-পরম্পরা ও বংশ-পরম্পরা স্বীকার না করায়। এর ভিতর-দিয়েই নানাপ্রকার অস্বাভাবিক ভাগাভাগি ও দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে। নইলে নানা সম্প্রদায় থাকলেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ ব'লে কিছু থাকতো না। সবাই মিলে ভাই-ভাইয়ের মতো মিলেমিশে থাকতে পারতো।

প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ উঠছে। সময় কোথা দিয়ে চ'লে যাচ্ছে সে-দিকে যেন কা'রও খেয়াল নেই। একটা নিবিড় আনন্দ-তন্ময়তায় মশগুল হ'য়ে আছেন সবাই।

এমন সময় বিমলদা (মুখোপাধ্যায়) আসলেন এদিকে। শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—অফিসের কাজ-কাম কেমন হ'চ্ছে?

বিমলদা—হ'চ্ছে মোটামুটি, কিন্তু আরও মানুষ দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উৎসাহভরে)—চালায়ে যান। পরমপিতার দয়ায় সব ঠিক হ'য়ে যাবিনি।

এলোঞ্জ মিট্টাম ক্রাইস্টের অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির বিষয় বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিগদগদকণ্ঠে বললেন—তাঁর প্রত্যেকটি কথা, রকম-সকম এত সুন্দর ব'লে শেষ করা যায় না। তাঁর কথা ভাবতেই আমার গায়ের লোম খাড়া হ'য়ে ওঠে। আমার মনে হয়, তাঁর মাতৃভক্তিই sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছিল সারা জগতে। তাঁর ভগবদ্ভক্তির মূলেও ঐ মাতৃভক্তি।

এলেঞ্জি মিট্টাম—পৈতা নেওয়ার প্রথা তো ভারতের বাইরে অন্যত্র দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, এমন-কি ইউরোপেও নাকি এক সময় পৈতে নেওয়ার প্রথা কিছু-কিছু লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আমি অবশ্য জানি না। আমার শোনা কথা। আমার মনে হয়, গুরুকে যে গ্রহণ করেছি, পৈতেটা তারই badge (চিহ্ন)।

এলেঞ্জি মিট্টাম—রামমোহন রায় তো পৈতে ফেলে দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি রামমোহন রায় হ'লে ফেলতাম না। তিনি surrender (আত্মসমর্পণ) করেছিলেন নিজেকে তাঁর conception-এর (ধারণার) পায়ে। কোন মূর্ত্ত সদ্‌গুরুর কাছে surrender (আত্মসমর্পণ) করলে তাঁর সিদ্ধান্ত এমনতর নাও হ'তে পারত।

এলেঞ্জি মিট্টাম—স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু-সমাজের অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিশেষ ক'রে বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ণাশ্রমের মধ্যে অস্পৃশ্যতা নেই, সদাচার আছে। সদাচার ignore (উপেক্ষা) করলে doubly fool (দুই-দিক দিয়ে বোকা) হব আমরা। অজ্ঞতার দরুন যদি কোথাও পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, তা' তাড়িয়ে দিতে হবে। পরস্পরের হাতে খাওয়াটাই বড় কথা নয়। প্রধান কথা হ'চ্ছে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা, সমীহ, ভালবাসা। যারা ঠিকভাবে সদাচার পালন করে না, তাদের কারও হাতে যদি এমনতর কোন লোক খায়—যে সদাচার পালন ক'রে চলে—তার শরীর-মনে তার ফলে প্রতিকুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'তে পারে। সদাচারের মধ্যে আবার আছে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন রকমের সদাচার।

এলেঞ্জি মিট্টাম—হিন্দুদের অনেক মন্দিরের মধ্যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের ঢোকা নিষেধ আছে। এমনতর ব্যবস্থা থাকা কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি হ'লে বলতাম—যারা সদাচারী নয়, তাদের ঢোকা নিষেধ।

একজন সত্যিকার হিন্দু, একজন সত্যিকার মুসলমান, একজন সত্যিকার খ্রীষ্টান—পরমপিতার চোখে এরা সবাই সমান। এদের মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ নেই। এদের প্রত্যেককেই দেখা যাবে ভগবদ্ভক্ত, নীতিপরায়ণ, শ্রদ্ধাবান,

সহনশীল ও মানুষের প্রতি প্রীতি ও সেবামুখর। প্রকৃত ধার্মিক যারা তারাই সমাজের গৌরব।

আমাকে যদি কেউ ভালবাসে অথচ আমার পিতাকে ভাল না বাসে, সে আমাকে ভালবাসে না। ধরেন, আমি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, গৌরাঙ্গদেব, রামকৃষ্ণদেব সবাইকে ভালবাসি, আপনি আমাকে ভালবাসেন, অথচ এঁদের ভালবাসেন না। এমনতর যদি হয়, তার মানে আপনি আমাকেও ভালবাসেন না। এঁদের কাউকে আপনার পছন্দ হয়, কাউকে আপনার পছন্দ হয় না। তার মানে, আমাকে যে পছন্দ করেন আপনি, তার ভিতরও খাঁকতি আছে। কোন একজন অবতারপুরুষ বা প্রেরিতপুরুষের প্রতি ভালবাসা হ'লে সেই ঠেলায় সবার প্রতিই ভালবাসা গজাতে বাধ্য। কারণ, তাঁরা এক।

এলেঞ্জি মিট্রাম—যে ক্রাইস্টকে ভালবাসে বলে, অথচ তাঁর পথে চলে না, সে তাঁকে ভালবাসে না। যে তাঁর পথে চলে, সে প্রকৃত ভালবাসে। তার জীবনসৌধ প্রতিষ্ঠিত হয় পাথরের মতো শক্ত ভিতের উপর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে তাঁকে ভালবাসে বলে, কিন্তু তিনি যা' ভালবাসেন তা' করে না, তাঁর পথে চলে না, চলে আপন খেয়ালমত, সেও প্রাসাদ তৈরী করে, কিন্তু সে-প্রাসাদ তৈরী হয় বালির পাহাড়ের উপর। তার সমস্ত প্রচেষ্টাই নিরর্থক ও দুঃখদায়ক হ'য়ে ওঠে। যে তাঁকে ভালবেসে যত কষ্টই হো'ক তাঁর পথে চলে, সে পাথরের পাহাড়ের উপর প্রাসাদ তৈরী করে। তার সব শ্রমই সার্থক হয়। তাঁর পথে চলতে নিজ খেয়াল ত্যাগ করতে হয়। এতে কষ্ট আছে। কিন্তু এই কষ্টকে যে সুখের ক'রে নেয়, সেই প্রকৃত সুখী হয়। "দয়া ধরমকী মূল, নরককী মূল অভিমান।" দয়া মানে রক্ষা। যে ধর্ম্মের পথে চলবে, ভগবানের পথে চলবে, তার কাজ হ'লো ভগবানের প্রীতির জন্য সবাইকে রক্ষা করার চেষ্টা করা, বাঁচাবার চেষ্টা করা। এতে হৃদয়ের প্রসার হয়। যে তা' না ক'রে আত্মাভিমানে ও আত্মস্বার্থে মত্ত হ'য়ে থাকে, সে দিন-দিন সঙ্কীর্ণ হ'য়ে ওঠে। আর সঙ্কীর্ণতাই নরক।

এলেঞ্জি মিট্রাম—অন্তর্নিহিত প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত হওয়া কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভেতরের থেকে যে-কথা আসে, তা' এমনভাবে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করতে পারে যে, সেইমতো চ'লে deviated (বিচ্যুত) হ'য়ে পড়তে পারি। ভেতরের কথা যেখানে গুরুর নীতিকে support (সমর্থন) করে—তা' অনুসরণ করায় বাঁচতে পারি, আবার তা' যেখানে গুরুর নীতিকে ignore (উপেক্ষা) করে—তা' অনুসরণ করায় শয়তানের রাজ্যে বাস করতেও হ'তে পারে অর্থাৎ বিনষ্টির পথেই এগিয়ে যেতে পারি। সাধারণ মানুষের ভিতরটা সম্পূর্ণ শুদ্ধ নয়, তার মধ্যে অজ্ঞতা, প্রবৃত্তি ও ভ্রান্তির আধিপত্য অনেকখানি। তাই তার উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। সবচাইতে

সোজা পথ হ'লো সদ্‌গুরুকে গ্রহণ ক'রে নির্ব্বিচারে তাঁর আদেশ-নিদেশ মেনে চলা। তিনিই হ'লেন the only rectifier (একমাত্র পরিশোধক)। তাঁর পথে চলতে-চলতে আমরা পরিশুদ্ধ হ'তে পারি। মনের মালিন্যের অন্ত নেই! তাই গুরুনিষ্ঠাকে অব্যাহত রাখতে হয় বারবার। নইলে কখন যে কোন্ প্রবৃত্তি চেপে ধরবে তার ঠিক নেই।

এলেঞ্জি মিট্রাম—তাহ'লে গুরুর কাছে unconditional surrender-ই (নিঃসর্ত্তে আত্মসমর্পণই) দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

এলেঞ্জি মিট্রাম—বুদ্ধদেব তো কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে বোধিবৃক্ষতলে ব'সে সাধনা ক'রে বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। তা' তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'লো কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, তাঁরও গুরু ছিলেন এবং গুরুতে ছিল তাঁর অকাট্য অনুরক্তি। এর উপর দাঁড়িয়ে আত্ম-অবগাহন ক'রে তাঁর যে acquisition (অর্জ্জন) ও experience (অভিজ্ঞতা) হয়েছিল, তাই-ই তাঁর বুদ্ধত্ব।

এলেঞ্জি মিট্রাম—ক্রাইষ্টের সম্বন্ধে কী বলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি জন দি ব্যাপটিষ্টকে গুরুর মতন মানতেন। অবশ্য জন দি ব্যাপটিষ্টও তাঁকে গুরুর মতন মানতেন। অবতার বা প্রেরিতপুরুষরা হ'লেন পরমধাম থেকে আগত মানুষ। প্রেম ও জ্ঞানের সংস্কার নিয়েই তাঁরা আসেন। তবু মানুষ হিসাবে তাঁদেরও একটা বাস্তব অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। শূন্যের উপর দাঁড়াতে পারে না কিছু। হজরত রসুলের অমন কেউ ছিলেন কিনা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। তবে আমার মনে হয় জেব্রাইল ফেরেস্তারই একটা বাস্তবতা আছে।

এরপর উনি বিদায় নিলেন।

ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), যামিনীদা প্রমুখকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দীক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে ঋত্বিকী বাড়ান চাই। একজন ঋত্বিকের কাজ কতখানি, তা' বোঝা যাবে, তা'র ঋত্বিকীর পরিমাণ দেখে। প্রত্যেকটি যজমানকে ইষ্টপরায়ণ ও উচ্ছল ক'রে তুলতে হবে। ঋত্বিকের কাজ হ'লো nurture (পোষণ) দিয়ে প্রত্যেককে বাড়িয়ে তোলা। এর জন্য যা' করা লাগে, তাকেই বলে organisation (সংগঠন)। Organisation (সংগঠন) মানেই হ'লো to set up everybody at work to fulfil the Ideal (আদর্শের পরিপূরণের জন্য প্রত্যেককে কাজে ব্রতী করা)। Organised body (সংগঠিত বিধান) মানে প্রত্যেকটি cell (কোষ) work (কাজ) ক'রছে for life (জীবনের জন্য), তার নিজের মতো ক'রে equal interest-এ (সমস্বার্থে)।

একটি ভাই বললেন—সংসারে বড় বিরোধ, কী করব ঠিক পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কা'রও সঙ্গে বিরোধ না ক'রে তুই তোর আদর্শের মতে চলবি।

প্রশ্ন—আদর্শের মত তো সবাই চলতে চায় না। সে-পথে চলতে গেলেও তো অন্যেরা চ'টে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শের মতে চলা মানে সবারই যাতে ভাল হয়, তাই করা। তুই যদি কারও অহঙ্কারে আঘাত না ক'রে সবার সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে, অটুট ও কঠোর হ'য়ে কুশলকৌশলে তোর আদর্শের পথে চলিস্, তবে প্রথমটা ভুল বোঝাবুঝি হ'লেও পরে দেখবি সবাই তোকে ভালবাসবে।

৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ২২। ৭। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে একখানি ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। চারিদিকে বিজলীবাতি জ্ব'লছে। স্থানটি আলোয় আলোময়। কোথাও-কোথাও গাছপালার ছায়া পড়েছে, তাতে যেন আলোর মাধুর্য্যটুকু আরও ফুটে উঠেছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার। তারার মালা চকচক ক'রছে। পশ্চিম দিকে রোহিনী রোড ধ'রে একদল গ্রামের লোক মেঠো সুরে গান গাইতে-গাইতে বাড়ী ফিরছে। বেশ লাগছে সুরের রেশটা। শ্রীশ্রীঠাকুর উদাসভাবে দূরের দিকে চেয়ে আছেন। ভক্তবৃন্দ চেয়ে আছেন তাঁর মুখপানে। কারও মুখে কোন কথাবার্ত্তা নেই। এ-যেন নীরবে হৃদয় দিয়ে হৃদি-অনুভব। সবার চোখে-মুখে গভীর প্রশান্তি ও তৃপ্তির স্পর্শ। এমন সময় ভাগলপুর থেকে এক ভদ্রলোক আসলেন। তাঁকে বসতে দেওয়া হ'লো। তিনি প্রণাম ক'রে একখানি ছোট বেঞ্চিতে ব'সলেন।

কথাপ্রসঙ্গে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—সাধনার পথে একাগ্রতার বাধা কিভাবে দূর করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল জিনিস হ'লো যোগ অর্থাৎ ইষ্টের প্রতি ভক্তি, ভালবাসা, অনুরাগ। ঐ নেশা যত বাড়তে থাকে, ততই দেখি ভিতর-বাইরের যে-কোন বাধাই আসুক না কেন, তা' দিয়ে ইষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা কতখানি হাসিল করতে পারি। কোন চিন্তাকে জোর ক'রে চাপা দিতে গেলে, তা' আরও পেয়ে বসে। ওতে তা' adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় না। কিন্তু যা'-কিছুকে ইষ্ট-স্বার্থপ্রতিষ্ঠায় লাগাবার বুদ্ধি থাকলে সেগুলি শায়েস্তা হ'য়ে আসে। যেগুলি অসুবিধার কারণ হ'য়েছিল, সেগুলি সুবিধার উপকরণ হ'য়ে ওঠে। তা' থেকে আসে experience (অভিজ্ঞতা), experience (অভিজ্ঞতা) থেকে হয় knowledge (জ্ঞান), knowledge (জ্ঞান) পেকে ওঠে wisdom-এ (প্রজ্ঞায়)।

প্রশ্ন—দেশে শান্তি আসবে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি depend (নির্ভর) করে ঐক্যের উপর। যার সমষ্টি-

ব্যক্তিত্ব আছে অর্থাৎ প্রতি-প্রত্যেকের সত্তাপোষণী স্বার্থই যার একমাত্র স্বার্থ, সেই-ই সমষ্টিকে চালিয়ে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। যার তা' নেই, যে-লোক সেবার নামে আত্মস্বার্থ বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ধান্ধায় ঘোরে, সত্তাপোষণী স্বার্থ-সম্বন্ধে যার বোধ নেই, যে মানুষের ভাল করতে গিয়ে নিজের খেয়ালকেই প্রাধান্য দিয়ে চলে অথচ ভেবে দেখে না মানুষের ভালোর মূল কোথায়, সে যত যাই করুক না কেন, তা' দিয়ে লোকের প্রকৃত ভালও হয় না এবং লোকে ঐক্যবদ্ধও হ'য়ে ওঠে না। এক-কথায়, সে মানুষকে ঠিক পথে চালাতে পারে না। ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে একাদর্শে সঙ্ঘবদ্ধ হ'লে তা' থেকেই আসে সংহতি, শক্তি ও সম্বর্দ্ধনা। শান্তি তখন আপনি এসে দেখা দেয়। এখনও যদি সাবধান না হওয়া যায়, তবে বাংলার অবস্থা অন্যান্য প্রদেশেও হ'তে পারে।

প্রশ্ন—সুভাষবাবু কি আসবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি খুব আশা করি ও প্রার্থনা করি—তিনি আসুন। আর তাই করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

প্রশ্ন—তিনি এসে কি দেশের মঙ্গল করতে পারবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যা' বললাম, তা' যিনি করতে পারবেন, তিনিই মঙ্গল করতে পারবেন।

এরপর ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

একটু পরে আর-এক জন ভদ্রলোক আসলেন বাইরে থেকে।

মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে কিভাবে বড় হ'তে পারে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ বড়ও মানুষকে দিয়ে, ছোটও মানুষকে দিয়ে। মানুষ honesty-এর (সততার) উপর দাঁড়িয়ে steady go-তে (স্থির চলনে) যদি না চলে, ফাঁকিবাজীর উপর যদি দাঁড়াতে চায়, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সে লাভবান হ'লো, কিন্তু একদিন হয়তো এমন ক'রে হুমড়ি খেয়ে পড়বে যে, কিছুতেই সামাল দিতে পারবে না। কিন্তু progressive (প্রগতিমুখর) রকমটা বজায় রেখে নীতিমাফিক চলনায় যদি কেউ চলে, দেখতে-দেখতে সে একটা বিরাট মানুষ হ'য়ে যেতে পারে। শুনেছি, ডালমিয়া নাকি এক সময় ছ'টাকা মাইনেয় কাজ ক'রেছে। আমার শোনা কথা, আপনারা ভাল জানেন। তবে হীন অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত তো হামেশাই দেখা যায়।

প্রশ্ন—আমি তাহ'লে ব্যবসা ক'রব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ !

প্রশ্ন—কী ব্যবসা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-ব্যবসা মাথায় ঢোকে তাই করা ভাল। মানুষের হুচাকিমতো

যেতে নাই। অল্পের থেকে সুরু করা ভাল। ভাবতে হয়, আমি পড়তে পারি অনেকবার, তাতে যেন আঘাত না খাই।

৬ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ২৩।৭।১৯৪৭)

বেলা পাঁচটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে এসে ব'সেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), উমাদা (বাগচী), গোপেনদা (রায়), রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার), আদিনাথদা (মজুমদার) প্রমুখ উপস্থিত আছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা থেকে যদি বাপের বাড়ীর অবস্থা ভাল হয় এবং তাই নিয়েই যদি সে গরব ক'রে বেড়ায়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, স্বামীতে তার মন ঠিক-ঠিক লগ্ন হয়নি। স্বামীর ব্যক্তিত্বের প্রতি যদি কারও শ্রদ্ধা হয়, তাহ'লে স্বামীর দারিদ্র্য কখনও তাকে ক্ষুব্ধ করতে পারে না। তেমনতর স্ত্রীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সন্তোষই পুরুষের মনে কর্ম্মশক্তি জোগায়, ওতেই আবার তার অবস্থা ভালোর দিকে ফেরে।

সন্ধ্যা ছ'টায় সদ্য কেনা দু'খানা জীপগাড়ী আসলো কলকাতা থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর গাড়ীর কাছে এসে গাড়ী দু'খানি দেখে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ ক'রলেন। আরও অনেকেই গাড়ীর কাছে এসে গাড়ী দেখতে লাগলেন। বেশ ভীড় জমে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর গাড়ী দেখার পর নিজের জায়গায় এসে বসলেন। কেষ্টদাকে বললেন—গাড়ী থাকলে আপনারা চুটায়ে কাম করতে পারবেন। আর, জীপগাড়ীর সুবিধাও আছে, যে-কোন রাস্তায় চালান যায়।

কেষ্টদা—হ্যাঁ! যুদ্ধের প্রয়োজনেই এর আমদানী। গাড়ীগুলি শক্তও খুব। শুনেছি, টেকেও বহুদিন।

পরে একজন গুরুশিষ্যের যোগাযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন—দ্রোণাচার্য্য তো একলব্যকে গ্রহণ করেননি। তা' সত্ত্বেও একলব্যের উন্নতি হ'লো কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান আমাদের গ্রহণ করুন বা না করুন, আমরা যদি তাঁকে গ্রহণ করি তবে লাভবান হব। তুমি আমাকে ভালবাস বা না-বাস, আমি যদি ঐকান্তিক-ভাবে তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমার গুণের অধিকারী হবই। যে-ভালবাসা প্রিয়ের দুর্ব্যবহারেও টলে না, সেই ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। "Blessed is he who is repelled by nothing in me." (যে আমার কোন কিছুর দ্বারাই প্রতিহত হয় না, সেই ধন্য)।

প্রশ্ন—দ্রোণাচার্য্য যে গুরুদক্ষিণা হিসাবে একলব্যের আঙ্গুল চেয়ে নিলেন, এটা কি তিনি ঠিক করলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার গুরুভক্তির পরীক্ষা করলেন। Surrender (আত্ম-সমর্পণ) দেখলেন। আঙ্গুল থেকে যদি অহঙ্কার হ'তো এবং তার ধনুর্বিদ্যার

অপব্যবহার হ'তো, তার চাইতে এই ভাল হ'লো। খেয়ালমাফিক গুরু-ভজন হ'লে হবে না। সব-কিছু গুরুর জন্য। শিবাজী রাজ্য জয় করেছিলেন, সেও গুরুর জন্য। নিজের জন্য যে কিছুই চায় না, যার সবকিছুই গুরুর জন্য, সে অসম্ভব সম্ভব করতে পারে জগতে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উদার কথার মানে আজ উল্টে গেছে। যার কোন নিষ্ঠা নেই, বাঁধনহারা খেয়ালমাফিক চলনে যে চলে লোকে আজ তাকেই উদার বলে। কিন্তু আমার মনে হয়, উদারের মধ্যে ঊর্ধ্বগমনের ভাব আছে। সমস্ত society-কে (সমাজকে) goad (চালনা) ক'রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগবে up-এ (ঊর্ধ্বে), যাকে বলে ব্রহ্মে অর্থাৎ বৃদ্ধিতে। তার জন্য চাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানে uphold of being and becoming, life and growth (বাঁচা-বাড়া অর্থাৎ জীবনবৃদ্ধির ধৃতি)। এই বৃদ্ধিটা হওয়া চাই সব দিক-দিয়ে। যখন আমরা বৃদ্ধির পথে না চ'লে ক্ষয়ের পথে চলি, তখন বুঝতে হবে আমরা অধর্ম্মের কবলে পড়েছি। একদিন eugenic adjustment (সুপ্রজননের বিন্যাস) এমনতর ছিল যে বাংলাদেশে কখনও super intelligentsia-র (অত্যুন্নত শিক্ষিত শ্রেণীর) অভাব হ'তো না। কিন্তু ব'লতে মুখে বাধে, আজ সারা দেশ যেন গোশালায় পরিণত হ'তে চলেছে। বিয়ে-থাওয়া যদি যথেচ্ছ রকমে চলে, প্রতিলোম যদি হ'তে থাকে, তাহ'লে কিছুতেই মানুষের মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না দেশে। সমাজ কতকগুলি অপদার্থ চায় না, চায় ভাল issue (সন্তান)। তার মূলে আছে বিয়ে। বর্ণ, বংশ, প্রকৃতি ইত্যাদির মিল ক'রে বিয়ে দিতে হয়। এ-সব আগে মানতো। কিন্তু ভাল tradition (ঐতিহ্য) যেগুলি ছিল, আমাদের বক্তিমার ঠেলায় সেগুলি যেতে বসেছে। শ্রদ্ধা ভেঙ্গে দিয়েছি। সবাইকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছি। এই উদারতার ঠেলা সামলান পরে মুশকিল আছে। Disintegration-এর (ভাঙ্গনের) চূড়ান্ত হবে। এই স্রোত যদি না ফেরে, কেউ কাউকে মানবে না, কেউ কারও থাকবে না। খারাপটা আমাদের সম্পদ নয়, খারাপটা হ'লো disease (ব্যাধি)। এ-সব কথা বেশী আলোচনা করা ভাল না। আলোচনা করি—conscious (সচেতন) হ'য়ে দোষ eradicate (নির্ম্মূল) করবার জন্য।

১৩ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ৩০।৭।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় এসে বসেছেন। মনোমোহনদা, স্মরজিৎদা (ঘোষ), সুরেনদা (পাল), সুরেনদা (সেন), ভার্ম্মাদা প্রমুখ অনেকে উপস্থিত আছেন।

আমাদের প্রধান করণীয় কী সেই সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাপুরুষরা যুগে-যুগে একই কাজের উপর জোর দিয়ে গেছেন।

সে-কাজ হ'লো লোকসংগ্রহ। লোকসংগ্রহ মানে to make the people integrated to a common Ideal (জনগণকে একাদর্শে সংহত ক'রে তোলা)। এই কাজ বাদ দিয়ে যত কাজই করা যাক না কেন, তা ধোপে টিকবে না। তাই যাজন খুব করা লাগে। যাজন এক পরম সাধন। এতে জাত-সমাজ যেমন বাঁচে, তেমনি যাজন করতে-করতে মানুষগুলিও তৈরী হ'য়ে ওঠে। তাই আছে 'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্‌'। (আমার যাজনকারীরাও আমাকে পায়)। যাজন নিয়মিতভাবে করতে থাকলে তা' ইষ্টের স্মরণ-মনন-জপধ্যান, ভরণ, পূরণ, সেবার স্পৃহাও জাগিয়ে তোলে। ভালবাসার সম্বেগ আসলে ঐ সবগুলিই করা আসে।

সুরেনদা—'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্‌ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।'

(কিন্তু যে-ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোন কর্ত্তব্য নেই)—এ-কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমনতর ইষ্টবিভোর যে, তার নিজের কর্ম্ম থাকে না, প্রবৃত্তিকর্ম্ম থাকে না, কিন্তু লোককর্ম্ম থাকে। লোকসেবার কর্ম্ম যে তাঁরই কর্ম্ম। তাঁকে পরিবেষণ করাই সবচেয়ে বড় লোককর্ম্ম। মোক্ষ আমার তখনই হয়, যখন passion-এর cry (প্রবৃত্তির কান্না) আমাকে কিছুতেই পিছু হাঁটিয়ে নিতে পারে না, সম্মুখের বাণীই অর্থাৎ ইষ্টকর্ম্মের নেশাই কেবল আমাকে টানে, পেছনটান চিরকালের জন্য ঘুচে যায়। এমনতর হ'লে আমি হই মুক্ত। মুক্ত হ'লে বুঝি—আমি মুক্ত হইনি, যত সময় যা'-কিছু সব মুক্ত না হ'চ্ছে। বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণের কথা বলেছেন। আমার মনে হয়, পরিবেশকে নিয়ে মুক্ত জীবনের অধিগমনে এগিয়ে চলাই মহাপরিনির্ব্বাণ। বাইবেলে নাকি আছে তিনি লোকোদ্ধারের জন্য পুনরায় আসবেন, নূতন নাম দেবেন, সে-নামের ছাপ থাকলে কেউ সহজে কালের কবলে পড়বে না, তখন vultures (শকুনরা সব) আসবে, Armageddon (বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম) হবে। তিনি নিজে চোরের মত থাকবেন।

প্রফুল্ল—চোরের মতন থাকবেন মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি গোপনে থাকবেন, আত্মপ্রকাশ করবেন না। তাই অনেকে তাঁকে বুঝতে পারবে না। Vulture (শকুন) মানে rotten knowledge (পচা জ্ঞান) নিয়ে যারা থাকে। অর্থাৎ কদর্থী শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে অনেকে আসবে। ঐ পচা জ্ঞানের মাপকাঠিতে মেপে তারা তাঁকে বুঝতে পারবে না। Vulture-এর (শকুনের) মানে এও হ'তে পারে—যে Vulture-এর (শকুনের) মতো গুরুকে শোষণ ক'রে খাবে। They will be there not to work for him but to procure provision for their belly (তাঁর কাজ করার জন্য তারা সেখানে

যাবে না। তারা যাবে পেটের খাদ্য সংগ্রহের জন্য)। শিখদের গ্রন্থে নাকি আছে—অনেক শিষ্য যখন গুরুর জন্য বিশেষ কিছু না ক'রে গুরুর কাছ থেকে নিয়ে খাবে, যখন টাকায় একসের ক'রে চাল হবে, তখন গুরুগোবিন্দ আবার আসবেন।

১৭ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ৩।৮।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকীতে ব'সে আছেন। ইছাপুর থেকে কিরণদা (বন্দ্যোপাধায়) ও প্রফুল্লদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এসেছেন। নানা বিষয়ে আলোচনা হ'চ্ছে।

হিন্দুদের সংহতি-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংহতির জন্য সবচাইতে বেশী দরকার হ'চ্ছে একাদর্শে দীক্ষিত হওয়া। আর, এক-এক জায়গায় বহুলোক যদি দল বেঁধে থাকে, প্রত্যেকে প্রত্যেককে দেখে, তাহ'লে তাদের মধ্যে একটা বিপুল শক্তির জাগরণ হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই এমনভাবে চলা উচিত, যাতে তারা অত্যাচারিত না হয় বা অত্যাচার না ক'রে। কেউ দুর্ব্বল হ'য়ে থাকলে অত্যাচারী প্রকৃতির যারা, তারা তাকে অত্যাচার করতে উৎসাহ বোধ করে বেশী। দুর্ব্বলতা কেটে যায় যদি মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে চলে। প্রত্যেকে তার মতো চলে, কেউ কাউকে দেখে না, কেউ কারও কথা ভাবে না, এই রকমটাই বিশ্রী। এই রকমটা বদলাতে হবে। পরিবেশকে বাদ দিয়ে আমরা একলা-একলা বাঁচতে পারি না, তাই পরিবেশের সেবা করাই চাই। এই কথাটা মনে গিরো দিয়ে রেখে বাস্তব অভ্যাসে ফুটিয়ে তোলা চাই। আদর্শ যেমন চাই, তেমনি চাই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ। এতে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে খুব মিল হয়। শুধু তাই নয়, অনুলোমক্রমে বিয়ে-থাওয়া চ'লতে থাকলে সমাজের power of assimilation-ও (আত্মীকরণ-ক্ষমতাও) বেড়ে যায়। সমাজদেহ বিস্তার ও ব্যাপ্তির পথে চলে। আমাদের শাস্ত্রের কোন অনুদারতা নেই। শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চ'ললে সব দিক-দিয়েই শক্তি বেড়ে যায়। সমাজ দুর্ব্বল থাকে না।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—পরমপিতার কাজে জনবল ও ধনবল দুই-ই চাই। শুধু একটা হ'লে হবে না। তবে জনবল হ'লে তা' থেকেই ধনবল হয়। আবার, resources (অর্থ) থাকলে তার জোরে সৎ-অসৎ অনেককে দিয়েই মঙ্গলকর কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। যারা এই কাজ করিয়ে নেবে, তাদের নিজেদের কিন্তু হওয়া চাই নিরাশী, নির্ম্মম। তারা যদি পয়সায় কেনা মানুষ হয়, তাহ'লে লোভের উপরে উঠতে পারবে না। আর, লোভের উপরে না উঠলে অর্থলিপ্সু যারা তাদের ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে না। পরিচালক যারা, তাদের চরিত্র এমন হওয়া চাই যে পরম দুশমনও তাদের শ্রদ্ধা না ক'রে

পারবে না। শ্রদ্ধা কেড়ে নিতে পারে এমনতর উপরিওয়ালা ও প্রয়োজনের পরিপূরণ—এই দু'টি জিনিসের সমাবেশ হ'লে সাধারণ লোককে দিয়েও অসাধারণ কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।

কিরণদার লিভারের গোলমাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর খাদ্যাদি-সম্বন্ধে সাবধান হ'তে বললেন এবং একটা ওষুধের কথা ব'লে দিলেন। তারপর বললেন—ঋত্বিক্ হ'য়ে ২৫০ পরিবারের মধ্যে ঋত্বিকী করার অভ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া চাই। তুমি এই ২৫০ পরিবারের জন্য wholly responsible (সম্পূর্ণভাবে দায়ী) থাকবে। এদের কেউ যেন এক ইঞ্চি পেছিয়ে না যায়। প্রত্যেকের শরীর-মন, চরিত্র-চলন, অভ্যাস-ব্যবহার, কর্ম্মক্ষমতা, প্রেম-প্রীতি, আয়-উপার্জ্জন, বুদ্ধি-বিবেচনা সবই যেন ক্রমাগত উন্নত হ'য়ে চলে। প্রত্যেকটি ঋত্বিক্ এইভাবে অন্ততঃ ২৫০ ঘরের দায়িত্ব নিলে প্রত্যেকেই nurture (পোষণ) পেয়ে বড় হ'য়ে উঠবে।

১৯শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ৫।৮।১৯৪৭)

কালীঘাটের কেষ্টদা (চট্টোপাধ্যায়) আজ সকালে ঋত্বিকের পাঞ্জা পেলেন। পাঞ্জা দেবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—মনে রেখো, এই ঋত্বিক্-পাঞ্জা থেকে তোমার কর্ম্মজীবনের সুরু হ'লো। ২০।২৫ কোটি লোক তোমাকে চিনুক বা না চিনুক, তাতে কিছু এসে যায় না। ফল কথা, তাদের জন্য করা হয়নি কিছু। তারা কিন্তু এতদিন তোমায় পায়নি। কারণ, তুমি নিজেই নিজেকে পাওনি। নিজেদের (সৎসঙ্গের) ideology (ভাবধারা) গীতা, বাইবেল, কোরান, বৌদ্ধধর্ম্ম ইত্যাদির সঙ্গে deep acquaintance (গভীর পরিচয়) এবং তার সমর্থনী চলা-বলা-করা—এই হবে তোমার equipment (যোগ্যতা ও প্রস্তুতি)। তোমাদের ideology-র (ভাবধারার) উপর দাঁড় করিয়ে জগৎটাকে save (রক্ষা) করতে হবে। এত বড় কাজ তোমাদের সামনে। তাই বুঝে যা' করার ক'রবে।

২০শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ৬।৮।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বাইরে এসে বসেছেন। প্রফুল্ল খবরের কাগজ প'ড়ে শোনাচ্ছে। এমন সময় দেখা গেল একটা পাঞ্জাবী গরু তার সাথী আর-একটা গরুকে দেখতে না পেয়ে সারা মাঠে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভালবাসা গরুকেও অমন করে। ওর বুকটার মধ্যে কেমন ক'রছে, তা' আমি বুঝতে পারি। আমারও প্রাণের মধ্যে সবার জন্য অমনি করে, বিশেষ ক'রে মা'র জন্য।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—ক'দিন আগে ললিতের

(ত্রিপাঠী) খাতায় নূতন কলম দিয়ে একটা ছড়া লিখে দিয়েছিলাম, সেটা টুকে নিয়েছিস্?

প্রফুল্ল—না তো!

তখনই খাতাটা আনিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তলিখিত ছড়াটি টুকে নেওয়া হ'লো। ছড়াটি এই—

ভক্তি অটুট নারায়ণে
দক্ষ-পটু যা'র সেবা
ঝঞ্ঝা আসুক শতেক রূপে
রুদ্ধ করে তা'য় কেবা?

২৪শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ১০।৮।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে প্রমথবাবুর (বিশ্বাস) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বাঁচা-বাড়ার স্বার্থ না থাকলে মানুষ আদর্শ বা ভগবানকে চাইতো না। বাঁচার মতো বাঁচতে গেলেই চাই সকলে মিলে একাদর্শকে অবলম্বন ক'রে inter-interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) হ'য়ে চলা। আমরা যদি আমাদের স্বামী, আমাদের সত্তা, আমাদের আদর্শের প্রতি fanatic (তীব্র ধর্ম্মোৎসাহসমন্বিত) না হই, তবে আমাদের অবস্থা হবে অসতী স্ত্রীর মতো। কা'রও সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার মতো মনের অবস্থা থাকবে না আমাদের। Fanaticism-কে (তীব্র ধর্ম্মোৎসাহকে) খারাপ বলে, কিন্তু fanaticism (তীব্র ধর্ম্মোৎসাহ) না থাকলে strength (শক্তি) থাকে না। ভগবান সকলকে সমান ভালবাসেন, কিন্তু মানুষের তাঁর প্রতি ভালবাসার কম-বেশীর দরুন চরিত্র ও যোগ্যতার আকাশ-পাতাল ফারাক হ'য়ে যায়। আদর্শের প্রতি libido-র (সুরতের) টান যার যত unrepelling (অচ্যুত), সে তত evolve করে (বিবর্ত্তিত হয়)। তার মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আদর্শের গুণাবলীর স্ফুরণ হ'তে থাকে। একটা প্রভুভক্ত কুকুর, গরু বা পাখীকে দেখা যাবে সে একটা সাধারণ কুকুর, গরু বা পাখীর থেকে অনেক বেশী সংযত ও বুদ্ধিমান। মানুষের আদর্শ যত উন্নত হবে এবং সেই আদর্শের প্রতি তার টান যত অস্খলিত ও সক্রিয় হবে, সে ততো উন্নত হবে।

এরপর একজন বহিরাগত জ্যোতিষীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মের ফল আমাদিগকে অনেকখানি বাধ্য ও বদ্ধ ক'রে রাখে এ-কথা ঠিক। কিন্তু এই প্রাক্তন পুরুষকারেরই সৃষ্টি। আর, পুরুষকার কখনই আমাদের ছেড়ে যায় না। ভাল লাগুক বা না-লাগুক, জোর ক'রে যদি সেই পুরুষকারকে গুরুর ইচ্ছাপূরণে লাগান যায়, তাহ'লে আমরা দুর্ভোগের হাত থেকে অনেকখানি রেহাই পেয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারি।

আপনাদের উচিত মানুষকে এই জিনিসটি ভাল ক'রে ধরিয়ে দেওয়া। তাহ'লেই লোকে উপকৃত হবে আপনাদের দিয়ে। কেউই হতাশ হবে না। গুরু বলতে বুঝতে হবে সদ্গুরুকে। সদ্গুরুকে কখনও ত্যাগ করতে নাই। সদ্গুরুর প্রতি নিষ্ঠাই হ'লো জীবনের মূলধন।

জ্যোতিষী—আপনার কথা খুব ঠিক। এ-ছাড়া মানুষের পথও নেই।

২৮শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৪।৮।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় একখানি চৌকীতে এসে বসেছেন। সামনের রোহিণী রোড দিয়ে কয়েকখানি গরুর গাড়ী ধীর-মন্থর গতিতে এগিয়ে চ'লেছে। তার ওদিকে বিরাট প্রান্তর রোদের আভায় ঝলমল ক'রছে। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। প্রকৃতির মধ্যে এক গভীর প্রশান্তি। বর্ষার জলে দারোয়া নদীর ক্ষীণ ধারা এখন স্ফীত ও প্রসারিত। দিগন্তের প্রান্তে এক তরুণ শ্যামলিমার সমারোহ। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখেও গভীর আনন্দের উচ্ছলতা। ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে ব'সে আছেন। উপভোগ করছেন তাঁর প্রীতিমধুর প্রাণদ সান্নিধ্য।

ভাটপাড়া থেকে একটি দাদা এসেছেন। তিনি তাঁর অভাব-অভিযোগের কথা নিবেদন ক'রে প্রার্থনা জানালেন—দয়াল! আপনার দয়ায়, আপনার সাহায্যে যেন আমি এসব কাটিয়ে উঠতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন—ইষ্টনিষ্ঠাকে অকাট্য ক'রে তোল। তাই-ই তোমাকে দয়া করবে। সাহায্য করবে পদে-পদে। নিষ্ঠাই ভবসাগরের কাণ্ডারী, রক্ষাকারী। অভাব মানে ভাবীর সঙ্গে ভাব না থাকা। তাঁর সঙ্গে ভাব হ'লে ভিতরের শক্তি খুলে যায়। তখন মানুষ যা' করে, তাতেই কৃতকার্য্য হ'য়ে ওঠে। ঐ ভাব, ঐ-টানই প্রেরণা জোগায় নিখুঁতভাবে করার। আর, করাটা নিখুঁত হ'লে সাফল্যও অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। অমনতর করা ও চলাকেই বলে প্রার্থনা। প্রার্থনা মানে প্রকৃষ্টরূপে চলা। অভাব একটা ব্যাধি। ব্যাধি মানে বিধির বাধা। অর্থাৎ বিধিকে যখন আমরা ব্যাহত ক'রে চলি, তখনই আসে অভাব, দুঃখ, অকৃতকার্য্যতা, রোগ, অশান্তি, ইত্যাদি। সুনিষ্ঠ চলনে বিধি-মাফিক চ'ললে ঐগুলির নিরসন হয়। সক্রিয় নিষ্ঠানন্দিত ইষ্টী-চলনই ধর্ম্ম। এক ধর্ম্মের অনুসরণেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয় জীবনে। ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হ'লো পরিবেশের ইষ্টার্থী সেবা। প্রত্যাশাশূন্য হ'য়ে ঐদিকে নজর দাও, ধর্ম্মকে স্বভাবগত ক'রে তোল, দেখবে ধীরে-ধীরে সব অভাব ঘুচে যাবে।

যাজন-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঠাকুরের কাছে যাও, কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না—এমন কথা কওয়া লাগে না। যাকে যাজন ক'রছ, তার স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে, তার উপযোগী ক'রে সৎসঙ্গের আদর্শ ও ভাবধারাকে তার

ভিতর গেঁথে তুলতে হয়। তেমনতর যাজনই effective (কার্য্যকরী) হয়।

ভাটপাড়ার দাদাটি বললেন—কেউ যদি বলে ঠাকুর ধ'রে তোমার তো এই অবস্থা, ঠাকুর ধ'রে কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি বলে ঠাকুর ধ'রে তোমার তো এই অবস্থা, তবে তাকে ব'লো—এখনও ঠাকুরকে ধরিনি, ধ'রতে চেষ্টা ক'রছি। ঠিকমতো ধ'রতে পারলে, তাঁর পথে চ'লতে পারলে থাকবে না দুরবস্থা। এখনও প্রবৃত্তির সঙ্গে দর কষাকষি ক'রছি। প্রবৃত্তি যখনই লোভ দেখাচ্ছে, তখনই তার কাছে নতি স্বীকার ক'রছি।

প্রমথদা (দে) ও শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে আক্ষেপের সুরে বললেন—আমি এক বছর হ'লো বিহারে এসেছি। যদি slow work-ও (মন্থর কাজও) হ'তো, তাহ'লেও আমি যা' চেয়েছিলাম, তা' এই সময়ের মধ্যে করা কঠিন হ'তো না। কিন্তু যারা করবে, তাদের যদি ইচ্ছাটা না জাগে, তাহ'লে করবে কিভাবে ? ইচ্ছা জাগলে কোন বাধাকেই আর মানুষ বাধা ব'লে মনে করে না। ক'রেই ছাড়ে।

একটি দাদা কয়েকটি আপেল নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড় বৌয়ের কাছে দিয়ে আয় গিয়ে।

আবার কাজের কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কল্যাণমূলক বিরাট সংহতি সৃষ্টি করতে গেলে তার একটা ন্যূনতম শক্ত বুনিয়াদ চাই। আমি যেমনতর দেড়লাখ লোক এখনই চেয়েছি, তা' পেলে সেই ভিতটা হয়, যার উপর দাঁড়িয়ে আমি এগোতে পারি। বামন বলির কাছে একটা পা রাখার জায়গা চেয়েছিলেন। আমাকেও তোমরা তাই দাও। তার উপর ভর ক'রে আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি অমঙ্গল যা', অসৎ যা', অস্তিত্বের পরিপন্থী যা', সামূহিক বিপদ যা', তা মিসমার ক'রে দেওয়া যায় কিনা। আমার কথা এখনও হয়তো অনেকে বুঝতে পারছে না, তাই কান দিচ্ছে না। কিন্তু অমঙ্গলকে নিরোধ করার মতো প্রস্তুতি না থাকলে, তাই-ই একদিন আমাদের অস্তিত্বকে নিরুদ্ধ করতে উদ্যত হবে।.........শিশু যেমন সন্দেশের জন্য লোলুপ হ'য়ে থাকে, আমিও তেমনি বিশিষ্ট ধরণের দেড়লাখ হওয়ার সংবাদের জন্য চেয়ে আছি—কখন তোমরা এসে ব'লবে, 'হ'য়ে গেছে'। এ-হ'লে বিশ্রাম নেওয়া চ'লবে না। এ কেবল শুরু। এরপর আরও ছড়িয়ে প'ড়তে হবে, যাতে সর্ব্বত্র ভেদের বদলে মিল হয়, শয়তানী বুদ্ধি ঠাঁই না পায় লোকের কাছে।

প্রমথদা—বড়-বড় মানুষগুলি তো ভগবানের কথা শুনতেই চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডোলওয়ালা অথচ ধর্ম্মবিমুখ—এমনতর যারা, তাদের আপাততঃ না হ'লেও চলবে, পরে তারা আপনিই আসবে। ছুটকে মানুষ অথচ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রাণওয়ালা—তারাই অসাধ্য-সাধন ক'রতে পারে। তাদের ধরুন।

Prime thing (প্রধান জিনিস) হ'লো—চোর যেমন টাকার জন্য বেরোয়, আপনারাও তেমনি চোর হন মানুষ লাভের আশায়। মানুষ চুরি করেন পরমপিতার সেবার জন্য। Be fishers of men (মানুষের ধীবর হন)।

কথা হচ্ছিলো—কর্ম্মীদের মধ্যে যদি কেউ গুরুতর অপরাধ করে, তাহ'লে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাস্তি দেওয়ার চাইতে এমনতর psychological manipulation (মনোবিজ্ঞানসম্মত নিয়ন্ত্রণ) চালান ভাল, যার ফলে সে নিজে থেকেই অপরাধ স্বীকার ক'রে বলে—আপনারা আমাকে শাস্তি দিন, নইলে আমি শান্তি পাচ্ছি না। আর, বাইরে থেকে কোন শাস্তির ব্যবস্থা না হ'লে, সে যদি স্বেচ্ছায় বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহ'লে আরও ভাল হয়।

২৯শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ১৫।৮।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণস্থ তাঁবুতে একখানি চৌকীতে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রমথদা (দে) প্রমুখ কাছে আছেন।

সংসৃজন ও সংগঠন কাজ কেন আশানুরূপ হ'চ্ছে না সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিক্‌দের urge (আকুতি) কম হওয়ার দরুনই কাজ আশানুরূপ হয় না। আশানুরূপ দীক্ষা হয় না। Bifurcated, half-hearted move (দ্বিধাবিভক্ত, উৎসাহশূন্য প্রচেষ্টা) হ'লে মানুষের সত্তাকে স্পর্শ করা যায় না। তাতে আজেবাজে মানুষ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু dependable (নির্ভরযোগ্য) মানুষ পাওয়া যায় না। ইষ্টকাজ ও ইষ্টচিন্তাই হওয়া উচিত ঋত্বিক্‌দের একমাত্র সংসার-কাজ ও সংসার-চিন্তা। তখন তাদের ধান্ধাই হয় প্রত্যেকটি মানুষকে, প্রত্যেকটি পরিবারকে যোগ্য ক'রে তোলা, সুখী ক'রে তোলা, সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা। ঋত্বিক্‌রা হ'লো সমাজের লোকের মা-বাপ। তেমনতর দরদ ও দায়িত্ববোধ যদি ঋত্বিক্‌দের জাগে, তাদের কাছে আসলেই মানুষের মাথা নত হ'য়ে আসবে। তারা দীক্ষা দিয়ে সময় পাবে না। যেমন দীক্ষা দিতে হবে, তেমনি দীক্ষার পর তাদের পিছনে লেগে থাকতে হবে, যাতে প্রত্যেকের চলন দিন-দিন পরিশুদ্ধ হ'য়ে ওঠে।

নামের তাৎপর্য্য-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাবাত্মক নাম এক শ্রীকৃষ্ণের বহু হ'তে পারে। কিন্তু তার কোনটাই complete (পূর্ণ) নয়। কোনটাই সব aspect (দিক) cover (অন্তর্ভুক্ত) করে না। কিন্তু তাঁর বীজাত্মক নাম একটাই হয়, এবং তাঁর সবগুলি aspect-ই (দিকই) নিহিত থাকে ঐ নামের মধ্যে। তাই অনুরাগের সঙ্গে সদ্‌গুরু-প্রদত্ত বীজনাম জপ ও সদ্‌গুরুর ধ্যান অর্থাৎ

চিন্তা, তাঁর প্রসঙ্গ, তাঁর প্রীতিপ্রসূ কর্ম্ম, সেবা ও তাঁর বাস্তব নির্দ্দেশপালন ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে তাঁকে তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করা যায়। ভগবদনুভূতির এই-ই হ'লো সহজ-সরল পথ। দীক্ষা অনেকে নেয়, কিন্তু যেমন-যেমন ভাবে যতটা সম্বেগ নিয়ে যতখানি যা' করার তা' নিষ্ঠাসহকারে নিয়মিত করে না। তাই টেরই পায় না যে সদ্‌গুরুর দীক্ষা কত বড় বস্তু। তবে নিবিড়ভাবে না পারলেও যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির অনুশীলন যারা নিয়মিতভাবে ধ'রে থাকে, তারা পদে-পদেই এর প্রভাব টের পায়। কিন্তু তন্ময় হ'তে না পারলে সুখ নেই।

৬ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৩। ৮। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় এসে ব'সেছেন। হাউজারম্যানদা, তাঁর মা এবং মিস্ মার্জ্জরি সাইক্‌স্ নামক একজন ইংরেজ-মহিলা এসে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। আশ্রমের অনেকেই উৎসুক হ'য়ে এগিয়ে আসলেন আলাপ-আলোচনা শুনবার জন্য। ধীরে-ধীরে কথাবার্ত্তা শুরু হ'লো। প্রফুল্ল ইংরেজীর বাংলা এবং বাংলার ইংরেজী তর্জ্জমা ক'রে দিতে লাগলেন।

মিস্ সাইক্‌স্ প্রশ্ন করলেন—ধর্ম্ম এবং সামাজিক প্রথার মধ্যে সম্পর্ক কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—Religion (দ্বিজীকরণ) কিন্তু ধর্ম্মের সবখানি নয়কো, যদিও ওটা ধর্ম্মের একটা অপরিহার্য্য আনুষ্ঠানিক অঙ্গ। ধাতুগত অর্থের দিক-দিয়ে বুঝতে গেলে Religion (দ্বিজীকরণ) কথার অর্থ দাঁড়ায় ইষ্টকে গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে নূতন ক'রে বেঁধে ফেলা। এক-কথায়, দীক্ষার মাধ্যমে পুনর্জ্জন্ম লাভ করা। (Re-মানে—পুনরায়, legare-মানে—বাঁধা)। ধর্ম্ম মানে তাই করা যাতে সপরিবেশ আমাদের বাঁচা-বাড়া অক্ষুণ্ণ থাকে। নিজেদের মনগড়া রকমে বাঁচা-বাড়ার পথে চ'ললে হবে না। তাতে পদে-পদে গোলমালের সৃষ্টি হবে। তাই বাঁচা-বাড়াকে সার্থক ও নিষ্কণ্টক ক'রে তুলতে হবে ঈশ্বরের চলনে অর্থাৎ ইষ্টানুগ চলনে। Social custom (সামাজিক প্রথা) এমন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে যাতে তা' ধর্ম্ম অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার পরিপোষণী হয়। তাই-ই গর্হিত, যা' এর অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। তা' overcome (অতিক্রম) করতে হবে, mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে হবে।

মিস্ সাইক্‌স্—তবে কি আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, যে-সব সামাজিক প্রথা বাঁচা-বাড়ার অনুকূল সেগুলি নিখুঁত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। Custom (প্রথা) হওয়া চাই স্বভাবতঃ সত্তাপোষণী। Politics-এর (পূর্ত্তনীতির) মধ্যেও আছে পূরণপোষণ। যা'-কিছুর লক্ষ্য হ'লো সত্তাসম্বর্দ্ধনা। ঐদিকে লক্ষ্য রেখে সব-কিছুকে সাজিয়ে তুলতে হবে।

মিস্ সাইক্‌স্—আপনি কি বিশ্বাস করেন যে মুষ্টিমেয় লোকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ধর্ম্ম মানব-সমাজের নিয়মনী শক্তিরূপে কার্য্যকরী হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম guiding force (পরিচালনী শক্তি) না হ'লে মানুষের deviation ও deficiency (বিচ্যুতি ও খাঁকতি) অবশ্যম্ভাবী। তাই যারা ধর্ম্মপ্রাণ তাদের মানব-সমাজকে ধর্ম্মপ্রাণ ক'রে তুলবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমরা যদি environment-কে (পরিবেশকে) ভাল ক'রে তুলতে না পারি, তাহ'লে নিজেরাও ভাল থাকতে পারি না। আমরা যদি আপ্রাণ হই, তাহ'লে সবই সম্ভব। মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি যার যেমনই হো'ক না কেন, তার আসল interest (স্বার্থ) নিহিত আছে ধর্ম্মপথে চলায়। আমরা যদি সেইটে ধরিয়ে দিতে পারি তাহ'লে আর ভাবনা নেই।

মিস্ সাইক্স্—এমন কোন শিক্ষাপদ্ধতি কি প্রবর্ত্তন করা সম্ভব যা'র মধ্যে ধর্ম্মই প্রথম স্থান অধিকার ক'রবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মাদর্শে উদ্বুদ্ধ যে-শিক্ষা, তাই-ই হ'লো real ও complete education (প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা)। তা' যেমন বাঁচতে শেখাবে, তেমনি বাঁচাতে শেখাবে মানুষকে। তা' কখনও মানুষকে selfish ও passionate (স্বার্থপর ও প্রবৃত্তিপরায়ণ) ক'রে তুলবে না। কর্ম্ম ও সেবার ভিতর-দিয়ে পরিবেশের সুখ-সুবিধা বাড়িয়ে তুলবার তাগিদ যদি কারও অন্তরে প্রবল হয়, ঐ ঠেলায় সে যোগ্য না হ'য়ে পারে না। ধর্ম্ম মানে জীবনীয় ধৃতি। ঐ ধর্ম্মসম্বেগ ঢুকিয়ে দেওয়াই শিক্ষার প্রাণ। তার জন্য চাই অমনতর সম্বেগসম্পন্ন শিক্ষক। ঐ শিক্ষককে খুশি করতে গিয়ে ছাত্ররাও তখন অমনতর হ'য়ে উঠবে। শিক্ষকেরও আবার প্রিয়পরম ব'লে কেউ থাকা চাই। যাঁর প্রীতির জন্য সে তার বৃত্তি, প্রবৃত্তি, সংস্কার, অভ্যাস, ব্যবহারকে সুগঠিত ক'রে তুলবে। যে system-ই (পদ্ধতিই) আমরা করি না কেন, গোড়ার কথা হ'লো ধর্ম্মপ্রাণ, আদর্শপ্রাণ শিক্ষক। শিক্ষকের চরিত্রই হবে ধর্ম্মের বাহন, আদর্শের বাহন। নইলে যা'-কিছুই করা যাক, ছাত্ররা ধর্ম্মকে, আদর্শকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাবে না। আবার বলি, ধর্ম্ম কিন্তু বাস্তব জীবন-বর্জ্জিত কোন ব্যাপার নয়কো। আদর্শনিষ্ঠ হ'য়ে জগতের যা'-কিছু নিয়ে সপরিবেশ love, life ও lift-এর (প্রীতি, জীবন ও উন্নতির) পথে চলাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম যেখানে জাগে সেখানেই আসে অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্ম্ম বাদ দিয়ে যা-ই আমরা ধরতে যাই, তাই আমাদের কাল হ'য়ে দাঁড়ায়। তা' আমাদের অস্তিত্বকে না ধ'রে উল্টো আছাড় মারে।

মিস্ সাইক্স্—ধর্ম্মের প্রাণশক্তি ছাড়া নীতিশাস্ত্র কার্য্যকরী হয় না। আবার, কোন বিশেষ ধর্ম্মের তত্ত্ব ও অনুশাসন সঞ্চারিত ক'রতে গেলে তা' প্রায়শঃ সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধর্ম্ম বিভেদেরই কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যার সমাধান কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মকে divide (ভাগ) ক'রেছি এটা আমাদের ignorance (অজ্ঞতা)। ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, Prophet-রাও (প্রেরিতপুরুষরাও) same

(এক)। এই হ'লো Hindu conception (হিন্দুদের ধারণা)। হিন্দুরা তাদের মেনেচ্ছ কয়—যারা Prophet-দের (প্রেরিতপুরুষদের) মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। Ignorance (অজ্ঞতা) যদি আমরা তাড়াতে পারি, তাহ'লে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে মিলনই প্রগাঢ় হ'য়ে উঠবে।

মিস্ সাইক্স্—বিভেদ, বিরোধ বা বিতর্কের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে আমরা কেমন-ভাবে সব সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়ায় একজন আদর্শ লাগে, যাঁর মধ্যে সব ভেদ বা বিরোধের নিরসন হ'য়ে ঐক্যসঙ্গতির বোধ ও চলন প্রকট হ'য়েছে। Teacher-দের (শিক্ষকদের) চাই সেই আদর্শের প্রতি unrepelling active attachment (অচ্যুত সক্রিয় অনুরাগ)। সেই Ideal-centric teacher-এর (আদর্শ-কেন্দ্রিক শিক্ষকের) প্রতি ছাত্রদের অনুরাগ যত গজাবে, ছাত্ররা তত normally ও unconsciously (সহজভাবে ও অজ্ঞাতসারে) educated (শিক্ষিত) হবে about the principles of life and growth i. e. Dharma (ধর্ম্ম অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার নীতি-সম্বন্ধে)। Student-দের (ছাত্রদের) honesty (সততা) সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে যে-কাজ হবে তার চাইতে ঢের বেশী কাজ হবে যদি তারা একজন honest teacher (সৎ-শিক্ষক) পায় ও তাঁকে ভালবাসতে শেখে। বোধসমন্বিত আচরণ অর্থাৎ চরিত্র যাদের পাকা, সঞ্চারণায়ও তা'রা হয় তুখোড়। অমনতর teacher-ই (শিক্ষকই) তো জীবন গ'ড়ে দিতে পারে। গভর্ণর হওয়া সোজা, teacher (শিক্ষক) হওয়া কঠিন। তাই শিক্ষকের সম্মান সবার উপরে।

মিস্ সাইক্স্—আজকাল প্রায় সব দেশেই শিক্ষা ধর্ম্মনিরপেক্ষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের মূল কারবার সত্তাকে নিয়ে। ধর্ম্ম মানুষকে কার্য্যকারণসহ শেখায় কোন্টা কতখানি সত্তাপোষণী বা তার বিপরীত এবং বিপরীত যা' তার কোন্টাই বা adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয় আর কোন্টাই বা resist (প্রতিরোধ) করতে হয় এবং তা' কেমন ক'রে। এই জ্ঞান বাদ দিয়ে যে education (শিক্ষা) তাকে education (শিক্ষা) না ব'লে literation (পুঁথিগতবিদ্যা) বলা ভাল। প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য যদি না গজায় তাহ'লে মানুষ অনেক জেনে, অনেক পেরেও সেই ক্ষমতাকে সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে পারে না। আর, সেইখানেই শিক্ষা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। আমাদের চাই adjusted, efficient, useful character (সুনিয়ন্ত্রিত, দক্ষ, কার্য্যকরী চরিত্র) and there peeps education (এবং সেখানেই শিক্ষা উঁকি মারে)।

হাউজারম্যানদার মা জিজ্ঞাসা করলেন—সেটা বাস্তবায়িত ক'রে তোলা যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ-রকম teacher (শিক্ষক) থাকা চাই। ঐ-রকম traits (গুণগুলি) ছাত্রদের worship (পূজা) করা চাই। Teacher-এর (শিক্ষকের) হওয়া চাই আচার্য্য অর্থাৎ আচরণসিদ্ধ। অমনতর teacher (শিক্ষক) সামনে পেলে সাধারণতঃ ছাত্রদের শ্রদ্ধাভক্তিও সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে। অবশ্য তাদের অন্তরে যদি বিকৃতি দৃঢ়মূল হ'য়ে না থাকে।

মিস্ সাইক্‌স্—ধরুন, একজন শিক্ষক খুব আদর্শ-চরিত্র—তাঁর প্রেরণা, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির মূলে আছে হজরত মহম্মদের জীবন ও ইসলামের ভাবধারা, তার দ্বারা তার জীবন প্রভাবিত ও পরিচালিত। সেই শিক্ষককে ছাত্ররা যদি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করে, তাহ'লে তিনি ইসলামের আদর্শ ছাড়া আর কি সঞ্চারিত করতে পারেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—A true Musalman is a true Christian, a true Hindu, a true Buddhist and a true everything simultaneously (একজন খাঁটি মুসলমান যুগপৎ একজন খাঁটি খ্রীষ্টান, খাঁটি হিন্দু এবং খাঁটি যা'-কিছু)। কেউ কোন একজন প্রেরিতপুরুষের সুনিষ্ঠ ভক্ত হ'লে তার অন্যসব প্রেরিতপুরুষ ও ঈশ্বরে ভক্তিমান না হ'য়ে উপায় নেই। আর, যে পরমপিতার কাছে ঠিক, সে মানুষের কাছেও ঠিক। সবারই বান্ধব সে।

মিস্ সাইক্‌স্—মানুষের অল্পবিস্তর সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতা থাকেই। কোন শিক্ষকের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি তা' থেকে মুক্ত না হন এবং বিভিন্ন শিক্ষক ছাত্রদের মনের মধ্যে যদি বিভিন্ন রকম সংস্কার ও বোধের ছাপ ফেলেন, তার ফলই বা কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃত teacher-এর (শিক্ষকের) বৈশিষ্ট্য হ'লো অন্য teacher-দের (শিক্ষকদের) fulfil (পরিপূরণ) করা। ছাত্রদের বোধ ও ভাবের জগৎকে অনুধাবন ক'রে, ভাবে ব্যাঘাত না ক'রে, মনে কোনপ্রকার বিক্ষোভের সৃষ্টি না ক'রে প্রাঞ্জল সঙ্গতি-সহকারে যা' পরিবেষণ করার তা' করতে হবে। যাজন ও শিক্ষকতার কাজে তাই সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষদের নিয়োগ করা প্রয়োজন।

মিস্ সাইক্‌স্—আপনি যে-ভাবে শিক্ষাদানের কথা বললেন মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া সে-ভাবে শিক্ষা দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমনতর teacher (শিক্ষক) পাওয়া কঠিন। আমাদের তৈরী করতে হবে। তাদের খানিকটা uncoloured conception (অরঞ্জিত ধারণা) চাই about truth (সত্য-সম্বন্ধে)।

মিস্ সাইক্‌স্ বিনীতভাবে বললেন—আমি আপনার অনেক সময় নিচ্ছি এতে আপনার কোন অসুবিধা বা কষ্ট হ'চ্ছে না তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—সে কি কথা ? আমার মতো মুখ্যু মানুষের আবোল-তাবোল কথা আপনারা যে ধৈর্য্যসহকারে এত সময় ধ'রে শুনছেন, সেই তো আমার মহাভাগ্য।

মিস্ সাইক্স্—আপনার কথা অপূর্ব্ব, অতুলনীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্নেহময়ী জননীর কাছে শিশুর আধোবুলিও কত মিষ্টি!

শ্রীশ্রীঠাকুরের আন্তরিকতাপূর্ণ, অভিমানশূন্য, প্রাণস্পর্শী উক্তি সকলেরই অন্তরের কোমল তারে ঘা দিল। মিস্ সাইক্স্ মিনিটখানেক ভাবমুগ্ধ হ'য়ে চোখ বুজে রইলেন। পরে পূর্ব্ব কথার সূত্র ধ'রে বললেন—সত্যের অবিকৃত ধারণা আয়ত্ত করা সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, অতীতের অভিজ্ঞতা ও সংস্কার এবং পরিবেশের প্রভাব সর্ব্বদাই মানুষের মনের উপর ক্রিয়াশীল। ইচ্ছা করলেও সে তা' এড়াতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটার পিছনে আছে life-urge (জীবন-সম্বেগ), life-urge (জীবন-সম্বেগ) তার নিজ প্রয়োজনে will-power-কে (ইচ্ছাশক্তিকে) mould (গঠন) করে, re-inforce (শক্তিসংবৃদ্ধ) করে।

মিস্ সাইক্স্—পারিবেশিক ছাপ যা' মস্তিষ্কে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়, তা' অতিক্রম করা যায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—God-given life-urge (ঈশ্বরপ্রদত্ত জীবন-সম্বেগ) সর্ব্বদাই আমাদের প্রেরণা ও শক্তি জোগাচ্ছে অস্তিত্বের প্রতিকূল যা' তেমনতর limitation-কে (সীমাবদ্ধতাকে) overcome (অতিক্রম) করতে। আমাদের হাতে এই ব্রহ্মাস্ত্র থাকতে আমাদের ভাবনা কী ? পরাজয় হ'তে থাকলেও আমরা সংগ্রাম ক'রে চ'লব এবং একদিন জয়ী হবই।

মিস্ সাইক্স্—আপনি তো বলেন, কোন একজন প্রেরিতকে ভালবাসলে ও বুঝলে অন্যান্য প্রেরিতপুরুষদের সম্বন্ধেও শ্রদ্ধা ও বুঝ ফুটে ওঠে। কিন্তু ধরুন, আমি খ্রীষ্টান পরিবারে মানুষ, আমার জ্ঞান আছে একমাত্র বাইবেল-সম্বন্ধে। সে-ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের সত্যকে আমি তো হৃদয়ঙ্গম ক'রবো বাইবেলের আলোকে। অন্যান্য প্রেরিত বা তাঁদের উপদেশকে আমি ততটুকুই গ্রহণ ক'রবো যতটুকু ভগবান যীশু ও তাঁর বাণীর সঙ্গে মেলে, আর যা'-কিছু বাদ দেব। তাই, আমার ভিতর-দিয়ে শেষপর্য্যন্ত একমাত্র ভগবান যীশু ছাড়া আর কোন মহাপুরুষ পরিবেষিত হবেন না। লোকে তাঁদের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধেও জানতে পারবে না কিছু আমার কাছ থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান যীশুকে যদি normally (সহজভাবে) ভালবাসি, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের প্রতি আমার ovation ও appreciation (সম্মাননা ও গুণগ্রহণমুখরতা) spontaneous (স্বতঃ) হ'য়ে উঠবে। সেইটে হ'লো যীশুকে ভালবাসার test (পরখ)। হিন্দুদের মতে প্রত্যেক পরবর্ত্তীর মধ্যে

পার্শ্ববর্ত্তী প্রত্যেকে জাগ্রত থাকেন। Right attitude (ঠিক মনোভাব) থাকলে, right beginning (ঠিক আরম্ভ) হ'লে আমার দ্বারা কারও ক্ষতি হবে না। আলাদা-আলাদা সম্প্রদায় থাকলেও মূল conception (ধারণা) ঠিক থাকলে পরস্পর interested (স্বার্থান্বিত) হ'য়ে ঐক্যবদ্ধ হবেই। পরস্পর-পরস্পরকে enrich (সমৃদ্ধ) ক'রবে। ধর্ম্ম অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার মূলনীতি সর্ব্বত্রই এক। দেশ-কাল-পাত্রের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী বাহ্যতঃ যে পার্থক্য দেখা যায়, তারও লক্ষ্য বাঁচা-বাড়া। বাঁচা-বাড়া যার যেমন ক'রে অব্যাহত থাকে, তার পক্ষে তাই করণীয়। আর, বাঁচা-বাড়া জিনিসটা inter-fulfilling (পরস্পর পরিপূরক)। একজনের বাঁচা-বাড়ার সঙ্গে অপরের বাঁচা-বাড়ার কোন বিরোধ নেই। বরং একজন যদি প্রকৃত বাঁচা-বাড়ার পথে চলে, তার দ্বারা অপর সবার বাঁচা-বাড়ার interest (স্বার্থ) পুষ্টই হয়।

হাউজারম্যানদার মা—ভারতের হিন্দুদের মুসলমানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকা উচিত এবং মুসলমানদের হিন্দুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকা উচিত। পরস্পর মেলামেশা ও বোঝাপড়া থাকলে প্রত্যেকেরই ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারস্পরিক প্রীতিই পরমপিতার দয়ার অবদান। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গ'ড়ে তোলা দরকার, যাতে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আপন মনে করে, বাজে rivalry (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) বা inferiority (হীনম্মন্যতা) যাতে স্থান না পায়। যে-কেউ successful (কৃতকার্য্য) হ'লে পরস্পর গৌরব বোধ ক'রবে। প্রত্যেকেই মনে ক'রবে—আমারই গৌরব হ'লো। কারও কাউকে beat down (পরাজিত) ক'রবার প্রবৃত্তি হবে না। প্রত্যেককে এগিয়ে দেওয়াই হবে প্রত্যেকের স্বার্থ। এইটেই হ'লো ধর্ম্মভাব, দেবভাব। "যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ।" যা'-দিয়ে নিজের এবং অন্যের জীবন এবং বৃদ্ধি বিধৃত হয়, তাই ধর্ম্ম। শুধু নিজের life and growth-এর (জীবনবৃদ্ধির) উপর জোর দেওয়া হয়নি। আর, পারিপার্শ্বিককে বাদ দিয়ে একক একজনের life and growth (জীবনবৃদ্ধি) সম্ভবও নয় কখনও।

মিস্ সাইক্স্—আমি এমন সমাজ দেখেছি, যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি, বিশ্বাস ও সহযোগিতা নিয়ে বসবাস করে, পরস্পর-পরস্পরের সুখে-দুঃখে, আমোদে-উৎসবে, বিপদে-আপদে প্রিয়জনের মতো ব্যবহার করে। এটা সমাজে স্বাভাবিক হওয়া কঠিন কিছু না। এটা ব্যাহত হয় দুষ্ট রাজনীতির দরুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Bad politics (দুষ্ট রাজনীতি) মানে depriving politics (বঞ্চনাকারী রাজনীতি)। যে-কোন নীতি যদি ধর্ম্মের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাতে মানুষের কতখানি কাজ হয় তা' বুঝতে পারি না।

আর, ধর্ম্মের মূলনীতি তো বললাম—"যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ।" Prophet-রা (প্রেরিতপুরুষরা) সর্ব্বত্র একযোগে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণের কথাই বলেছেন। এর উল্টো কথা তাঁদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। এগুলি দেখলে মনে হয়, তাঁরা যেন এক জায়গায় ব'সে সকলে মিলে যুক্তি ক'রে আলাদা language-এ (ভাষায়) একই truth (সত্য) ব'লে গেছেন।

হাউজারম্যানদার মা—বর্ত্তমান পরিপূরক ব'লতে আপনি কি বোঝেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন Christ (যীশুখ্রীষ্ট) fulfiller (পরিপূরক) ছিলেন in his time (তাঁর সময়ে)।

মিস্ সাইক্স্—একই সময়ে একাধিক পরিপূরকও তো থাকতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরম পূরয়মাণ যিনি, তিনি একজনই থাকেন। তাঁর পার্ষদ বহু থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁরা বহু হ'লেও এক। যেমন যীশুর ১২ জন apostle (প্রচারক) ছিলেন। Apostle-দের (প্রচারকদের) প্রত্যেকেই কিন্তু যীশুর বাণীবহ।

হাউজারম্যানদার মা—পাশ্চাত্ত্যদেশের লোক গুরুর প্রয়োজন তেমন একটা বোধ করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের কাছে ঠিকমতো বললে বোধ ক'রবে।............মানুষ বিশ্বাস করে, kingdom of heaven (স্বর্গরাজ্য) প্রতিষ্ঠিত হবে পৃথিবীর বুকে। তা' সম্ভব হবে তখনই, যখনই অধিকাংশ মানুষের complex (প্রবৃত্তি) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হবে out of love for an adjusted one (সুনিয়ন্ত্রিত যিনি তাঁর প্রতি ভালবাসার ভিতর-দিয়ে)। সেই পূরয়মাণ প্রাজ্ঞ প্রেমিক-পুরুষকে অবলম্বন ক'রেই বিভিন্ন ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ ও দেশের মধ্যে গজিয়ে উঠবে পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। তখন সেই war (যুদ্ধ) থাকবে না, থাকবে war of becoming (বিবর্দ্ধনের যুদ্ধ)। Becoming-এর (বিবর্দ্ধনের) বিরোধী যা' তাকে overcome (অতিক্রম) করাই হবে মানুষের তপস্যা। কে কাকে কতোখানি আরও ক'রে দিতে পারে, সেইটেই হবে মানুষের নেশা। এতেই আসবে inter-interestedness (পারস্পরিক স্বার্থ-সম্বন্ধতা), আসবে interdependence (পরস্পর নির্ভর-শীলতা), আসবে freedom (স্বাধীনতা), আসবে heaven (স্বর্গ) এবং তা' সবার জন্য।

মিস্ সাইক্স্—পাশ্চাত্ত্যদেশে আধ্যাত্মিকতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিল একজন জীবন্ত মানুষের প্রভাবে। সুতরাং এ-কথা একতালাভাবে বলা চলে না যে পাশ্চাত্ত্যদেশ জীবন্ত আদর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। ওদেশে অনেক সাধক আছেন—যাঁরা এতে বিশ্বাস করেন। আবার, এ-কথাও বলা চলে না যে, প্রাচ্যবাসীরা সকলেই গুরুবাদ মানেন। অনেকে ভিন্নমতও

পোষণ করেন। কিন্তু আমার কথা হ'চ্ছে, গুরুর উপর বেশী নির্ভরশীলতা মানুষের ব্যক্তিত্বকে তো খর্ব্ব ক'রে দিতে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুকে ভালবাসার প্রধান লক্ষণ হ'চ্ছে, তাঁর ইচ্ছা, আদেশ, নীতিবিধি, আদর্শ ও স্বার্থকে প্রধান ক'রে নিয়ে তাঁর পরিপূরণে আপ্রাণ হ'য়ে ওঠা। আর, তা' করতে গেলে মানুষের অনেক বুদ্ধি, অনেক শক্তি, অনেক যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব জাগিয়ে তুলতে হয়। যে-মানুষটা আপন খেয়ালে চ'লে বিচ্ছিন্নমনা বা সঙ্কীর্ণ হ'য়ে থাকতো, integrating thread-এর (সংহতিসন্দীপী সূত্রের) অভাবে যার personality (ব্যক্তিত্ব) ব'লে কিছু গজাতে পারতো না, সেই হ'য়ে ওঠে সংহত, শক্তিমান, সার্থককর্ম্মা। এইতো হ'লো গুরুনিষ্ঠার অবদান। এর মধ্যে ব্যক্তিত্বহানির আশঙ্কা কোথায়? তবে এতে মানুষের প্রবৃত্তিমার্গী বাতুল স্বাধীনতা অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়, এ-কথা ঠিকই।

হাউজারম্যানদার মা—গুরুকে সর্ব্বতোভাবে মেনে চলা ঠিক নয়। কারণ, তাঁর মধ্যে বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও কিছু-কিছু দোষ ও ভুল থাকতে পারে। আর, তা' অনুসরণ ক'রে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃত গুরু যিনি, বেত্তাপুরুষ যিনি, তাঁর মধ্যে দোষ ও ভুল ব'লে কিছু থাকেই না। তবে তাঁর সব আচরণের অর্থ আমরা হয়তো ঠিকমত বুঝতে পারি না। তাও বুঝতে পারবো যদি তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিই। কাউকে গুরু ব'লে গ্রহণ করার আগে হিসাব ক'রে করা ভাল। কিন্তু গুরু ব'লে গ্রহণ করার পর শ্রদ্ধাসহকারে অনুসরণ করতে হয়। কেউ যদি বেত্তাগুরু না হন, তাঁর উচিত নিজেকে দীক্ষা-উপদেষ্টা বা ঋত্বিক্ ব'লে পরিচিত ক'রে পূর্ব্বতন বেত্তাগুরুকে গুরু হিসাবে দেখিয়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে জীবন্ত সদ্‌গুরু বা বেত্তাপুরুষকে পেলে তাঁকে গ্রহণ করতে বলা উচিত। বেত্তাপুরুষই আমাদের ধ্যেয় ও অনুসরণীয়। তাঁর প্রতি নিষ্ঠা ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গীতি যাঁর যতখানি, তিনি ততখানি আমাদের ভক্তির পাত্র।

হাউজারম্যানদার মা—একজনের গুরুকে যদি আমার ভাল না লাগে, তবে তিনি তো আমার গুরু হ'তে পারেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু জোর ক'রে ঢুকান যায় না।

এরপর ওঁরা তখনকার মতো গাত্রোত্থান ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর (দেওঘর) প্রাঙ্গণে একখানি ইজিচেয়ারে এসে ব'সেছেন। আকাশ মেঘমুক্ত। সারাদিনের গরমের পর এখন বেশ ঝির-ঝিরে হাওয়া দিচ্ছে। বেশ একটা মিঠে উজ্জ্বলতা ও আমেজ মিশে আছে অপরাহ্ণের এই স্নিগ্ধমধুর আবহাওয়ার মধ্যে। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসার কিছুক্ষণ পর হাউজারম্যানদা, তাঁর মা, মিস্ মার্জ্জোরী সাইক্‌স্, প্রমথদা (দে), সুধাংশুদা

(মৈত্র), প্যারীদা (নন্দী) এবং মায়েদের মধ্যে কয়েকজন সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। সবাই উপবেশন করার পর ধীরে-ধীরে আবার আলাপ-আলোচনা সুরু হ'লো।

প্রমথদা বললেন—প্রায়ই দেখা যায়, কোন বিশিষ্ট পুরুষের মৃত্যুর পর তাঁর গঠিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পূর্ব্বের সেই প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না এবং ধীরে-ধীরে সেখানে নানা ব্যতিক্রম ও গলদ ঢুকতে থাকে। এমনটা হওয়া কি অবশ্যম্ভাবী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ভিতর realisation (উপলব্ধি) না থাকলে experience-গুলি (অভিজ্ঞতাগুলি) adjusted (বিন্যস্ত) হয় না। Experience-গুলি (অভিজ্ঞতাগুলি) adjusted (বিন্যস্ত) না হ'লে knowledge (জ্ঞান) হয় না। আবার, knowledge (জ্ঞান) adjusted (বিন্যস্ত) না হ'লে wisdom (প্রজ্ঞা) হয় না। A man, who is not wise, cannot fit in things with needs (যিনি প্রজ্ঞাবান নন, তিনি প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করতে পারেন না)। তাই, wise man-এর (প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির) অবর্ত্তমানে কিছু-কিছু অসুবিধা অনিবার্য্য। কিন্তু তাঁর প্রতি গভীর অনুরক্তিসম্পন্ন লোক যদি থাকে, তারা ধারাটা অনেকখানি ধ'রে রাখতে পারে। সশ্রদ্ধ অনুসরণ ও অনুশীলনই একমাত্র জিনিস যা' মহৎদের সঞ্জীবিত ক'রে রাখে লোকজীবনে।

মিস্ সাইক্স্—অনেকে বলে—আমার জন্য, আমার কাজের জন্য, আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রার্থনা ক'রো।—কী ক'রলে এই প্রার্থনা সর্ব্বোত্তমভাবে করা হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রার্থনার মধ্যে সদিচ্ছা থাকে। সদিচ্ছা সৎ-কর্ম্মকে যদি invoke (আবাহন) না করে, তবে প্রার্থনা complete (পুরো) হয় না। যার জন্য যা' প্রার্থনা করা হয়, তা' যাতে বাস্তবে হ'য়ে ওঠে, সেজন্য সাধ্যমতো চেষ্টাও করতে হয়। এইভাবে ভাবা, বলা ও করা যত একমুখী হ'য়ে ওঠে, ততই প্রার্থনা সুষ্ঠুতা ও পূর্ণতা লাভ করে।

মিস্ সাইক্স্—শুধু মুখের প্রার্থনায় ফল হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় না। তবে প্রার্থনা যদি আন্তরিক হয়, তবে তজ্জাতীয় প্রচেষ্টা, বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা সঙ্গে-সঙ্গে লেগেই থাকে এবং তার ফল যা' হবার তা' হয়ও।

মিস্ সাইক্স্—যাদের জন্য কিছু কাজে করতে পারবো না, তাদের জন্য প্রার্থনায় কোনই ফল হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ প্রার্থনা করতে বললে বলা ভাল—'তুমি এমনি ক'রে চ'লো

এবং আমার প্রার্থনা—তুমি যেন সফল হও।' আশীর্ব্বাদ কথাটার মানেও ঐরকম।

মিস্ সাইক্স্—ভগবান সর্ব্বশক্তিমান এবং তিনি ইচ্ছা ক'রলে সব-কিছু করতে পারেন, দিতে পারেন—সেই বিশ্বাসে আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। প্রার্থনা-সম্বন্ধে আপনার মনোভাব কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবি, পরমপিতার দয়ায় আমরা যেন অভ্রান্ত পথে চ'লে সফল হ'তে পারি। আশীর্ব্বাদ মানে বিধিবাদ, অনুশাসনবাদ। কিভাবে কী করতে হয় তার নির্দ্দেশ। আমরা পরমপিতার আশীর্ব্বাদ অর্থাৎ অনুশাসনবাদ জানতে পারি দ্রষ্টাপুরুষদের মাধ্যমে। সেই পথ ধ'রে যদি চলি, করি তাহ'লেই কৃতকার্য্য হ'তে পারি। তাঁর প্রতি ভক্তি ও নতি যত থাকে, ততই চলাটা হয় সুষ্ঠু, deviating move (ব্যতিক্রমী চলন) যায় ক'মে, এবং তাতে কৃতকার্য্যতার পক্ষে সুবিধা হয়। তবে self-interest-এর (আত্মস্বার্থের) fulfilment-এর (পূরণের) জন্য প্রার্থনা না ক'রে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে তাঁর wishes (ইচ্ছাগুলি) fulfil (পূরণ) করা যায়। তাতে ভুল চাওয়া ও তজ্জনিত suffering-এর (দুর্ভোগের) হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আমাদের যে মালুমই নেই আমাদের real interest (প্রকৃত স্বার্থ) কী।

মিস্ সাইক্স্—আমরা খ্রীষ্টান হিসাবে বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমাদের কাছে পিতার মতো। তিনি শক্তিস্বরূপ, তিনি প্রেমময়, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক আছে, তাই আমরা দুর্ব্বল হ'লেও নিরাশ্রয় নই। তিনিই সতত আমাদের মঙ্গল বিধান ক'রছেন। ঈশ্বর-সম্বন্ধে এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক-দিয়ে চিন্তা করা ভাল, না তাঁকে নৈর্ব্যক্তিক শক্তিরূপে চিন্তা করা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা relation (সম্পর্ক) establish (স্থাপন) ক'রে নিলে concentration-এর (একাগ্রতার) পক্ষে সুবিধা হয়। তাঁর প্রতি ভালবাসা যতো একমুখী হয়, আমাদের জীবন ও চরিত্রও ততো উন্নত হয়। আর, চরিত্র যদি তাঁর ভাবে রঞ্জিত না হয়, তবে কিছুই পাওয়া হ'লো না, কিছুই হওয়া হ'লো না।

প্রফুল্ল—ঠাকুর! আমি তো দেখতে পাই, করার পাল্লা ছাড়িয়ে তাঁর দয়ার পাল্লা ঢের বেশী প্রভাবশালী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করার ভিতর-দিয়ে mercy-কে (দয়াকে) ঐ-ভাবে feel (বোধ) করা যায়। করাটা যতো বিধিমাফিক হয় ও ইষ্টার্থী হয়, ততোই মঙ্গল। আর, ঐ করা মানে পূজা, পূজা মানে সম্বর্দ্ধনা।.........urge (আকুতি) যখন physically (স্থূলভাবে) worked out (রূপায়িত) হয়, তখন হয় energy (শক্তি)। আর, energy-ই (শক্তিই) wish-টাকে (ইচ্ছাটাকে) materialise (বাস্তবায়িত) করে।

সন্ধ্যা লাগতেই চারদিকের আলোগুলি জ্ব'লে উঠলো। ইতিমধ্যে প্যারীদা একবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাংশুদাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—রেডিও ধরবা তো ?

সুধাংশুদা—সংবাদের সময় খুলবো।

হাউজারম্যানদা—আকুতি আসে কোথা থেকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা দেওয়া থেকে। এটা ভালবাসা থেকে আসে। কেউ-কেউ তাকে বলে সুরত অর্থাৎ যা' সম্যক রত হ'য়ে চলে। একে libido বা lifeurge-ও (জীবন-আকুতিও) বলা চলে। আমি অবশ্য ঠিক জানি না।

হাউজারম্যানদা—এই ভালবাসার শক্তি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম নয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার-যার মতো তার-তার। আর, যার যা' থাকে তাই-ই যথেষ্ট।

মিস্ সাইক্স্—প্রেমের সংজ্ঞা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেমের মধ্যে আছে প্রীণন। প্রিয়কে খুশি ক'রে খুশি হওয়ার প্রবৃত্তি। সেই সম্পদশালী, যে যত ভালবাসতে জানে। যে ভালবাসা পায়, তার থেকে সেই ভাগ্যবান যে ভালবাসে।

মিস্ সাইক্স্—কামনা কি প্রেমের বিরোধী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে খুশি করাটা কামনা। প্রেম চায় প্রিয়ের খুশি।

মিস্ সাইক্স্—দাম্পত্য প্রেমেরও কি আদর্শ এই ? স্বামী বা স্ত্রী নিজের জন্য কি কিছুই চাইবে না ? একে অপরের মঙ্গল-কামনা, সুখ-কামনাকেই প্রধান ক'রে চ'লবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বামীর স্বার্থ হ'লো স্ত্রীর মঙ্গলকামনা করা ও বাস্তবে তার মঙ্গল করা এবং স্ত্রীর স্বার্থও হ'লো স্বামীর মঙ্গলকামনা করা ও কার্য্যতঃ তা' করা। এই মঙ্গলকামনা করা ও মঙ্গল করা তখনই সম্ভব হয়, যখনই উভয়ে Supreme Lord-কে (পরমপ্রভুকে) satisfy (সন্তুষ্ট) ক'রতে চায়। নইলে বিকৃত স্বার্থপরতা ঠেসে ধরে। প্রিয়স্বার্থী ভালবাসা যেখানে, তা' সব সময়ই self-contented (স্বতঃ-সন্তুষ্ট), সব সময়ই virtuous (পুণ্য-সন্দীপ্ত)।

মিস্ সাইক্স্—এই সন্তুষ্টির কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে ভালবাসে সে ভাবে, আমার প্রিয় যদি ভাল থাকে তাহ'লে আমার বিশ্বদুনিয়া ভাল থাকলো। তার ভাল-থাকাটা প্রিয়কে ভাল রাখার উপর dependent (নির্ভরশীল)। আর, যাতে প্রিয়ের তোষণ, পোষণ ও সেবায় ব্যাঘাত না হয়, সেই আগ্রহে সে নিজেকেও সুস্থ, দীপ্ত ও কর্ম্মঠ রাখে। সব ক'রেও সে ভাবে, আমার বুঝি করায় ত্রুটি থাকলো, তার বুঝি কষ্ট হ'লো। তাই সন্তোষ যেমন থাকে, তার সাথে-সাথে সন্ত্রাসও থাকে। এই আকুলতা তাকে দিন-দিন perfection-এর (পূর্ণতার) দিকে নিয়ে যায়। তাই, প্রকৃত ভালবাসা

যেখানে, সেখানে হীন স্বার্থপ্রত্যাশা থাকে না, অনুযোগ থাকে না, অভিযোগ থাকে না, আত্মপ্রশংসা থাকে না, বরং থাকে আত্ম-সমালোচনা।

মিস্ সাইক্স্—শুধু কামমূলক যে বিবাহ, তা' কখনও সার্থক হ'তে পারে না। আবার, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'—বিবাহ-সম্বন্ধে এ-ধারণাও সম্পূর্ণ নয়। কারণ, আমার মনে হয়, তাতে স্ত্রীকে বংশরক্ষার অপরিহার্য্য উপকরণ হিসাবে ধ'রে নেওয়া হয়। ফলে তার ব্যক্তি-সত্তার উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন-পূরণের পিছনে ইষ্টের সন্তোষ-বিধানের লক্ষ্য থাকে না, পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের সত্তাকে পুষ্ট ক'রে ভবিষ্য কল্যাণকে আবাহন করার ব্যবস্থা থাকে না, তা' আপাতদৃষ্টিতে যতই ভাল হো'ক, কিছু-না-কিছু দোষদুষ্টি তার মজ্জায় লুকিয়েই থাকে। কিন্তু বিবাহের মূল উদ্দেশ্য যেখানে থাকে ইষ্টানুগ অনুচলনে নিজেদের সম্বুদ্ধ ও সংবর্দ্ধিত ক'রে সেবায় ও সুপ্রজননে পরিবার-পরিবেশকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা, ভগবানের আশীর্ব্বাদ সেখানে বর্ষিত হয়, এবং তিনিই তাদের উভয়কে এক ক'রে দেন।

মিস্ সাইক্স্—আমার মনে হয়, গীতায় যে নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শের কথা বলা হ'য়েছে এবং বাইবেলে যে ঈশ্বরকে এবং অপরকে ভালবাসা ও সেবা করার কথা বলা হ'য়েছে—এই দুইয়ের মধ্যে গভীর মিল আছে। আমার আরও মনে হয়, ধর্ম্মের মূল ব্যাপার হ'লো—আমাদের ইচ্ছাকে এমনভাবে রূপান্তরিত ক'রে তোলা—যাতে তা' ঈশ্বরের ইচ্ছাপূরণের জন্য আপ্রাণ হ'য়ে ওঠে। আপনি এ-বিষয়ে কী বলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমিও তাই বলি। ঐ কথাই ঠিক। ঐ মূল ঠিক থাকলে ধর্ম্মের অবদান-স্বরূপ সপরিবেশ বাঁচা-বাড়া spontaneous (স্বতঃ) হ'য়ে ওঠে।

মিস্ সাইক্স্ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর করুণভাবে বললেন—কাউকেই আমার ছাড়তে মন চায় না। তবে যাওয়ার দরকার থাকলে যেতেই হবে। কিন্তু সুযোগমত আবার আসবেন।

৭ই ভাদ্র, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৪।৮।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর (দেওঘর) প্রাঙ্গণে আমতলায় এসে বসেছেন। পাবনা থেকে এনায়েৎ বিশ্বাস, খবির মিঞা, নরেনদা (মিত্র) প্রমুখ এসেছেন। দেবুভাই (বাগচী) ও কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) উপস্থিত আছেন।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্বন্ধ নেই। ধর্ম্ম বলে,

পূর্ব্বপূরয়মাণ, বৈশিষ্ট্যপালী, সত্তাসম্বর্দ্ধনী প্রত্যেকটি মহাপুরুষকে মানতে। রসুল যেমন তোমাদের, তেমনি আমাদেরও। তিনি সবারই। যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রমুখ প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ঐ কথা। আমি হিন্দু ব'লে রসুলকে, যীশুখ্রীষ্টকে বা বুদ্ধদেবকে ভক্তি যদি না করি, তাহ'লে আমার হিন্দুত্বেরই অবমাননা হয়। ওদের মধ্যে বিভেদ করাই অন্যায়। আমি শ্রীকৃষ্ণকে মানি অথচ তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের ও পরবর্ত্তীদের মানি না, তার মানে শ্রীকৃষ্ণকেও মানি না। এক-একজন মহাপুরুষকে অবলম্বন ক'রে এক-এক সম্প্রদায় হ'লেও, যেহেতু প্রকৃত মহাপুরুষরা সবাই এক বার্ত্তাবাহী ও একেরই নানা কলেবর, সেইজন্য প্রত্যেক মহাপুরুষই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের। আর, পিতৃবংশ ও পিতৃকৃষ্টিকে অস্বীকার ক'রতে উৎসাহিত ক'রে তথাকথিত conversion (দ্বিজাধিকরণান্তর) চালানোর ফলে, অযথা আল সৃষ্টি করা হয়েছে। খোদাতালার অভিসম্পাত আমাদের উপর পড়েছে। রসুল চাননি যে, কেউ পিতৃপুরুষের পরিচয় মুছে ফেলুক, এক বংশের মানুষ নিজেকে আর-এক বংশের মানুষ ব'লে পরিচয় দিক। এইসব অপকর্ম্ম ক'রে বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। আমি বুঝি খোদার প্রতি, রসুলের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস যাদের থাকবে, তাদের দিয়ে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার হবার কথা নয়। আমরা বেশীর ভাগ মানুষ ধর্ম্মের পথে চলি না, ধর্ম্মের নামে নিজেদের বৃত্তিস্বার্থ চরিতার্থ করি। তাতেই যত গোলমাল হয়। আর, তথাকথিত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা যারা, তারা ইচ্ছা ক'রেই বহু জিনিসের বিকৃত ব্যাখ্যা করে।

খবির মিঞা—আপনার কথা তো খুব ঠিক। কিন্তু পরিবেশ যেখানে বিকৃত সেখানে কী করা সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিকৃতিকে সুকৃতিতে পরিণত করা আমাদেরই দায়িত্ব। নইলে কেউ রেহাই পাব না। নিজেরা ঠিক বুঝে নিয়ে চলা লাগে। আর, মানুষের ভিতরও তাই চারাতে হয়—যাতে নিজেদেরও ভাল হয়, অপরেরও ভাল হয়।

৮ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ২৫।৮।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যা থেকে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে বাইরে তাবুর মধ্যে আছেন। মণিমামার খুব অসুখ। সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ চিন্তান্বিত। তাঁর নির্দ্দেশমতো প্রফুল্ল অনেকগুলি কবিরাজী ও মুষ্টিযোগের বই এনে হাজির ক'রলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাংশুদাকে বললেন—বইগুলি ভাল ক'রে দেখ তো, আশু উপকার পাওয়া যায়, এমন কিছু বের ক'রতে পার কিনা।

সুধাংশুদা (মৈত্র) শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ব'সেই বইগুলি দেখতে লাগলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বই দেখা চ'ললো। সুধাংশুদা কোন-কোন বই থেকে দুই-একটা

জায়গা প'ড়েও শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ব্ঝিয়ে বললেন—ঐ-সব ওষ্ধে সুবিধা যেমন আছে, অসুবিধাও কী-কী হ'তে পারে।

এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর বার-বার লোক পাঠিয়ে মণিমামার সংবাদ নিতে লাগলেন। কিসে রোগী একটু স্বস্তি পান, সেই-ই তাঁর একমাত্র চিন্তা। দেখে মনে হচ্ছিলো, রোগজনিত কষ্ট যেন তিনি নিজ শরীরেই অন্ভব ক'রছেন।

১১ই ভাদ্র, ব্হস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৮। ৮। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁব্তে এসে বসেছেন। আগামী কাল থেকে এখানে (দেওঘর) ৩৬তম ঋত্বিক্-অধিবেশন সুর্ হবে। তাই কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে খবরের কাগজ পড়িয়ে শোনান হ'চ্ছে।

পরে শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—জমি জিনিসটা কার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমি জিনিসটা লোকরক্ষার্থে পরমপিতার দান। মানব-সমাজে ঐ লোকরক্ষণী ও লোকরঞ্জনী দায়িত্ব নিয়ে যিনি চলেন—ইষ্ট, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও লোকস্বার্থকে অব্যাহত ও অক্ষ্ণ্ণ রেখে,—তাঁকেই বলে রাজা। রাজা বা রাষ্ট্র-সংস্থার কর্ত্তব্যই হ'চ্ছে প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা-অন্যায়ী সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয় লাভের সুযোগ দেওয়া এবং কেউ যাতে তার সদ্ভাবে-অর্জ্জিত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় বা ঐ অধিকারের অপব্যবহারে সমাজের অকল্যাণ না করে, তার ব্যবস্থা করা। এই হিসাবে রাজা বা রাষ্ট্রসংস্থার মাধ্যমেই ব্যক্তিগতভাবে প্রজারা বিহিত পন্থায়, শিষ্ট সর্ত্তসহ জমির উপর অধিকার বা মালিকানা পায়। সেই মালিকানা আবার প্রজার ইচ্ছাক্রমে অন্যের উপরও বর্ত্তাতে পারে। হিন্দ্ হো'ক, ম্সলমান হো'ক, বা যে-কেউই হো'ক, কোন প্রজাকে এমন অবস্থায় ফেলার অধিকার কারও নেই, যাতে তার ইচ্ছার বির্দ্ধে তাকে পিতৃপ্র্ষের ভিটেমাটি-সম্পত্তি ছেড়ে উদ্বাস্তু হ'তে হয়। কোন নেতারই নেতৃত্বের সুযোগ নিয়ে লোককে বিপদে ফেলার মতো পরিস্থিতি স্ষ্টি করার অধিকার নেই। অন্যায় করাও যেমন পাপ, অন্যায়ের কাছে yield (নতি স্বীকার) করাও তেমনি পাপ। ঋষিকে বাদ দিয়ে, তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হ'য়ে, ঋষিবাদ নিয়ে চলতে চায় যারা, পদে-পদেই তারা গোলমাল ক'রে বসে। জীবনকে ক্ষ্ণ্ণ ক'রে politics-ও (রাজনীতিও) হয় না, ধর্ম্মও হয় না।

শরৎদা—ধর্ম্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ-সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম কখনও বহ্ হয়—এ আমি ব্ঝি না। ধর্ম্মই ধর্ম্ম, আর তা' চিরকাল ম্লতঃ এক। খ্রীষ্টান-কৃষ্টি, ইসলাম-কৃষ্টি, হিন্দ্-কৃষ্টি বা আর্য্য-কৃষ্টি যাই বলেন—এগ্লি আলাদা নয়। প্রত্যেকটাই হ'লো ধর্ম্ম-কৃষ্টি, যার কাজ হ'লো আদর্শ প্র্ষের প্রদর্শিত পথে আচার ও অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে

ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন ও বৃদ্ধিকে আরোর দিকে চালান। এমন কোন ধর্ম্মমত নেই যেখানে উৎসকে মানার কথা নেই, আত্মনিয়ন্ত্রণী তপস্যা নেই বা পরিবেশের সেবার কথা নেই। এর উল্টো কথা কোথাও আছে ব'লে আমি জানি না। Revealant (সত্যপ্রদর্শক)-দের কথার মধ্যে কোন ফাঁক নেই।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—Revealant (সত্যপ্রদর্শক) তো নানা ধরণের হ'তে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Life-এর (জীবনের) এক-একটা aspect-এর (দিকের) revealant হ'তে পারে, যেমন ছিলেন নাগার্জ্জুন। Revealant the fulfiller (সত্যপ্রদর্শক পূরণ-পুরুষ) আলাদা কথা। তাঁর মধ্যে সব aspect-এর (দিকের) solution-ই (সমাধানই) প্রকট।

কেষ্টদা—আপনি এখন আমাদের যে-ধরণের লোককে বিপুল সংখ্যায় দীক্ষিত করার কথা বলছেন, তা' সম্ভব হয় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাগল হ'য়ে লাগলেই হয়। মানুষ, অর্থ সবই জোটে।

কেষ্টদা—অসহ্য সম্বেগে দেশের সত্যিকার ব্যথা ও তার সমাধানের কথা যদি কয়, তাহ'লেই হয় তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হয়। Maddening urge ও grim determination (পাগল-করা আকুতি ও তীব্র সঙ্কল্প) আস্‌লে men and resource (মানুষ এবং অর্থ) আসবে। তার উপর দাঁড়িয়ে জনসাধারণের বাঁচা-বাড়ার স্বার্থকে সলীল ক'রবার জন্য আরও further move (নূতনতর প্রণোদনা) দিতে হবে। এইভাবে এগিয়ে চ'লতে হবে। যত বেশী মানুষের চলন ঠিক ক'রে তোলা যাবে, ততই দেশের atmosphere (পরিমণ্ডল) healthy (সুস্থ) হবে।

কেষ্টদা—সমাজ-জীবনে যে-সব গলদ আছে, অন্যায় আছে, অপরাধ আছে, সেগুলির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করাও তো দরকার। প্রয়োজনমতো মানুষকে offend (রুষ্ট) করার সাহস যদি না থাকে, সে তো একটা ভীরুতার লক্ষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Offend (রুষ্ট) করা যেখানে চাতুর্য্য সেখানে offend (রুষ্ট) করাই লাগে। তাও নিজের উপর দখল চাই। নইলে উদ্দেশ্য পণ্ড হ'য়ে যায়।

প্রফুল্ল—অনেক আন্দোলনে দেখা যায় উদ্যোক্তারা অবহেলিত ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করেন। প্রথমে তাঁরা হয়তো বিরোধের সম্মুখীন হন, এমন-কি নির্য্যাতিতও হন, পরে এর ভিতর-দিয়েই জনগণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ ক'রে জয়যুক্ত হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়া সোজাসুজি বিরোধিতা ক'রতে যাওয়ার বিপদ আছে। এতে আন্দোলন আঘাতের চোটে যেমন বেড়েও যেতে পারে,

তেমনি আবার থেমেও যেতে পারে। পরিস্থিতি-সম্বন্ধে analysis (বিশ্লেষণ) চাই। হুজুগের করা টেকে না, সাময়িক তার যতই উচ্ছ্বাস দেখা যাক না কেন। আর, অপরের দোষ শোধরাবার আগে নিজেদের স্ব-স্ব দোষ শোধরান লাগে। তখনই দোষ শোধরাবার অধিকার হয়। আর, অসৎনিরোধী শক্তিকে যত সংহত ও প্রবল ক'রে তোলা যায়, ততই কার্য্যকরী হয়। Feeble protest (মৃদু প্রতিবাদ) অনেক সময় ক্ষতিকর হয়। তাই চাতুর্য্য চাই, proper manipulation (যথাযথ কৌশলী পরিচালনা) চাই, আর চাই মন্ত্রগুপ্তি। আমি বলি—যে-স্বার্থের ভিতরে সবার স্বার্থ নিহিত, সেই স্বার্থ নিয়েই fight (সংগ্রাম) কর তোমরা। তার জন্য শাসন-তোষণ সবই ক'রতে হবে। একঝোঁকা হ'য়ে গেলে হবে না, অর্থাৎ শাসন বা তোষণ কোনদিকে ঢ'লে পড়লে হবে না। মঙ্গলের জন্য যখন যেভাবে যা' করা লাগে, তাই ক'রতে হবে। আর, এ-সব করার জন্য চাই যথেষ্ট সংখ্যক wholetime worker (নিরত কর্ম্মী)। মানুষের পিছনে অত্যন্ত খাটতে হয়। এই কাজ অনেকদিন করা হয়নি। তাই মানুষগুলির চরিত্রে শেথলা প'ড়ে গেছে। এই শেথলা তুলতে অনেক মানুষের অবিরাম পরিশ্রমের দরকার। (অনুচ্চ কণ্ঠে—কতকটা স্বগতভাবে)—তোমরা বুঝতে পারছ তো ?

লোকমঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরে যে অসীম আর্ত্তি, শেষের কথাগুলির ভিতর-দিয়ে তারই আকুল অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো তাঁর চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে। তাঁর অন্তরবেদনা আবিষ্ট হ'য়ে গেল সবার অন্তরে। সকলেই আত্মনিমগ্ন হ'য়ে ভাবতে লাগলেন স্ব-স্ব করণীয়-সম্বন্ধে।

১৫ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ১।৯।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় এসে বসেছেন। চোখে-মুখে সেই চিরন্তন প্রসন্ন প্রশান্তি, সেই দুঃখহরা, আপন করা, আত্মভোলা ভালবাসার মোহনমাধুর্য্য— যা' মানুষকে কেবলই কোল দেয়, কাছে টানে, দেয় নিরাপদ আশ্রয়। আর্ত্ত-তাপিত মানুষ তাই স্বতঃই ছুটে আসে তাঁর কাছে। কাল ঋত্বিক্-অধিবেশন শেষ হ'য়ে গেছে। বাইরে থেকে কর্ম্মী ও অন্যান্য যাঁরা এসেছেন, এখন সবার যাবার পালা। অনেকেই এসে ভীড় ক'রছেন তাঁর কাছে। ব্যক্তিগত প্রশ্ন ও সমস্যাদির সমাধান ক'রে নিচ্ছেন। কেউ বলছেন নামধ্যানের কথা, কেউ বলছেন যাজনের কথা, কেউ বলছেন রাজনীতির কথা। আবার অসুখ-বিসুখ, চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, মামলা-মোকদ্দমা, চাষ-বাস, পারিবারিক অশান্তি, ছেলের অবাধ্যতা, মেয়ের বিবাহ, ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা, বাড়ী-ঘর করা ইত্যাদি অজস্র বিষয়-সম্বন্ধেও শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ নিচ্ছেন অনেকে। অনেকে চুপচাপ ব'সে আছেন। কথাবার্ত্তা সব শুনছেন।

আজ অনেকে নূতন পাঞ্জা পেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের এবং পুরাতন কর্ম্মীদের বার-বার বিপুল সংখ্যক বিশিষ্ট লোক যথাসত্বর দীক্ষিত ক'রবার জন্য বলছেন। সঙ্গে-সঙ্গে সাধারণ দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথাও বলছেন। জনে-জনে কতজনকে কতবার যে এই কথা বলছেন, তার লেখাজোখা নেই। কথা বলতে-বলতে তিনি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন। তবু তাঁর উৎসাহের শেষ নেই। প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে অবিশ্রান্তভাবে প্রেরণার প্রাণবন্যা ঢেলে দিয়ে চ'লছেন। সারা জায়গাটায় যেন এক পুণ্য-উদ্দীপনার ঘূর্ণি সৃষ্টি ক'রে তুলেছেন। যে এই আবেষ্টনীর আওতায় আসছে, মুহূর্ত্তেই তার মন আগুন হ'য়ে উঠছে ঐ ব্রত-উদ্‌যাপনী সাধু সঙ্কল্পের দিব্য-দীপনায়। ইষ্টপাট যে ধরাধামে শ্রেষ্ঠ তীর্থ, তা' এই পরিবেশে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অভিভূতি-আবিষ্ট মন দেখতে-দেখতে সঙ্কীর্ণতার নরক থেকে ত্রাণ পেয়ে সার্ব্বভৌম সাত্বত চেতনার উদার উন্মুক্তিতে উত্তরণ লাভ করে। এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? হয়তো এ অনুভূতি ক্ষণিক। ক্ষণিক যদি হয়, তারও মূল্য আছে। ঐ সুধাস্বাদের স্মৃতিই তাকে একদিন টেনে তুলবে সব তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে। আর, ক্ষণিকই বা হ'তে যাবে কেন? ঐ প্রেরণা-অনুযায়ী আমরা যদি কাজ ক'রে চলি, তবে সেই দীপশিখা নিরন্তর জ্বলতেই থাকবে আমাদের ভিতর। আর, ঐ করা ও চলার ফাঁকে-ফাঁকে বার-বার তাঁর সান্নিধ্যে এসে, ঐ শিখাকে আরো—আরো প্রদীপ্ত ও প্রোজ্জ্বল ক'রে নিয়ে চ'লবো আমরা।

একটি দাদা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—ছেলেকে মানুষ ক'রতে গেলে বিশেষ করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখবে তার মায়ের উপর নেশা যাতে বাড়ে। মাতৃভক্ত ছেলে সাধারণতঃ ইষ্টপ্রাণ হ'য়ে ওঠে। মায়ের উচিত তাই করা যাতে তোমার উপর ছেলের শ্রদ্ধা বাড়ে। মায়ের উচিত বাপের অসাক্ষাতে ছেলের সামনে বাপের প্রশংসা করা। আবার, বাপের উচিত মায়ের অসাক্ষাতে ছেলের সামনে মায়ের প্রশংসা করা। আর, ছেলেপেলের সামনে নিজেরা কখনও ঝগড়া ক'রতে নেই। ছেলেপেলেদের এটা দেখা চাই যে তোমরা সক্রিয়ভাবে তোমাদের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ইষ্টের প্রতি ভক্তিযুক্ত এবং ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন ও গুরুভাইদের প্রতি প্রীতিপরায়ণ। এই দৃষ্টান্ত যদি দেখাতে পার, তাহ'লে বেশী উপদেশ দেওয়া লাগবে না।

মদনদা (দাস)—নূতন লোকের সঙ্গে কিভাবে যাজন করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা ক'রবে, আলাপ ক'রবে, বন্ধুত্ব ক'রবে, ভাবসাব ক'রে আপন ক'রে নেবে। পরে তার রকম-সকম ও প্রয়োজন বুঝে আপনজনের মতো ব'লবে যাতে তার ভাল হয়। ইষ্টানুগ অকৃত্রিম ভালবাসা এমন জিনিস যে তার স্পর্শে মানুষের rigidity (আড়ষ্টতা) ও resistance (প্রতিরোধ-প্রবণতা)

অনেকখানি শিথিল হ'য়ে পড়ে। আর, ঐ হ'লো মানুষের ভিতরে প্রবেশের পথ।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে মুগাঙ্কদাকে বললেন—ঋত্বিকের দায়িত্ব গভর্ণরের দায়িত্বের চাইতে বেশী। ঋত্বিকরা যদি জাগে, ঋত্বিকরা যদি তাদের করণীয় করে, তাহ'লে দেশ ও দুনিয়ার আর ভাবনা নেই। তবে অনেক ঋত্বিক্ লাগে, আর তাদের চরিত্রও হওয়া চাই দেবতার মতো।

কিরণদা (মুখোপাধ্যায়)—বহু মানুষ দীক্ষারই প্রয়োজন বোধ করে না। তাদের সম্বন্ধে কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ক'রলে ঐ প্রয়োজন-বোধ জাগে, তা' ক'রতে হবে। তার ভিতরে নাড়া দিতে হবে। আগুন লাগলে কাঁচা গাছও ধ'রে যায় আগুনের হাপে। তোমাদের ভিতরেও সেইরকম আগুনের সমাবেশ চাই।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজেদের কয়েকখানা এ্যারোপ্লেন থাকে আর চটাপট চারিদিকে যাওয়া-আসা যায়, তাহ'লে কাজের সুবিধা হয়। আমি ভোলানাথদার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি একটা এ্যারোড্রোমের ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্য।

কাশীভাই (গোস্বামী)—অনুলোম স্ত্রীদের হাতে কী অন্ন খাওয়া যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি আর্য্যদ্বিজ-সমাজভুক্ত (বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর্য্যদ্বিজ ব'লে পরিচিত) কন্যা হয় ও সে সদাচারী হয়, তাহ'লে তার হাতে যা'-যা' খাওয়া চলে, তাই খেতে পারে। যে-পরিবারে যাবে, সে-পরিবারের উন্নত আচার-আচরণও তার রপ্ত করা চাই। তবে পিতৃকার্য্যে, দেবকার্য্যে তার অধিকার নেই। চালচলন-সম্বন্ধে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে fanatic (ধর্ম্মমদির) ও conservative (রক্ষণশীল) থাকা ভাল। সদাচারের কথা যে বললাম, তা' কিন্তু চারটিখানি কথা নয়। ওর মধ্যে অনেক-কিছু পড়ে। সদাচার তিন রকমের—আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক।

করুণাদা (মুখোপাধ্যায়)—শারীরিক সদাচারের কথা তো বুঝি। কিন্তু আধ্যাত্মিক ও মানসিক সদাচার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতায় আছে, 'একভক্তির্বিশিষ্যতে'। ঐ একভক্তিপরায়ণতা অর্থাৎ অকাট্য ইষ্টনিষ্ঠাই আধ্যাত্মিক সদাচার। ওটা যেন কিছুতেই কখনও না ছাড়ে তোমাকে। তোমার প্রতিপদক্ষেপের চলার সঙ্গে লেগে থাকা চাই ওটা। এইভাবে যদি তোমার সত্তার চলমানতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ওটা, তাহ'লে বোঝা যাবে তুমি আধ্যাত্মিক সদাচার অবলম্বন ক'রে চ'লেছ। মানসিক সদাচার হ'লো মনের কুভাবকে ignore (উপেক্ষা) ক'রে বা mould (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে বাঁচা-বাড়ার দিকে অর্থাৎ ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার দিকে চলা। আধ্যাত্মিক সদাচারের ভিত্তির উপরই মানসিক ও শারীরিক সদাচারের ভিত্তি গ'ড়ে তুলতে হয়। আবার, শারীরিক সদাচার না থাকলে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সদাচার পোক্ত

হয় না। তাই আচার-নিয়ম, খাদ্য-খানা ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকতে হয়। যা'-তা' খাওয়া, যার-তার হাতে খাওয়া—এ-সব ভাল নয়। ওতে শরীর-মন নেমে যায়। এ-সব ব্যাপারে মাত্রামতো যুক্তি-বিচার-সমন্বিত গোঁড়ামি ভাল। তোমরা যদি ষোল আনা কর, তোমাদের পরিবেশ দু'পয়সা ক'রবে। তোমাদের এতখানি নিখুঁতভাবে চলা লাগে, করা লাগে, যাতে তা'র fraction (ভগ্নাংশ) ক'রেও সমাজের ক্ষতি না হয়।

অনাথদা (মুখোপাধ্যায়)—কা'রও মা যদি সদাচারী না হন, তাহ'লে তাঁর হাতে সে খেতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর! মা'র বেলায় আবার কথা ?

অনাথদা—বিবাহ ব্যাপারে পাত্র অসগোত্র হবে, এটা বুঝলাম। কিন্তু পদবী যদি এক হয়। ধরুন, পাত্রপাত্রী আলাদা গোত্রের, কিন্তু দু'জনেরই পদবী হয়তো চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চক্রবর্ত্তী কারও আদিম পদবী নয়। ওগুলি পরে পাওয়া পদবী। গোড়ার পদবী হয়তো আলাদা। গোত্র যদি আলাদা হয়, তাহ'লেই হ'লো। অবশ্য শুধু গোত্র দেখলেই হবে না। অন্য যা'-যা' দেখবার তাও দেখতে হবে।

একটি দাদা তাঁর ব্যবসায়ের অসাফল্যের কথা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুঁজে দেখা লাগে কেন পারছো না। আর, সেই ভুলত্রুটিগুলির নিরাকরণ করা লাগে। আমি তো আরোর বুভুক্ষু। তোমরা না-পারা থেকে পারায় দাঁড়ালেই তো আমার সুখ। তাই হতাশ হ'য়ো না। একবার পারলে না ব'লে হাল ছেড়ে দিও না। ঠিকমতো চেষ্টা কর, পারবে। শুধু নিজে দাঁড়ালে হ'বে না, অন্যকেও দাঁড় করান চাই। কেউ যদি অকৃতকার্য্য হয়, তাতে শুধু তার ক্ষতি নয়, তার বংশ ও সমাজেরও ক্ষতি। আবার, কেউ যদি কৃতকার্য্য হয়, তাতে শুধু তার লাভ নয়, তার বংশ ও সমাজেরও লাভ। ব্যবসা কঠিন কিছু নয়। পাঁচ টাকার পুঁজি নিয়ে একটা কেরোসিনের বাক্সে ক'রে পান-বিড়ি নিয়ে ব'সেও কতলোক ফেঁপে ওঠে।

একটি দাদা যাবার আগে প্রণাম ক'রে বললেন—দয়াল! প্রেরণা দেন, যাতে আপনার ইচ্ছা পূরণ ক'রতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর, চল—ঐ করা ও চলাই প্রেরণা জোগাবে।

১৮ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ৪।৯।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বাইরের তাঁবুতে এসে বসেছেন। দিনটা মেঘলা। মাঝে-মাঝে একটু-একটু বৃষ্টি হ'চ্ছে। কয়েকটা গরু, ছাগল অলস মন্থরগতিতে চ'রে

বেড়াচ্ছে বড়ালের মাঠে। অশ্বথের আগডালে ব'সে কী-একটা পাখী থেকে-থেকে 'কুক' 'কুক' ক'রে ডাকছে। মাটি থেকে একটা সোঁদা গন্ধ উঠছে মাঝে-মাঝে। তারই ফাঁকে-ফাঁকে ভেজা ইউকিলিপটাস গাছের সুবাস আসছে ঝির-ঝিরে হাওয়ায় ভেসে। দু'ই-একজন দেহাতী লোক এসেছে তরিতরকারী বিক্রি ক'রতে। কেউ-কেউ জিনিসের দরদস্তুর ক'রছে। একদল ভারী বাঁকে ক'রে টিন-টিন জল ব'য়ে আনছে কুয়ো থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনা হ'য়ে বিছানায় ব'সে তামাক খাচ্ছেন আর চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। কাছে অনেকেই উপস্থিত আছেন। কিন্তু সবাই চুপ-চাপ। বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা নেই। এমন সময় আশ্রমের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী একজনের নাম উল্লেখ ক'রে কয়েকটি বিরূপ মন্তব্য করায় শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথিতকণ্ঠে বললেন—আপনি মানুষকে evil-এর (অসৎ-এর) সাথে identify (একাত্ম) করেন। ওতে আমার shock (আঘাত) লাগে। শয়তান সব শ্রেণীর মধ্যে আছে। কোন শ্রেণীকে generalise (একাকার) করা চলে না। আপনাদের mission (উদ্দেশ্য) যেমন all-embracing (সর্ব্ব-আলিঙ্গনী), আপনাদের মন যদি তেমনি all-embracing (সর্ব্ব-আলিঙ্গনী) না হয়, তাহ'লে বিশেষ কিছু করতে পারবেন না।

দাদাটি লজ্জিত হ'য়ে চুপ ক'রে মাথা নীচু ক'রে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কোমলকণ্ঠে বললেন—আপনারা হ'লেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আপনারা যা' ক'রবেন, আর দশ জন কিন্তু তাই imitate (অনুকরণ) ক'রবে। চালচলন, কথাবার্ত্তায় আপনাদের এমন কোন example (দৃষ্টান্ত) set (স্থাপন) করা ভাল না, যা' imitate (অনুকরণ) ক'রে দশ জনের ক্ষতি হ'তে পারে, সমাজের climate (আবহাওয়া) খারাপ হ'য়ে যেতে পারে। আর, কা'রও প্রতি আপনি মনে-মনে যদি খারাপ ভাব বা হীন ধারণা পোষণ করেন, তা' আপনার ব্যবহারে অভিব্যক্তি লাভ ক'রবেই। আপনি সেই লোকটাকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করা ও win (জয়) করার শক্তি হারিয়ে ফেলবেন। কা'রও প্রতি অশ্রদ্ধা বা অপ্রীতি থাকলে, তার চারিত্রিক পরিবর্ত্তনে কোন সাহায্য করা যায় না। দোষীই যদি কেউ হয়, তাহ'লেও সহানুভূতির সঙ্গে ভেবে দেখতে হয় কেন সে দোষ করে। দোষী যে তারও আদিম সত্তাটা পচা নয়, তা' পরমপিতারই দান। নানা কারণের সমবায়ে আজ একটা মানুষ হয়তো হেজেমজে গেছে। পারেন তো তাকে ধ'রে তোলেন, সুস্থ করেন। ভেবে দেখেন তো ঐ অবস্থায় প'ড়লে কী ব্যবহার চাইতেন আপনি মানুষের কাছে। তখন যদি মানুষ 'হ্যাক থু' ক'রতো আপনাকে তাহ'লে কি আপনার ভাল লাগতো ?

সেই দাদাটি তখনও গভীরভাবে ভাবছেন।

কেষ্টদা বললেন—অসৎ-নিরোধেরও তো প্রয়োজন আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার অসৎ-নিরোধের প্রথম ক্ষেত্র আপনি। আপনি নিজেকে

যদি মোটেই রেহাই না দেন, সর্ব্বদাই যদি নিজেকে সায়েস্তা ক'রে চলেন, তবে তাই দেখে লোকে শিখবে। আর, কঠোর কাউকে কিছু বলতে বা করতে গেলে, তার সঙ্গেও চাই অপরিসীম দরদ ও শ্রদ্ধা। তা' যদি না থাকে, রূঢ় অহঙ্কারে আপনি যদি কারও সত্তাকে অপমান বা আঘাত করেন, তবে তাতে তারও ক্ষতি করা হবে, আপনার নিজেরও ক্ষতি করা হবে। তার সংশোধন হবে না, সে বরং আত্মসমর্থন-তৎপর হবে এবং আপনার শত্রু হ'য়ে থাকবে। সে আপনার কিছু ক'রতে পারুক বা না পারুক, প্রকৃতির খাতায় পাওনা থাকবে আপনার—ঐ অমনতর ব্যবহার পাওয়া। অসৎ-নিরোধ করা খুব ভাল, কিন্তু ঐ অছিলায় নিজের ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, পরপীড়ন-প্রবৃত্তি ইত্যাদির প্রশ্রয় দেওয়া ভাল না। অনেকে আছে নিজে হয়তো অন্যের দ্বারা অত্যাচারিত হ'য়েছে। এখন সে সবল হ'য়েছে। এই সুযোগ সে ছাড়তে চায় না। যাকে-যাকে পারে সে অত্যাচার করে, অপমান করে। আর, লোকের কাছে বলে অসৎ-নিরোধ করছি। প্রবৃত্তির যে কতো রকমফের আছে, তার কী ঠিক আছে? অনেক সময় মানুষ নিজেকে নিজে ধরতে পারে না। অনেকে ধ'রেও আবার ঘাপটি মেরে থাকে। লোক-ঠকানোর জন্য বড়-বড় কথার অবতারণা করে। একজন হয়তো ভীরু, সৎসাহস নেই। সেইজন্য হয়তো অন্যায়ের সমীচীন প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। ঐ দুর্ব্বলতার সমর্থনে সে যদি বড়-বড় নীতির দোহাই পাড়ে, তাহ'লে সেটাও তারপক্ষে ভণ্ডামি।

পাবনা থেকে ডিষ্ট্রিক্ট্ মাইনরিটি প্রটেক্‌সন কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং সেক্রেটারী শ্রীগোকুলকৃষ্ণ সাহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেশে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। সেই সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেশের মাটি যে কী জিনিস, জন্মভূমির যে কী আকর্ষণ, তা' তো আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝি। যাতে কা'রও সে-মাটি ছাড়তে না হয়, সেজন্য তো প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু কেউ তখন বুঝলো না, আমার কথায় কান দিল না, বরং চেষ্টা পণ্ড ক'রে দিল। এখন আমি আর কী ক'রতে পারি?

১৯শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ৫।৯।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর মাঠের মধ্যে তাঁবুর নীচে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), ভোলানাথদা (সরকার), প্রমথদা (দে), চুনীদা (রায়চৌধুরী), গোপেনদা (রায়), আদিনাথদা (মজুমদার), যতীনদা (দাস), কালিদাসদা (মজুমদার), মহিমদা (দে), পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য), বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়), হরিপদদা (সাহা) প্রমুখ কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার এইটে যতো চারাবে, war (যুদ্ধ)

ততো stopped (বন্ধ) হবে, enterprise of becoming (বিবর্দ্ধনের অভিযান) হবে।

কেষ্টদা—গীতায় আছে, 'যা জানলে অন্য কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না………… ইত্যাদি'। অন্য কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না, এই কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই তো! সত্তাকে জানলে কিছুই জানার বাকী থাকে না, সব জানা হ'য়ে যায়।

কেষ্টদা—জানার শেষ আবার কখন হয়—যেখানে জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(উদাত্তকণ্ঠে)—

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।'

সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ হাতে এসে যায়। জানার ব্যাকুলতাটা satisfied (তৃপ্ত) হ'য়ে যায়। ক্ষুধাও থাকে না, অক্ষুধাও থাকে না। ইষ্টার্থে যখন যেদিকে যেমন প্রয়োজন, তখন সে-দিকে তেমনি attention (মনোযোগ) দেয়। আর, তা' বোধের মধ্যে আনতে তার কষ্ট হয় না।

কেষ্টদা—জানার ক্ষুধা না-থাকাটা কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Out of passion (প্রবৃত্তির থেকে) অজ্ঞানের জ্ঞানস্পৃহা একরকম আছে, আর আছে "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ"। এককে নিয়েই সে ডুবে থাকে। আমি জানি তাও মনে হয় না, জানি না যে তাও মনে হয় না। বেকুব মতো হয় নাকি কি জানি? আমার মতো হ'লে ঐরকম হয়। কী যে জানি তাই জানি না।

'অনেক উদ্ভট্টি রকম হয়'—ব'লে চ'ললেন ঠাকুর—'রাজা জনকের গল্প আছে। বিরাট রাজপুরি। অঢেল ঐশ্বর্য্য। রাজপুরিতে আগুন ধ'রেছে। লোকে হন্ত-দন্ত হ'য়ে এসে খবর দেয়—আপনার সব পুড়ে গেল। রাজর্ষি নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দেন—"মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে নশ্যতি কিঞ্চন"। ঐরকম হয়। আমার জীবন দিয়ে দেখেছি। আশ্রমে সব ফেলে চ'লে আসলাম, আমার কিছু মনে হয় না। লোকে বলে এত loss (ক্ষতি), কিন্তু তাতে আমার গায় লাগে না। তবে মানুষ আমার কাছে বড় মূল্যবান। মানুষের জন্য বড় মমত্ব। ওতেই আমি কাবু! মানুষের জন্য বড় বেশী লাগে। মানুষের সত্তার কোন ক্ষতি হ'চ্ছে, সে কষ্ট আমি সইতে পারি না। জিনিসপত্র, জমি-জমা নষ্ট হ'চ্ছে, চুরি হ'চ্ছে, তাতে লাগে না। যখন পাবনায় ছিলাম, তখন মনে হ'তো, এ-ছেড়ে কোথাও এক পা যাব না। কিন্তু এখন যে ফেলে এসেছি, দেশের কথা মনে হ'লেও বৈষয়িক ক্ষতির কথা মনে হয় না।

বড়াল-বাংলোর একটা ড্রেন ময়লা হ'য়ে থাকে। মাঝে-মাঝে সেখান থেকে দুর্গন্ধ আসে। কিন্তু কেউ দায়িত্ব নিয়ে তা' সাফ করাবার ব্যবস্থা করে না।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাবছিলাম কোদাল আর ঝুড়ি যদি পেতাম, ২।৩ দিন অন্তর-অন্তর নিজে ড্রেনটা সাফ ক'রতাম। কিন্তু শরীরেও কুলোয় না।

সুশীলদা বললেন—আপনি ভাববেন না। এখন থেকে এর ব্যবস্থা আমিই ক'রবো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চ্যাংড়ারা থাকতে আপনার করা লাগবে কেন? আর, আপনিও তো সব সময় এখানে থাকেন না।

সুশীলদা—আমার নিজের ক'রতে হবে না। মেথর দিয়েই করাব। আর, আমি যদি এখানে না থাকি, ব্যবস্থা ক'রে যাব।

গোপেনদা—আমিও এদিকে লক্ষ্য রাখবো।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বর্ণাশ্রম unemployment-এর (বেকার অবস্থার) যম। কিরকম scientifically (বৈজ্ঞানিকভাবে) adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রেছিল! অসম্ভব কাণ্ড! আপদকাল ছাড়া বৃত্তিহরণ মহাপাপ ছিল।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—মনুতে আছে আপদকালেও লোভবশতঃ যদি কেউ উচ্চবর্ণের কর্ম্ম ক'রে, তাতে দোষ হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোভ জিনিসটাই বিশ্রী। ওতে মানুষকে খতম ক'রে দেয়। আমি দেখেছি, যারা আমার কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেওয়ার লোভ করে, তারাই ঠ'কে যায়। যারা কেবলই নিতে থাকে, তাদের একটা গিঁট প'ড়ে যায়। নিজেরা আর উঠতে পারে না। যারা শুধু দেয়, তারা ঠেলে ওঠে—দেওয়ার urge-ই (আকুতিই) ক্যাল-ক্যাল ক'রে বাড়িয়ে দেয় তাদের। শ্রেয়কে দেওয়ার বুদ্ধি ও অভ্যাস থাকলে, তাই-ই মানুষকে যোগ্য ক'রে তোলে। স্বপ্ন দেখেছিলাম—ইষ্টভৃতি হ'লো সামর্থ্যী-যোগ—psycho-physical devotion (মানস ও শারীর ভক্তি)।

দৈনন্দিন জীবনে সত্তাপোষণী সদভ্যাস গঠনের সুফল সম্বন্ধে উইলিয়াম জেমস্ যে-কথা বলেছেন—ভেবে দেখেন তা' কতখানি সত্যি। বার্ম্মায় যুদ্ধ হ'লো, কলকাতায়, নোয়াখালিতে এত দাঙ্গা হ'লো—ইষ্টভৃতিওয়ালারা এর মধ্যে কিন্তু কমই suffer করেছে (দুর্ভোগ ভুগেছে)। অর্থ মানুষের কাছে এতখানি প্রিয়, তার কারণ তা' দিয়ে একদিকে যেমন হয় জীবনধারণ, অন্যদিকে তেমনি হয় প্রবৃত্তি-তোষণ। সেই প্রিয় বস্তু কিংবা তার বিনিময়ে প্রাপ্ত কোন কিছু নিত্য ইষ্টার্থে উৎসর্গ করা মানে ইষ্টকে নিজ জীবনে সব চাইতে প্রিয় ক'রে তোলার প্রয়াস নিয়ে চলা। নিষ্ঠাসহকারে কেউ যদি এটা করে, তার একটা অকাট্য ফল ফলে তার শরীর ও মনের উপর। বিপদের সময় সেটা বিশেষ ক'রে ধরা পড়ে।

কেষ্টদা—গত বৎসর ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় যে-ব্যাপার ঘটে গেল, সে-সময় বহু সৎসঙ্গী miraculously (অলৌকিকভাবে) saved হ'য়ে (রক্ষা পেয়ে) গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে যেন তখন ঐভাবে রক্ষা পেয়ে ১০০ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল।

মদনদা (দাস)—স্বস্ত্যয়নী-ইষ্টভৃতি ছেড়ে দিলে পাহাড় থেকে ফেলে দেবার মতো অবস্থা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তখন প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী intellectual obsession (বুদ্ধিগত অভিভূতি) হয়। Brain (মস্তিষ্ক) ঐভাবে obsessed (অভিভূত) হ'লেই danger (বিপদ) আসার সম্ভাবনা। যখনই দেখবে ইষ্টের ধান্ধা মাথা থেকে স'রে যাচ্ছে, অন্য ধান্ধা প্রবল হ'য়ে উঠছে আর তাতে মত্ত হ'য়ে ইষ্টের জন্য করাটা বাদ প'ড়ে যাচ্ছে, তখনই ধ'রে নিও, তুমি দুষ্টগ্রহের পাল্লায় প'ড়ে গেছ। ঐ অবস্থায় জোর ক'রে নিজেকে ইষ্টার্থী চলনে ও করণে ব্যাপৃত ক'রতে হয়। তাতে দুর্ভোগ অনেক কমে। আমি অনেক সময় মানুষকে খামাকা এক-একটা কাজের কথা বলি। যখন যাকে যেটা ক'রতে বলি, সব অসুবিধা সত্ত্বেও সে যদি তাই নিয়ে উঠে-প'ড়ে লাগে, তাই নিয়েই যদি সব সময় দেহ-মনে ব্যস্ত থাকে, তবে অনেক কাটান পেয়ে যেতে পারে। আর, যারা স্বতঃই ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় উদ্দাম হ'য়ে চলে—সক্রিয় তৎপরতায়,—লাখো কর্ম্মবিপাক যে তাদের কেমনভাবে উলটে-পালটে যায়, তা' তারা ঠাওরই পায় না। ঝড়ঝাপ্টা যে না আসে তা' নয়, কিন্তু তা' তাদের কাবু ক'রতে পারে কমই। কারণ, তাদের মন থাকে ইষ্টে, আর বিপদকালে তাই-ই তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হ'য়ে দাঁড়ায়।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—এ-সব কথা জানা-বোঝা সত্ত্বেও যে আমাদের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাইহোক—ইষ্টসেবা থেকে বিরত হ'তে নেই কোনকালে। আর, ইষ্টসেবা ক'রতে গেলেই পরিবেশের সেবা ক'রতে হয়—ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় নজর রেখে। নিজের স্বার্থ বড় ক'রে দেখতে গেলেই নিজের স্বার্থ খোয়ান হয়—এই হ'লো বিধির বিধান। এই সত্য যে না-জেনেছে, সে হ'লো বেকুব-বর্ব্বর। মানুষের মগজে এটা ভাল ক'রে ঢুকিয়ে দেওয়া চাই এবং তা' এমন গভীরভাবে যাতে সে কিছুতেই তা' না ভোলে। বহুদিন ধ'রে যদি মানুষ লাগা-জোড়াভাবে ইষ্ট-প্রধান চলনে না চলে, তাহ'লে কিন্তু এই বোধ মাথায় ধ'রে রাখতে পারে না।

—এটা কী মাস?—হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

কেষ্টদা—ভাদ্রমাস।

—আর কতোদিন বাকী আছে মাস শেষ হ'তে?

—আরো ১০/১২ দিন।

—ভাদ্রমাস গেলে বৃষ্টি চ'লে যাবে। তাই না?

—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে বর্ষাকাল ভাল লাগতো, এখন লাগে না।

এখন বরং গরমকাল ভাল লাগে। গরমের আগেরটা কী তো? যখন গরমও থাকে না, শীতও থাকে না।

কালীষষ্ঠীমা—সে তো বসন্তকাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ বসন্তকালও ভাল লাগে।

সত্য দে নামক একজন নবাগত যুবক জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কুলীন মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুল আছে যার—কুলে যার অপবিত্রতা ঢোকেনি।

সত্য—সদ্‌গুরু কি একই সময়ে বহু থাকতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের মধ্যেও স্তরভেদ আছে। World-teacher (জগদ্‌-গুরু), divine teacher (ভাগবত-গুরু), divine man (ভাগবত পুরুষ) অর্থাৎ পুরুষোত্তম বা অবতার-মহাপুরুষ যিনি, তিনি এককই থাকেন। তবে তাঁর জীবদ্দশায় realised man (সিদ্ধপুরুষ) আরো অনেকে থাকতে পারেন। যে-কোন realised man (সিদ্ধপুরুষ)-ই গুরু হ'তে পারেন। তবে যিনি যে-গুরুর আশ্রিত হ'য়েই সিদ্ধ হউন না কেন, তিনি প্রকৃত সিদ্ধ কিনা তার পরখ হ'চ্ছে—তিনি ঐ যুগপুরুষোত্তমে সশ্রদ্ধ নতিপরায়ণ কিনা। তাঁর দীক্ষায় দীক্ষিত না হ'লেও, তাঁর গুরুত্ব-সম্বন্ধে তাঁর সোচ্চার স্বীকৃতি থাকবেই। এইটে যদি ঠিক থাকে, তবে প্রত্যেকে তার গুরুনিষ্ঠা বজায় রেখেও পরমগুরু যিনি তাঁর সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে চলতে পারবে। এতে প্রত্যেকেরই মঙ্গল এবং integration (সংহতি)-ও স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। Realised man (সিদ্ধ-পুরুষ) যাঁরা, তাঁরা বিভিন্নপন্থী হ'লেও তাঁদের মধ্যেও পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্য ও স্বীকৃতি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সিদ্ধপুরুষ ব'লে পরিচিত কোন ব্যক্তি যদি অন্য সিদ্ধপুরুষ বা যুগপুরুষোত্তমকে নিন্দা করেন, তবে বুঝতে হবে তাঁর মধ্যে খাঁকতি আছে। মনুষ্যত্বের পর্য্যায়ে যারা দাঁড়ায়, তাদের বুদ্ধিই হয় আদর্শকে বা নীতিকে অবনমিত না ক'রে—প্রত্যেককে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে চলা। অপরকে বড় ক'রেই তারা সুখ পায়।

সত্য—যুগপুরুষোত্তম তাহ'লে তৎকালীন সব গুরুরই গুরু!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইটে হ'লো প্রাকৃতিক সত্য। তবে তাঁর কোন গুরুত্বের ego (অহং) থাকে না। যে বোঝে সে মানে। যে বোঝে না, সে মানে না। কিন্তু এই মানা না-মানায় তাঁর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যারা মানে তারাই উপকৃত হয়। সূর্য্য যেমন ভালমন্দ-নির্ব্বিশেষে সকলের উপরই সমভাবে কিরণ বর্ষণ করে, তিনিও তেমনি নির্ব্বিচারে সকলের মঙ্গল ক'রে যান। তাঁর দেওয়া মঙ্গল গ্রহণ ক'রতে গেলেই চাই তাঁর প্রতি উন্মুখ হওয়া—তাঁকে ভালবাসা—তাঁর প্রদর্শিত পথে চলা। নইলে তিনি আমাদের মঙ্গলের অধিকারী ক'রে তুলতে চাইলেও আমাদের co-operation (সহযোগিতা) ছাড়া তা' তিনি পারেন না। পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে যদি যাও, তাহ'লে দেখতে পাবে জগন্নাথের হাত নেই।

জগন্নাথ জনে-জনে হাত বিলিয়ে নিজে হাতহীন হ'য়ে ব'সে আছেন। আমাদের উপর তাঁর কোন হাত নেই। কিন্তু যেই আমরা তাঁকে আমাদের হাত দু'খানি দিয়ে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধ'রবো, অমনি আমরা তাঁর হাতে চ'লে যাব। তখন তাঁর ইচ্ছায় আমরা চালিত ক'রবো নিজেদের। এমনি ক'রেই আমরা সেই মঙ্গলের অধিকারী হবো—যে-মঙ্গল তিনি আমাদের দিতে চান।

সত্য—অনেক গুরু আছেন, তাঁরা দেখেশুনে যোগ্য বিবেচনা ক'রলে তবেই দীক্ষা দেন, যাকে-তাকে দীক্ষা দেন না। শুনেছি কাঠিয়াবাবা মাত্র চারজনকে শিষ্য ক'রেছিলেন। এ-সম্বন্ধে আপনার কী মত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাঠিয়াবাবা যা' সমীচীন মনে ক'রেছেন, তাই করেছেন। তাঁর পক্ষে হয়তো ঐ-ই ঠিক। তবে world-teacher (জগদ্‌গুরু) যাঁরা তাঁরা অমন করেন না। তাঁরা চান বিপুলভাবে লোকসংগ্রহ ক'রে সমাজের গ্লানি, কৃষ্টির গ্লানি দূর ক'রতে, সত্তার প্রতিষ্ঠা ক'রতে। Gross nature (স্থূল স্বভাব) যাদের, দীক্ষা নিয়ে হঠাৎ যে তাদের খুব একটা পরিবর্ত্তন হয়, তা' হয়তো হয় না। কিন্তু মানুষগুলিকে একটা মহৎ অনুশীলনের মধ্যে ফেলতে পারলে ধীরে-ধীরে তার ফল ফলেই। এর ভিতর-দিয়ে আস্তে-আস্তে দেশে একটা উন্নত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, যদি কিনা ঋত্বিক্‌রা উঁচুদরের চলন-চরিত্র, অভ্যাস-ব্যবহার ও বোধের অধিকারী হয় এবং মানুষের পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। সকলে না হ'লেও কতকগুলি মানুষ এমন থাকা চাই, যাদের করা, বলা ও ভাবার মধ্যে যথাসম্ভব সঙ্গতি থাকবে। তারা যা' যাজন ক'রবে, বাস্তবে ক'রবেও তাই, ভাববেও তাই। এক-কথায় ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা ছাড়া ও ইষ্টার্থী লোকমঙ্গল ছাড়া অন্য কোন ধান্ধা তাদের কখনও পেয়ে ব'সবে না। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজন-সিদ্ধিকেও তারা ঐ চলনের অনুগত ক'রে তুলবে। এমনি কতকগুলি মানুষ সমাজের বুকে চ'লে বেড়ালে তাতে মানুষের চরিত্রও যেমন প্রভাবিত হবে, আবার ইষ্টানুগ সেবা, সৌহার্দ্দ্য ও পারস্পরিকতাও বৃদ্ধি পাবে।

প্রাদেশিকতা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Foolish experiment of provincialism (প্রাদেশিকতার বেকুবী পরীক্ষা) ক'রতে গেলে সব finished (শেষ) হ'য়ে যাবে। প্রত্যেক province (প্রদেশ)-এর লোক যদি অন্য province (প্রদেশ)-এর লোক খেদাতে লেগে যায়, তবে হিন্দুস্থান টেকে কোথায় ? বরং হিন্দুর জন্য হিন্দুর এতখানি দরদ ও দায়িত্ববোধ গজিয়ে তোলা ভাল, যাতে এক প্রদেশের লোক অপর প্রদেশের লোককে আপন ভাই ব'লে গ্রহণ করতে পারে। হিন্দু যদি হিন্দুকে ভালবাসতে শেখে, তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোককেও ভালবাসতে শিখবে। Charity begings at home (বদান্যতা বাড়ী থেকেই সুরু হয়)। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল করার চেষ্টা না ক'রে বিভেদ সৃষ্টি

করার চেষ্টা ক'রলে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই বিপন্ন হবে। আমি বলি, প্রত্যেক প্রদেশ প্রত্যেক প্রদেশের জন্য হো'ক, প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের জন্য হো'ক, তাতে সবাই লাভবান হবে। মানুষ বাদ দিয়ে মানুষের কিছুতেই চলে না। আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি যত চারাবে, ততই মানুষ মানুষের বান্ধব হবে। মানুষ অন্যের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের সামিল ক'রে দেখতে অভ্যস্ত হবে। এইটে না হ'লে বুঝতে হবে যে, ধর্ম্ম জাগেনি। ধর্ম্মের অভ্যুদয় হ'লে, তার সঙ্গে-সঙ্গে সবই গজিয়ে উঠবে। সেইজন্য ধর্ম্মকে চারাতে হয় খুব ক'রে, দীক্ষা খুব দিতে হয়। আমি বলি—এইটে ক'রে মানুষকে শান্তি দাও। মানুষ বুঝুক যে, এটা কী জিনিস—কিসে শান্তি। বেকুবের মতো আমরা কে যে কী করি, তা' ঠিক পাই না।

আর একটা কথা। প্রত্যেক প্রদেশের তার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের terrorising emergency (ভীতিপ্রদ দুর্নিবার প্রয়োজন)-এর জন্য সব সময় প্রস্তুত হ'য়ে থাকা চাই with all resources and men (সমস্ত সম্পদ্ এবং মানুষসহ)। তখন ভীষণ জোর দাঁড়ায়। বিপদ কাউকে বিধ্বস্ত ক'রতে পারে না। পারস্পরিকতাকে যত বিদায় দেওয়া হবে, ততো সর্ব্বনাশকে invite (আমন্ত্রণ) করা হবে। ভগবানের উপর মানুষের ভালবাসা যতখানি কমে, সর্ব্বনাশের উপর তার ভালবাসা ততোখানি বাড়ে। তাই, জাতির মঙ্গল ক'রতে গেলে জাতির মধ্যে ভগবৎ-প্রীতির জোয়ার যাতে আসে, তাই করা লাগে।

রাত বেড়ে চ'ললো। এইবার ধীরে-ধীরে অনেকেই বিদায় নিলেন।

২১শে ভাদ্র, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ৭।৯।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর (দেওঘর) গোল তাঁবুতে এসে ব'সেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), প্রমথদা (দে), শরৎদা (হালদার), যোগেনদা (হালদার), হরেনদা (বসু), গোপেনদা (রায়), বিমলদা (মুখোপাধ্যায়), রাজেনদা (মজুমদার), যতীনদা (দাস), কালিদাসদা (মজুমদার), চট্টগ্রামের ইন্দুদা (দাশগুপ্ত) প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে কয়েকটি বাণী দিয়েছেন। প্রফুল্লকে সেগুলি প'ড়ে শোনাতে বললেন। বাণীগুলি পড়া হ'চ্ছে এবং সেই সম্পর্কে আলোচনা হ'চ্ছে।

এরপর গল্পচ্ছলে আজমীর-শরিফের দেড়শমণী ড্যাগ-সম্বন্ধে কথা উঠলো। সুশীলদা রাজপুতনার আরো বিভিন্ন স্থান-সম্বন্ধে গল্প ব'লতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং উপস্থিত সকলে মনোযোগ-সহকারে শুনছেন। এর মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ হাসিমুখে বললেন—কিশোরী এবং মহারাজের মতো দু'জন গানেওয়ালা পাওয়া যেত, তাহ'লে ২৪ ঘণ্টা গানে মাতাল ক'রে রাখত। সুশীলদা ইচ্ছা ক'রলে জোগাড় ক'রতে পারে। দু'জন গানেওয়ালা চাই।

তাদের একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান। দু'টি কোহিনুরের মতন। ঈশ্বর-রসের মৌতাত ধরাতে পারলে সব মানুষ ঠিক হ'য়ে যাবে। হিন্দু-মুসলমান সব এসে এক আস্তায় জড় হবে—স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে।

ইচ্ছা করে স্পেশাল ট্রেনে ক'রে মানুষ, গরু, চৌকী নিয়ে আনন্দ ক'রতে-ক'রতে দেশে ফিরে যাই। পরমপিতার দয়ায় সে-সুযোগ যদি জোটে, যাবার সময় গাড়ীর মধ্যেই গান লাগায়ে দেব, গাইতে-গাইতে যাব। আবার, ওখানে যেয়ে এক গাছতলায় ত্রিপল টানায়ে তারপর খঞ্জনী নিয়ে খচাখচ বাজনা আর তার সঙ্গে গান লাগায়ে দেব নে। কত সময় কত কল্পনা আসে, তার কি কোন মাথামুণ্ডু আছে?—ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর বালকের মতো হাসতে লাগলেন।

একটুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর করুণ কণ্ঠে বললেন—আম্বাসুদ্দীন না কে যেন আশ্রমে গান ক'রেছিল—'জীবের বুকে দিস্‌নে ব্যথা, লাগবে ব্যথা কাবার বুকে'। গানটা বড় ভাল লেগেছিল। আর, কথাটাও সত্য। ব্যথা পেলে মানুষের হৃৎপিণ্ড যেমন দ্রুততালে দপ্‌দপ্‌ করে—জীবের ব্যথার কথা স্মরণ ক'রে তেমনতর দপ্‌দপানিই যেন সব সময় লেগে থাকে পরমপিতার বুকে।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ ক'রে রইলেন।

খানিকটা দূরে আবদুল হাই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার হাই বড় ভালমানুষ। ও যদি আর একটু commanding ও majestic (পৌরুষবান ও মহিমাদীপ্ত) হ'তো! মানুষ ভাল হ'লেও commanding ও majestic (পৌরুষবান ও মহিমাদীপ্ত) না হ'লে কাজ হয় না।

কাজল ভাইকে দেখে বললেন—কাজলা যদি এখন ২০।২৫ বছরের হ'তো!

যোগেন মিশ্র নামক একটি দাদা কতকগুলি ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বললেন। বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে তিনি কেমন ক'রে ইষ্টকে নিয়ে চ'লবেন এবং নিজের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার কিভাবে ক'রবেন সেই হ'লো তাঁর প্রশ্ন। অনেক সেবা দিয়েও তিনি লোকের হৃদয় জয় ক'রতে পারছেন না, তাই তিনি ভাবিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পারিপার্শ্বিকের দ্বারা diluted হ'লে (গুলিয়ে গেলে) চ'লবে না। যাদের জন্য তুমি ক'রছ, তারা যদি তোমাতে adhered (অনুরক্ত) না হয়, তাহ'লে কী হ'লো? সেটা আবার নির্ভর ক'রবে—তুমি তোমার ইষ্টের উপর অকাট্য নিষ্ঠার অধিকারী হ'য়ে তাদেরও কতখানি ঐ অমনতর নিষ্ঠাসম্পন্ন ক'রে তুলতে পেরেছ—তার উপর। মানুষের যদি উন্নতি চাও, আগে তোমাকে উন্নত হ'তে হবে। উন্নত হওয়া মানে ঊর্ধ্বে, উৎকৃষ্টে বা শ্রেয়ে সক্রিয় নতিসম্পন্ন হওয়া। তুমি বামুনের বাচ্চা, ঋত্বিক্, তোমার যেমনভাবে দাঁড়ান দরকার, সেইভাবে দাঁড়াতে হবে। বামুনের বাচ্চার ব্যাঙ্ক হ'লো people (জনগণ)। নিজেকে হারিয়ে people-এর (জনগণের) পাছে-পাছে ছোট, অথচ people

(জনগণ) তোমার পিছনে ছোটে না, সে কেমন সেবা? তুমি ইষ্টকে অটুট হ'য়ে অনুসরণ কর এবং ইষ্টার্থে লোকসেবা কর। তাহ'লে নিজেকেও হারাবে না, লোককেও হারাবে না। সবাইকে পাবে, সবই পাবে। তোমার ভিতর যে spirit (ভাব) work (ক্রিয়া) ক'রবে, তোমার সান্নিধ্যে এসে লোকেও তাই পাবে তোমার কাছ থেকে। নিজে diluted হ'য়ে (গুলিয়ে) গেলে, অন্যেও আমাদের কাছে এসে integrated (সংহত) হবার nurture (পোষণ) পায় না। তোমার মাথার থেকে যদি ঠাকুর স'রে যান, সেবার নামে তুমি যদি লোকের খেয়াল তামিল ক'রতে লেগে যাও, তাহ'লে তোমার কাছ থেকে মানুষ ঠাকুর পাবে কী করে?

শচীনদা (গঙ্গোপাধ্যায়)—কোন ক্রিয়াকর্ম্মের সময় আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে গেলে, তাঁরা চান যে সেখানে খাওয়া-দাওয়া করি। কিন্তু ঐ সময় ওসব জায়গায় খেতে গেলে সদাচার অব্যাহত থাকে না। তাই এড়িয়ে যেতে বাধ্য হই। এতে অনেকে ক্ষুণ্ণ হন। এই অবস্থায় কী করা সমীচীন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝিয়ে ব'লতে হয়। ক্ষুণ্ণ হবে কেন? ওতে বরং regard (শ্রদ্ধা) বাড়ে। সুশীলদার কাছে শোনেন না কেন? সুশীলদা মাদ্রাজে গিয়েছিল, স্বপাক খেত, তাই গোঁড়া ব্রাহ্মণরা পর্য্যন্ত কতো খাতির ক'রতো।

২৩শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ৯।৯।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর (দেওঘর) গোল-তাঁবুতে তক্তপোষের উপর পাতা বিছানায় উপবিষ্ট। কাছে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), বীরেনদা (পাণ্ডা), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), প্রমথদা (দে), যতীনদা (দাস), যোগেনদা (হালদার), হরেনদা (বসু), অমূল্যদা (ঘোষ) প্রমুখ। দিনটা মেঘলা। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরও আজ খুব ভাল নেই। পেটে অস্বস্তি বোধ ক'রছেন। তাই প্যারীদা একটা ওষুধ খাইয়ে দিয়ে গেলেন।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)-সম্বন্ধে কথা উঠলো। সুশীলদা ঐ প্রসঙ্গে বললেন—তাঁর প্রকৃতি এমন ছিল যে to meet him is to be his friend (তাঁকে দেখা মানেই তাঁর বন্ধু হওয়া)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটি বড়লোকই ঐরকম। অতোখানি forward (অগ্রগামী) অথবা অতোখানি untussling (নির্ব্বিরোধ)………ঐ-সব লোক বেঁচে থাকলে আজ দেশের অবস্থা অন্য রকম দাঁড়াত।

সুশীলদা—এইসব বীর দেশপ্রেমিক দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়ায় দেশের মধ্যে একটা নূতন চেতনা জেগেছে। তার মূল্যও নিতান্ত কম নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মরণকে মেনে নেওয়ার থেকেও বড় বীরত্ব হ'লো cause-কে (উদ্দেশ্যকে) জয়যুক্ত করার জন্য বেঁচে থেকে নিজেকে নিঃশেষে ঐ-কাজে বিলিয়ে দেওয়া। আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বালাই না রেখে তিল-তিল ক'রে আত্মদান ক'রে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা।

মরণরঙে রঙ্গীন হওয়া
নয়তো বীরের কাজ,
ঋদ্ধিপালী গণসেবা
সেই তো বীরের সাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—ছড়াটি লিখলি নাকি ?

প্রফুল্ল—হ্যাঁ।

ছড়াটা প'ড়ে শোনানো হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঠিক আছে তো ?

কেষ্টদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যতীন মুখার্জ্জীর কথা যা' শুনেছি, তাতে আমার খুব শ্রদ্ধা হয়। ঐ মেকদারের লোক আজকাল পাওয়া কঠিন। আজকাল অনেককেই দেখি—দেশসেবার নামে নিজেদের ambition (গর্দ্ধেপ্সা) চরিতার্থ ক'রতে চায়। এইসব মেকী লোক দিয়ে কোন বড় কাজ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—Theory and practice (তত্ত্ব ও অনুশীলন) একসঙ্গে মিশিয়ে অনুস্মৃতিখানা সর্ব্বসাধারণের জন্য নূতন ক'রে করতে হয়, যাতে লোকে বুঝতে পারে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী-কী করণীয় এবং তা' কেন ক'রতে হবে। দরকার হ'লে আমার কাছে ব'সে ঠিক ক'রে নেবেন।

সুশীলদা সম্প্রতি কবীর-সাহেবের একখানি নূতন জীবনী প'ড়েছেন, সেই কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বইখানি কেমন হ'য়েছে ?

সুশীলদা—এমনি বইখানি ভাল। তবে তাঁর জীবনের বিকাশের মূল প্রেরণা কোথায়, তা উদ্ঘাটন করা হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগের কালে জীবনীগুলিতে glowing point-এর (দীপন-কেন্দ্রের) উল্লেখ থাকতো, ইদানীং সে-রেওয়াজ প্রায় উঠে গেছে।

কেষ্টদাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, ইউসুফ আলির কোরাণের translation (অনুবাদ)-সম্বন্ধে আপনার কাছে যা' শুনেছি, তাতে মনে হয় জিনিসটা ভাল হ'য়েছে।

সমাধি-সম্পর্কে কথা উঠতে কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমি একদিন দেখলাম, পালদার বাড়ীতে গান শুনেই আপনার সমাধি হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন সমাধির রকম হ'লে আমি resist (নিরোধ) ক'রতাম।

যাতে ঐরকম না হয়, সেই চেষ্টা ক'রতাম।

ওহি (শব্দ শ্রবণ)-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাই শোনা যায়, স্পষ্ট কথা। কী কাণ্ড! আমি ও মা তখন বাড়ীতে কাঠের ঘরের দোতলায় থাকতাম। প্রথম এক ভীষণ আলো দেখলাম। এমন dazzling (চোখ ধাঁধান) আলো যে তা' দেখে ব'সে-থাকা মানুষ লাফায়ে উঠলাম। কি না কি ব্যাপার! গাঁয় হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। তখন থেকে স্বর হ'লো। তখন ভজন পাইনি। কিন্তু নাম যেন আমাকে ঠেসে ধ'রতো। না ক'রে উপায় ছিল না। স্কুলে যাবার সময় পথে ঐরকম হ'তো। হঠাৎ ভীষণ আলো ও শব্দে অনেকবার ঝম ক'রে কাদায় প'ড়ে গিয়েছি। নাম ক'রতাম অসম্ভব। মনে হ'তো, গেলাম—গেছি। মাঝে-মাঝে কাঠ মেরে যেতাম, যেন নিথর অবস্থা। হয়তো একটানা ছয়মাস এই অবস্থায় চ'লছে। তবু দাঁড় টেনে যাচ্ছি, ছাড়া নেই, ক'রে যেতাম। তখন মনে হ'তো যেন vitality (জীবনীশক্তি) shattered (বিধ্বস্ত) হ'য়ে যাচ্ছে, shrink ক'রে (সঙ্কুচিত হ'য়ে) যাচ্ছে, কোথা থেকে যেন একটা অবশ করা cold blast (প্রবল ঠাণ্ডা প্রবাহ) আসছে। আবার তারপর irresistible (অদম্য) স্ফূর্ত্তি আসতো। মনে হ'তো, আর একচুল স্ফূর্ত্তি বাড়লে যেন cell-গুলি (কোষগুলি) burst ক'রে (ফেটে) যাবে। মদ-আফিংয়ের নেশা মানুষ ছাড়তে পারে না, আর এ-যে কী নেশা! এ-নেশা যাকে একবার ধ'রেছে, তার আর রেহাই নেই। মানুষ ভাল ক'রে করে না। যারা এতটুকু ক'রেছে তারা জানে এর মর্ম্ম। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।'............আমি যদি আদৌ কোনদিন মাছ না খেতাম, তাহ'লে আরো হ'তো। শরীরেরও আজ এই অবস্থা হ'তো না। যখনই সেকালে একদিন মাছ খেয়েছি, তখনই দেখতাম ১২।১৪ দিন fine sensation-গুলি (সূক্ষ্ম অনুভবগুলি) আসতো না। কেটে-কেটে যেত। মাছ খেয়ে দোয়াড়ে নাম ক'রে দেখেছি, আবার মাছ না-খেয়েও নাম ক'রে দেখেছি, দু'টোর মধ্যে পার্থক্য যে কতখানি তা' আমি বুঝতে পেরেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আপনাদের রকম বেশ ভাল, কিন্তু দোষ এই যে মাঝে-মাঝে তাল কেটে যায়। মাছ-মাংস খেলে এই ধরণটা aggravated (বর্দ্ধিত) হয়। এতদিন যে নিরামিষ খাচ্ছেন, তবু আগে মাছ-মাংস খেয়েছেন ব'লে তার effect (ফল) এখনও চ'লছে। ওতে whole nervous system (সমগ্র স্নায়বিক বিধান) damaged (ক্ষতিগ্রস্ত) হ'য়ে যায়, eye-sight (দৃষ্টিশক্তি)-ও খারাপ হয়। আমার মনে হয়, মাছ না খেলে আমার চালসেও ধ'রতো না। আমি যেগুলি আপনাদের দিচ্ছি, সেগুলি বুঝে সেইমতো যদি চলেন তাহ'লে দেখবেন বেকুব বোধ, বেকুব চলন ও বিরুদ্ধশক্তি আপনাদের বিধ্বস্ত ক'রতে এসে হতাশ হ'য়ে যাবে।

যতীনদা—শুনেছি রামকৃষ্ণদেব মায়ের প্রসাদ হিসাবে আমিষ আহার গ্রহণ করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি যা' ক'রতেন, তা' কাঁটায়-কাঁটায় ক'রতেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল—নিখুঁতভাবে ক'রে দেখা কিসে কী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাশ ফিরে ব'সে এইবার গড়গড়ার নলটি হাতে নিলেন, বাইরে তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি সুরু হ'য়েছে। কেউ-কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললেন—তোরা ভিতরে চ'লে আয়, ভিতরে চ'লে আয়, বৃষ্টিতে ভিজিস না।

সবাই ভিতরে আসলেন। তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর বুকে হাত দিয়ে বললেন—Realisation-এর (অনুভূতির) কথা হচ্ছিল, তাই বুকের মধ্যে কেমন যেন থগবগ ক'রছে। অনুভূতিগুলি সম্বন্ধে তখন যদি না লিখতাম, এখন এ-শরীরে আর লিখতে পারতাম না। এখন অতোখানি emotional excitement (আবেগপূর্ণ উত্তেজনা) হ'লে কী হ'তো বলা যায় না।

জমি আধি দেওয়া সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জমি আধি দেওয়া মানে মানুষকে maintain (প্রতি-পালন) করা। যাদের বেশী জমি ছিল, তারা এই কাজ ক'রতো। আধিপ্রথার ভিতর-দিয়ে লোকগুলির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠতো। অসমর্থদের পালন-পোষণের জন্যই এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়েছিল। আমার কথা হ'লো—Make people materially inter-interested unavoidably and make misery materially impossible (জনগণকে বাস্তবে অপরিহার্য্যভাবে পারস্পরিকতায় স্বার্থ-সম্বন্ধ ক'রে তোল এবং দুর্দ্দশাকে বাস্তবে অসম্ভব ক'রে তোল) এই রকমটা যদি গজিয়ে তুলতে পার, তাহ'লে অহিংসা আপনা-আপনি আসবে। মানুষ যদি মানুষের মঙ্গলের জন্য সক্রিয়ভাবে বদ্ধপরিকর না হয়, তাহ'লে কারও উন্নতি কায়েম হ'তে পারে না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—বাদলের দুই মেয়ে মাঝে-মাঝে আমার কাছে গয়নার জন্য আবদার ক'রতো। আমি বলেছিলাম, স্থবিধামতো দেব। একটার আর জুটলো না (মেয়েটি মারা গেছে), দেখেন কী কষ্ট! আপনারা যদি সন্দীপাকে দেন, তবে ভাল হয়। পারেন তো ওর মাকেও দেবেন।

কেষ্টদা—দেখি!

শ্রীশ্রীঠাকুর নলিনীদার কাছে পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান খবরাখবর জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

নলিনীদা (মিত্র) বিস্তারিত বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এমনভাবে চ'লবেন যাতে কেউ বিপন্ন না হয়।

২৫শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ১১। ৯। ১৯৪৭)

কলকাতা থেকে মিঃ চ্যাটার্জ্জী নামক এক ভদ্রলোক এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে তক্তপোষের উপর ব'সে সকালের মেঘলা আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। ভদ্রলোক আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহকোমল কণ্ঠে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তিনিও প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আর্য্যদের রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হেসে বললেন—আর্য্যদের সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলে ছিলেন ঋষি। ঋষির বিধান ও পরিচালনা অনুযায়ীই সব-কিছু চ'লতো। তাই একদেশদর্শিতা বা অপূর্ণ দৃষ্টির জন্য যে-সব ভুল হয়, সে-সব ভুল হবার অবকাশ ছিল না বললেই চলে। বর্ণাশ্রম তখন বিশেষভাবে প্রতিপালিত হ'তো। তাতে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বজায় থাকতো। Efficiency (দক্ষতা) বৃদ্ধি পেতো। Unemployment (বেকার অবস্থা) ব'লে জিনিস ছিল না। Production-ও (উৎপাদনও) হ'তো খুব। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব হ'তো না। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে co-operation (সহযোগিতা)-ও ছিল খুব। প্রত্যেক বর্ণ নিজ-নিজ কাজ ক'রতো। কেউ কা'রও বৃত্তি অপহরণ ক'রতো না। বিভিন্ন বর্ণ ছিল inter-dependent (পরস্পর নির্ভরশীল)। শুনেছি, প্রত্যেক বর্ণের সমস্যাদি সমাধান ও কল্যাণ-বিধানের জন্য তাদের নিজস্ব সংস্থা ছিল। বিভিন্ন বর্ণের এইসব সংস্থার বিশিষ্ট ও প্রধান যাঁরা তাঁদের নিয়ে পরিষদ গঠিত হ'তো। ইষ্টানুগ চলন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, লোকসেবা ও বাস্তব সংগঠনমূলক কর্ম্ম-পরিচালনার দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দেখে মন্ত্রী নির্ব্বাচন করা হ'তো। যারা হাতে-কলমে দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুষ্ঠুভাবে করেনি, লোকপরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেনি, বাইরের বোলচাল দেখে তাদের উপর শাসন-সংক্রান্ত কাজের গুরুদায়িত্ব দিলে প্রায়ই ঠকতে হয়। তাই আগের কালে মন্ত্রী-নির্ব্বাচনের সময় দেখা হ'তো লোকটা সৎ, ধীমান ও করিৎকর্ম্মা কিনা। সর্ব্বোপরি থাকতেন ঋষি। তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখেই নির্দ্ধারণ করা হ'তো কে কতখানি নির্ভরযোগ্য। এর সঙ্গে ছিল hereditary king (বংশানুক্রমিক রাজা)। আমার মনে হয়, আমাদের মতো ক'রে তখনকার দিনে একরকমের constitutional monarchy (নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র) evolve ক'রেছিল (বিবর্ত্তিত হয়েছিল)। ইংরেজদের ঐ রকমটা আমার ভাল লাগে। বংশানুক্রমিক রাজা ও রাজপরিবারকে মান্য করার প্রথা যদি থাকে, তবে ওর ভিতর-দিয়ে একটা emotional integration (আবেগগত সংহতি) সৃষ্টি হ'তে পারে। সঙ্গে-সঙ্গে চাই ঋষি-আনুগত্য। ঋষির সঙ্গে যোগাযোগ ও তাঁর প্রতি অনুরাগ যার যত গভীর ও অকাট্য, চরিত্র ও কর্ম্মশক্তি উভয় দিক দিয়েই সে হয় তত উন্নত। দেশের মধ্যে এই গোড়ার ব্যাপারটা যাতে খুব জোরালো

হয় সেইজন্য চাই mission work-এর (প্রচার কাজের) ব্যবস্থা। শ্রীকৃষ্ণের সময়, বুদ্ধদেবের সময়, অশোকের সময় এটা খুব ছিল। ঋত্বিক্, শ্রমণ, ভিক্ষু ইত্যাদির network (জাল) ছড়িয়ে ছিল দেশে। আদত কথা হ'লো—লোকচরিত্রে ধর্ম্ম যত প্রতিষ্ঠা পাবে, রাষ্ট্রও তত শক্তিশালী ও অপরাজেয় হ'য়ে উঠবে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী—বেদের তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদ মানে হ'লো revealed truth (আপ্ত সত্য)। এর পিছনে আছেন Seer (দ্রষ্টা)। বোধশক্তি ও চারিত্রিক সঙ্গতি যার যে স্তরের, বস্তু বা বিষয়কে দেখেও সে তেমনতর। বস্তু বা বিষয়কে আমরা সবটুকু জেনে ফেলেছি, বুঝে ফেলেছি বা দেখে ফেলেছি, এ-কথা বলা চলে না। সব সময় আরোর সম্ভাবনা থেকেই যায়। যিনি যতটুকু জানেন, বোঝেন, দেখেন, তিনি ততটুকু ব্যক্ত করেন। ঋষিরা হ'লেন অসাধারণ অনুভব-সম্পন্ন পুরুষ। তাঁদের এই অসাধারণ অনুভবের অভিব্যক্তি ও বর্ণনাই বেদ। বেদ কিন্তু কল্পনাপ্রসূত কবিত্ব নয়। এ হ'লো বাস্তব দর্শন। তাই, বেদ অত্যন্ত factful (তথ্যসমন্বিত) ব্যাপার। ধরুন, আমরা একটা জিনিস সাধারণ খোলা চোখে একরকম দেখি। সেই জিনিসটাই যদি আবার মাইক্রোস্কোপে দেখি, তখন আরো অনেক কিছু ধরা পড়ে, যা' খোলা চোখে মালুম হয় না। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে যা দেখা যায়, খোলা চোখে তা' দেখা যায় না ব'লে মাইক্রোস্কোপের দেখাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। তেমনি ঋষি যা' জানেন, আমরা তা জানি না ব'লে তা' কিন্তু অবাস্তব নয়। বরং ঐ জানাটাই বেশী বাস্তব, কারণ, ওর মধ্যে আছে বাস্তবতা সম্বন্ধে fuller knowledge (পূর্ণতর জ্ঞান)। আমরা নিজেদের থেকে অনাবিষ্কৃত কিছু আবিষ্কার ক'রতে পারি বা না পারি, মানুষের বোধে ও জ্ঞানে যা' ধরা প'ড়েছে এবং যার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, সশ্রদ্ধ কর্ম্মমুখর অনুশীলনে তা' আমাদের আয়ত্ত করাই ভাল। তাতে অমৃতের অনুসন্ধানের পথে আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারবো। অজানাই আমাদের অস্তিত্বকে বিপদসঙ্কুল ক'রে তোলে। অজানার নিরসন যত হয়, ততই বাঁচার পথ নিরাবিল হয়। তাই ক'রতে-ক'রতে আরো জানতে হবে এবং যা' জানা গেছে সেই অনুযায়ী ক'রে চ'লতে হবে। মানুষের এই চেষ্টা আছে ব'লেই মানুষ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। জ্ঞানের অন্বেষণ যদি না থাকতো এবং যা' জানা গেছে সেই জ্ঞানকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত করার চেষ্টা যদি না থাকতো, তবে মানুষ আজ যে উন্নতি লাভ ক'রেছে, তা' কিছুতেই তার পক্ষে সম্ভব হ'তো না। আমার মনে হয়, চারটে বেদ হ'লো four different branches of science (বিজ্ঞানের চারটি শাখা)। এগুলি আবার inter-related (পরস্পর-সম্পর্কিত)। কোনটা কোনটাকে ছাড়া নয়। বেদের মধ্যে অনেক জিনিস সূত্রাকারে দেওয়া আছে।

কিন্তু কোন্‌টা কেন, তা' যদি না জানা যায়, তাহ'লে সুবিধা হয় না। ঐ জ্ঞান বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।

মিঃ চ্যাটাজ্জী—বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সমাজকে এই চার বর্ণে ভাগ করা হ'লো কেন, সে-সম্বন্ধে কিছু বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে বাঁচতে গেলে অনেক দিকই দেখতে হয়, অনেক কিছুই ক'রতে হয়। প্রত্যেকের যদি সব-দিক দেখতে হয়, সব-কিছু ক'রতে হয়, তাহ'লে সে পারে না। তেমনতর যোগ্যতাও মানুষের মধ্যে কমই দেখা যায়। তবে সাধারণতঃ জৈবী বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী প্রত্যেকের সহজাত কর্ম্মদক্ষতা থাকে। এই সহজাত কর্ম্মদক্ষতা-অনুযায়ী শ্রমবিভাগই বর্ণবিভাগের গোড়ার কথা। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই নামগুলি খুব সার্থক। বিপ্রের কাজ হ'লো বিশেষভাবে পরিপূরণ। ইষ্ট ও কৃষ্টির সম্বারণা, লোকসেবা, শিক্ষা, জ্ঞান, গবেষণা, মন্ত্রণা, বিধিবিন্যাস এইগুলিই হ'লো তাদের প্রধান কাজ। তাদের কাজ হ'লো, মানুষকে ক্রমাগত progressive push (উন্নতিমুখী প্রবোধনা) দিয়ে চলা। জাতিকে বাঁচাতে গেলে বিপ্র চাই-ই। বিপ্র যদি না বাঁচে, বিপ্র যদি না জাগে, বিপ্র যদি স্বকর্ম্ম না করে, তাহ'লে জাতীয় উন্নতির জন্য যত ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, কোন ব্যবস্থাই কার্য্যকরী হবে না। যে-মানুষের জন্য সব ব্যবস্থা, সেই মানুষই দিন-দিন অধোগামী হ'য়ে যাবে, যা আজ হ'তে চ'লেছে সর্ব্বত্র। ক্ষত্রিয়ের কাজ হ'লো মানুষকে ক্ষতের থেকে ত্রাণ করা। ক্ষত্রিয় ইষ্ট-কৃষ্টিকে রক্ষা ক'রবে, বিপন্নকে রক্ষা ক'রবে, বহিঃশত্রু ও অন্তর্বিপ্লবের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবে। ক্ষত্রিয়রা হ'লো রাজার জাত। রাজকর্ম্মই তাদের কর্ম্ম। রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, ভয়ার্ত্তকে অভয় দান, অনাশ্রিতকে আশ্রয় দান তাদের ধর্ম্ম। বৈশ্যদের কাজ হ'লো কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায় ইত্যাদি। এক-কথায়, economic life-এর (অর্থনৈতিক জীবনের) ভার তাদের উপর। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দুই-ই তারা ক'রতো। বাইরের সমাজে প্রবেশ করার বিশেষ একটা knack (দক্ষতা) ছিল তাদের। এই জিনিসটি খুব ভাল যদি মানুষ নিষ্ঠায় দৃঢ় থাকে। তা' না হ'লে সে নিজত্ব হারিয়ে অন্যের আহার্য্য হ'য়ে পড়ে। আমাদের দেশের বৈশ্যদের বেলায়ও তাই হ'য়েছিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য-ব্যপদেশে বিদেশে যেত, সেখানে বিয়ে-থাওয়াও ক'রতো। কালে-কালে তারা ইষ্ট-কৃষ্টির প্রতি আনুগত্য হারিয়ে স্বার্থপর ও ভোগলিপ্সু হ'য়ে উঠল। ধর্ম্মার্থে ও লোকসেবার্থে দান, যা' তাদের অবশ্যকরণীয়, তা' ভুলে গেল। অর্থগৃধ্নুতায় লোকসেবার আদর্শ হারিয়ে ব্যবসায়ের নামে লোককে শোষণ ক'রতে লাগল। এমনি ক'রে তারা জাতির বিপর্য্যয় ডেকে আনলো। যতদিন তারা ইষ্টকৃষ্টিসেবী ছিল, ততদিন কিন্তু তাদের দিয়ে বহুত উপকার হ'য়েছে

সবার। আর, শূদ্র মানে হ'লো শূচীকৃত অনার্য্য। যে-সব অনার্য্য আর্য্যকৃষ্টিকে বরণ ক'রে নিয়ে আর্য্যসমাজের অঙ্গীভূত হ'য়েছিল, তাদের ব'লতো শূদ্র। পরিচর্য্যাই হ'লো তাদের প্রধান কর্ম্ম। এদের একজনের জীবিকা আর একজন অপহরণ ক'রতে পারতো না। তাই unemployment problem (বেকার সমস্যা) ছিল না। আর, শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন ছিল যে, প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কৃতী ও অর্জ্জী হ'য়ে উঠতো। প্রত্যেকের মাথায় এই বুদ্ধি ঢুকিয়ে দেওয়া হ'তো যে, তার কৃতিত্ব নির্ভর করে—পরিবেশকে সে যতখানি উচ্ছল ক'রে তুলতে পেরেছে তার উপর। পরিবেশকে উচ্ছল ক'রে তোলার ভিতর-দিয়ে নিজে উচ্ছল হ'য়ে ওঠাই ছিল কৃতিত্বের মানদণ্ড। আর, এইটেই হ'লো চিরন্তন সত্য। মানুষের মধ্যে এই সত্যটা যতদিন না ঢোকানো যাবে, ততদিন সমাজে কিছুতেই শান্তি ও সামঞ্জস্য আসবে না। এই বোধকে সক্রিয় ক'রে তুলতে গেলে প্রথমে চাই আদর্শানুরাগ সঞ্চারিত করা। তখন আদর্শকে খুশি করার খাতিরে মানুষ এইটে ক'রতে বাধ্য হবে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী—বর্ণ-অনুযায়ী কর্ম্ম আজকাল লোকে খুব কমই করে। সবই ওলোটপালোট হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।' Instinct (সহজাত সংস্কার) ignore (উপেক্ষা) ক'রে অন্য কাজ করা ঠিক নয়। ওতে কোন knowledge বা experience (জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা) assimilated (আত্মীকৃত) হয় না। তাই becoming (বিবর্দ্ধন) বা furtherance (অগ্রগতি) হয় না। ঐ অবস্থায় যা জানা বা শেখা হয়, তা' হয় টিয়েপাখীর বুলির মতো। তার সঙ্গে সত্তার কোন যোগ হয় না। স্ববৈশিষ্ট্যের পথে মানুষ struggle (সংগ্রাম) ক'রতে গিয়ে যদি unsuccessful-ও (অকৃত-কার্য্যও) হয়, তাও সে নিজত্ব হারায় না। তার একটা দাঁড়া ঠিক থাকে। সে নিজেকে feel (বোধ) ক'রতে পারে। সে তার স্বভূমিতে অধিষ্ঠিত থাকে ব'লে নির্ভয় হয়। কিন্তু যে পরভূমিতে বসবাস করে, অনধিকার চর্চ্চা করে, বাইরে তার যতই জেল্লা দেখা যাক না কেন, সে জানে যে তার পায়ের তলার মাটি শক্ত নয়, তাই ভিতরে-ভিতরে তার ভয় থাকে। দাঁড়কাককে যদি ময়ূরপুচ্ছ পরিয়ে দেওয়া যায়, তবে সে না পায় ময়ূরের মর্য্যাদা, না পায় দাঁড়কাকের দলে আপন স্থান। কৃত্রিমতা সব সময়ই বিশ্রী। Instinct-এর (সহজাত সংস্কারের) প্রতি লক্ষ্য না দিয়ে যার যেমন খুশি সে যদি সেইরকম কাজে আত্মনিয়োগ ক'রতে চায়, তাহ'লে সমাজে নানারকমের বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয় দেখা দেয়। বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় অমনি ক'রেই। কেউ যদি বিশেষ কোন অনুশীলন ক'রতে চায়, তবে বর্ণোচিত কাজ জীবিকা হিসাবে গ্রহণ ক'রে, ঐটেকে secondary (গৌণ) হিসাবে রক্‌স ক'রতে পারে। নিজের জীবিকা ছেড়ে দেওয়া বা অন্যের

জীবিকার ক্ষেত্রে অনধিকার সত্ত্বেও প্রবেশ করা বর্ণাশ্রমের মতে অপরাধ। জন্মগত প্রকৃতি যাকে যে-কাজের অধিকারী ক'রেছে, সেই কাজে যত সুবিধা-অসুবিধা থাক, তাই-ই তার পক্ষে উত্তম। এই বিধিকে যে উল্লংঘন করে, সে শুধু নিজের ক্ষতি করে না, অপরেরও ক্ষতি করে। ব্রাহ্মণত্বই প্রত্যেকের অধিগম্য। তাতে উপনীত হ'তে গেলেও চাই স্বকর্ম্ম করা। কবীর জোলার কাজ ছাড়েননি। ধর্ম্মব্যাধ তাঁর পেশা ত্যাগ করেননি।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী—শূদ্র যদি উন্নত হয়, তাহ'লে সমাজেরও তো তাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর্য্যসমাজ এদিক দিয়ে যে উদারতা দেখিয়েছে, তার তুলনা হয় না। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবারই লক্ষ্য হ'লো ব্রাহ্মণত্ব-লাভ। আর, প্রত্যেকেই তা' লাভ ক'রতে পারে। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, তাহ'লে সে বিপ্রেরও গুরু হ'তে পারে, কিন্তু তার মেয়ে বিয়ে ক'রতে পারে না। বিয়ে ব্যাপারটা শুধু সাধনা ও চরিত্রের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে হ'তে পারে না। ওর জন্য সেই সঙ্গে লাগে biological competency (জীবনবিজ্ঞান-সম্মত যোগ্যতা)। শুনেছি, ক্ষত্রিয় পর-পর পাঁচ পুরুষ ধ'রে, বৈশ্য পর-পর সাত পুরুষ ধ'রে, শূদ্র পর-পর চৌদ্দ পুরুষ ধ'রে ব্রাহ্মণত্ব লাভ ক'রলে তাদের পরবর্ত্তী বংশধররা বিপ্রত্বে উন্নত হবার অধিকারী হ'তো। বিপ্রের মধ্যে তাই নানারকম দাগ দেখা যায়। কারও মধ্যে দেখা যায় ক্ষত্রিয়-সংস্কারের রেখা, কারও মধ্যে বৈশ্য-সংস্কারের। এই ধরণের রকমারী traits (বৈশিষ্ট্য) দেখা যায়। আমার মনে হয়, চোখ থাকলে trace (সূত্র বের) করা যায়—কারা কোন্ বর্ণ থেকে বংশপরম্পরায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ ক'রে বিপ্র বর্ণে উন্নীত হ'য়েছে। নারকেল গাছের ডেগো প'ড়ে গেলেও যেমন তার দাগ থাকে, তেমনি বিশেষ কোন বর্ণ থেকে বিহিত পরিক্রমায় বিপ্র বর্ণে উন্নীত হ'লেও মূলবর্ণের রেখা থেকে যায়।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী—কোন-কোন রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠরা নিজেদের জীবন বিপন্ন মনে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা রাষ্ট্র এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় উভয়ের পক্ষেই অগৌরব-জনক। এর প্রতিকার ক'রতে হবে। এমন অবস্থার সৃষ্টি করা লাগে যাতে অন্যে আমাকে মারতে না পারে এবং আমারও অন্যকে মারতে না হয়। প্রবল দুর্ব্বলের উপর যদি অত্যাচার করে, তার মানে প্রবল নিজেকেই খর্ব্ব করছে। আজ হোক কাল হোক, তার ফল ফলবেই। শক্তি যেখানে দুর্ব্বলকে পুষ্ট না ক'রে তাকে আরো হীনবল ক'রে তোলে, সেখানে প্রকৃতির প্রতিশোধ ও প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য। অত্যাচার অনেক সময় দুর্ব্বলদের সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিমান হ'তে প্রেরণা জোগায়। তাই, দুর্ব্বল যে বরাবর দুর্ব্বল থাকবে এমন কথা নয়। আদর্শনিষ্ঠা, সংহতি ও পারস্পরিকতা যদি থাকে, তবে মুষ্টিমেয় লোকও

অসম্ভব শক্তির অধিকারী হ'তে পারে। সাত-সমুদ্র তের-নদী পারের মুষ্টিমেয় ইংরেজ যে এতদিন আমাদের দেশ শাসন ক'রতে পেরেছে সেটা সম্ভব হ'য়েছে তাদের কতকগুলি সদ্‌গুণ এবং আমাদের কতকগুলি দুর্ব্বলতার দরুন। কিন্তু এই ইংরেজদের শাসন ত্রুটিহীন ছিল না, তাই জাতীয়-চরিত্রের নানা সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাদের ভারতকে হারাতে হ'লো। প্রকৃতির বিধান হ'লো—তুমি যদি রক্ষা পেতে চাও, তবে অপরকে রক্ষা ক'রে চলতে হবে। আর, তুমি যদি অপরের ক্ষতি কর, তুমি কিছুতেই রেহাই পাবে না—তা' তুমি যতই powerful (শক্তিমান) হও না কেন। Efficiency-এর (দক্ষতার) তাৎপর্য্য হ'লো অন্যকে efficient (দক্ষ) ক'রে তোলা, successful (কৃতকার্য্য) ক'রে তোলা। এইভাবে মানুষকে educate (শিক্ষিত) ক'রতে হবে। আর, যে-কোন movement-ই (আন্দোলনই) আমরা করি, ভেবে নিতে হবে তার ভাল ফল কী-কী হ'তে পারে। ভাল ফল হওয়ার পর সেইটে যাতে maintained ও continued (বজায় থাকে ও বাহিত) হয় এবং সেই ভালটা যাতে কোন আনুষঙ্গিক মন্দকে ডেকে না আনে, তার ব্যবস্থা আগে থেকেই ক'রতে হবে। আর, যে-যে দিক-দিয়ে যে-যে পর্য্যায়ে অবাঞ্ছিত মন্দের সৃষ্টি হ'তে পারে, তার antidote (প্রতিষেধক) create (সৃষ্টি) ক'রে রাখতে হবে। আমাদের দেশে স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন হ'য়েছে, কিন্তু diplomatic foresight (কূটনৈতিক দূরদৃষ্টি)-ওয়ালা leader (নেতা) থাকলে, সম্ভাব্য সব রকমের reaction (প্রতিক্রিয়া) resist (প্রতিরোধ) করার preparation (প্রস্তুতি) তাঁরা করতেন। স্বাধীন ভারতের নামে এই অনাসৃষ্টির সৃষ্টি ক'রতেন না। দেশকে ভাগ ক'রে দুই দেশ করার ফল কোন দেশের পক্ষে ভাল হবে না—এ-আমি নির্ঘাত বলতে পারি। এর ফলে দুই দেশের উন্নতিই ব্যাহত হবে। এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে উভয় দেশের জনসাধারণ—হিন্দুরও ক্ষতি হবে, মুসলমানেরও ক্ষতি হবে। হিন্দু-মুসলমান কোন নেতাই লোকের এই ক্ষতি চাননি। কিন্তু বাস্তবে যা হ'য়ে চ'লবে, তা' হ'লো এই। আমার এটা blind sentiment-এর (অন্ধ ভাবাবেগের) কথা নয়। ভবিষ্যৎই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ ক'রবে। আজকে আমার কথা অনেকের কাছে অপ্রিয় লাগতে পারে, কিন্তু অবস্থার চাপে প'ড়ে দুই দেশের দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকেরা একদিন এই কথা স্বীকার ক'রতে বাধ্য হবে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী—দুই দেশের সাধারণ লোকের ক্ষতি হবে, এ-কথা আপনি কেন বলছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ত্তমানে পাকিস্তান ভারতবর্ষকে প্রতিবেশী শত্রুরাষ্ট্র ব'লে মনে ক'রবে এবং ভারতও পাকিস্তানকে ঐ চোখে দেখবে। নানা ব্যাপার নিয়ে গোলমাল বাধার সম্ভাবনা আছে। তাই সামলাতে গিয়ে ক্রমাগত অনেক কাঠ-খড়

খরচ হবে। ঘর ঠিক করার চাইতে বাইরের ঝামেলা মেটানোর ব্যাপারে সময়, সামর্থ্য, অর্থ ও নজর দিতে হবে বেশী। তার ফলে সাধারণ লোকের দুর্দশা বাড়বে। আর, ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধকে অবলম্বন ক'রে বাইরের বিভিন্ন শক্তির নানা কুটচালও চ'লতে পারে এই দুই দেশের উপর দিয়ে, যার ফল এই দুই দেশের পক্ষে অশুভজনক হওয়া অসম্ভব নয়। কোন দেশ ভারতকে যদি জব্দ ক'রতে চায়, সে কৌশলে পাকিস্তানকে utilise ক'রতে (কাজে লাগাতে) চেষ্টা ক'রতে পারে। আবার, কেউ যদি পাকিস্তানকে জব্দ ক'রতে চায়, সে কৌশলে ভারতকে utilise ক'রতে (কাজে লাগাতে) চেষ্টা ক'রতে পারে। আবার, বাইরের কোন শক্তি অপর কোন শত্রুশক্তিকে কাবেজে আনবার জন্যও এই বিরোধের advantage (সুযোগ) নিতে পারে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব না থাকে, তাহ'লে যে পদে-পদে কতো বিপদ তা' ব'লে শেষ করা যায় না। আর, পরিস্থিতি যেমন—তাতে জটিলতা বাড়বে ছাড়া কমবে ব'লে মনে হয় না। স্বাধীনতার উদ্দেশ্য লোকের সুখ-সুবিধা ও উন্নতিকে অব্যাহত ক'রে তোলা। তার পথে একটা স্থায়ী অন্তরায় সৃষ্টি ক'রে যে স্বাধীনতালাভ করা হয়, সেই স্বাধীনতাও খঁতো স্বাধীনতা। আমার মনে হয়, freedom (স্বাধীনতা) পাওয়ার মতো prepared (প্রস্তুত) হইনি আমরা। অবস্থাচক্রে যা' হবার তা' হ'য়েছে। Freedom (স্বাধীনতা) পাওয়াটা একটা ascetic culture (তাপস অনুশীলন)। তাতে বাড়ে লোকের চরিত্রবল, বাড়ে লোক-পালী স্বভাব। ওতে সবাই সবার আপন হ'য়ে ওঠে। ভেদবুদ্ধির বদলে অভেদাত্মক সম্পর্ক প্রবল হ'য়ে ওঠে। Communalism (সাম্প্রদায়িকতা), provincialism (প্রাদেশিকতা) ইত্যাদির স্থান থাকে না। প্রত্যেকে নিজ বৈশিষ্ট্যে সুদৃঢ় হ'য়ে অন্যের culture (কৃষ্টি) maintain করার (বজায় রাখার) জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। মুসলমান ও হিন্দু উভয়েই এক ও অদ্বিতীয়কে মানে, মানে প্রেরিত-পুরুষকে, মানে পূর্ব্বতন মহানদের, মানে পিতৃপুরুষ ও বংশধারাকে, মূলতঃ উভয়েরই concept (ধারণা) এক। এমন ক্ষেত্রে মুসলমান-কৃষ্টি ও হিন্দু-কৃষ্টির মধ্যে বিরোধ কিভাবে হয়, তা' আমি বুঝি না। আমি বুঝি, আমি যদি রসুলকে ভক্তি ক'রতে না পারি, তাহ'লে আমার হিন্দুত্বেরই অবমাননা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষে পারস্পরিকভাবে এ-কথা সত্য। আমরা পরস্পরকে ভালভাবে জানি না, বুঝি না। এই অজ্ঞতা আছেই, তদুপরি আছে দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত বিভেদমূলক প্রচার। তার ফলে কতরকমের disaster (বিপর্য্যয়) আসছে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী—ব্রিটিশ-সম্বন্ধে আমাদের কী ক'রলে ঠিক হ'তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি হ'লে quit India (ভারত ছাড়) বলতাম না। বলতাম—Quit exploiting, come to exalt and be exalted (শোষণ ত্যাগ কর,

উন্নত কর এবং উন্নত হও)। আজ যা' হয়েছে, তার থেকে constitutional Indo-British free state (নিয়মতান্ত্রিক ভারত-ব্রিটিশ স্বাধীন রাষ্ট্র) হিসাবে যদি আমাদের আরো কিছুদিন চলতো, তাহ'লেও ভাল ছিল। আর, এখনও আমাদের খুব নজর দেওয়া দরকার ধর্ম্মের উপর, কৃষ্টির উপর, তাহলেই আমরা সব ঠিক ক'রে নিতে পারব।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী—আপনি ধর্ম্ম ও কৃষ্টির উপর এত নজর দিতে বলছেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের 'পর, কৃষ্টির 'পর, পূর্ব্বপুরুষের 'পর যদি fanatic inclination (প্রবল ঝোঁক) না থাকে, তবে personality (ব্যক্তিত্ব) হয় না। ইষ্ট ও কৃষ্টিকে অবলম্বন ক'রে individuality ও personality (ব্যক্তিত্ব) grow করে (জন্মে)। ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্ব সমষ্টি-ব্যক্তিত্বে evolved (বিবর্ত্তিত) হ'য়ে ওঠে। নইলে, প্রবৃত্তি ও খেয়াল মানুষকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলে। মানুষ নিজের মধ্যেও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারে না, পরিবেশকে নিয়েও সামঞ্জস্য-সহকারে চ'লতে পারে না।

ইউরোপের বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Grouping of instinctive occupation (সহজাত সংস্কার-অনুপাতিক বৃত্তি-বিভাগ) যদি না হয়, তাহ'লে এ-সমস্যা ঘুচবে না। Strike (ধর্ম্মঘট), dissatisfaction (অসন্তোষ) ইত্যাদি থাকবেই। Production (উৎপাদন) বাড়া ভাল, টাকার দাম বাড়া ভাল। আজ টাকার দাম ক'মে যাচ্ছে, পয়সা খরচ ক'রেও জিনিস-পত্র প্রয়োজনমতো পাওয়া যায় না। এ-অবস্থাটা ভাল নয়। মানুষের efficiency (দক্ষতা) যাতে বাড়ে, production (উৎপাদন) যাতে বাড়ে, তাই করা লাগে।

এরপর ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে তক্তপোষের উপর পাতা বিছানায় উপবিষ্ট। এমন সময় ক্ষেপাবাবা, শচীনদা (গঙ্গোপাধ্যায়) এবং আরো কয়েকজন-সহ শ্রীশ্রীঠাকুর-সকাশে আসলেন। ক্ষেপাবাবা একখানি চেয়ারে বসলেন।

উভয়ে উভয়কে প্রীতিভরে দেখতে লাগলেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনি কোথায় আছেন? আপনার কথা কতো শুনেছি শচীনদার কাছে। এখান থেকে কোথায় যাবেন?

ক্ষেপাবাবা—এখানে সুশীলবাবুর বাড়ীতে আছি। এখান থেকে হাজারীবাগ যাব। সেখানে একটা আশ্রম হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শচীনদার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—হাজারীবাগের স্বাস্থ্য ভাল না এখানকার স্বাস্থ্য ভাল?

শচীনদা—হাজারীবাগের।

শ্রীশ্রীঠাকুর— রাঁচীর ?

শচীনদা—রাঁচীর থেকে হাজারীবাগ ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উনি (ক্ষেপাবাবা) কালই চ'লে যাবেন ?

ক্ষেপাবাবা—হ্যাঁ! দরকার আছে। ২৭ বছর আগে একবার আশ্রমে গিয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

ক্ষেপাবাবা—হ্যাঁ। আমি দর্শন ক'রে আনন্দবাজারে প্রসাদ পেয়ে চ'লে এসেছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে পড়ে, একটা লম্বা ঘর তৈরী হচ্ছিল। একজন গিয়েছিলেন, কতো কথা হয়েছিল।

ক্ষেপাবাবা—সে আমার এক গুরুভাই।

একটু পরে তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন—সত্যিই কি ভগবান্ আছেন ? মন্দির-টন্দির দেখে এলাম, তৃপ্তি হয় না। এখানে এসে শান্তি পেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু নীরব থেকে পরে বললেন—ব্যাপার এই। থাকতে চাই, আছিকে বড় ভাল লাগে। থাকার জন্য পাগল। না-থাকাটাই ভয়—আতঙ্ক। তাই ক'রতে হবে যাতে থাকাটা অটুটভাবে অনন্ত জীবন ধ'রে অব্যাহত থাকে।

ক্ষেপাবাবা—ক্ষণভঙ্গুর দেহ নিয়ে বা অভঙ্গুর অবস্থায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ক'রে হয় পেলেই হ'লো।

ক্ষেপাবাবা—দূরে কি নিকটে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাওয়াটা হয় যেমন ক'রে।

ক্ষেপাবাবা—এককে দেখে বহুলোক আসে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন—মূলে এক কিনা।

ক্ষেপাবাবা—রূপে বিভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু স্বরূপে বিভিন্ন নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর নীরবে সম্মতি জানালেন। একটু পরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আপনি বিকেলে কোথায় যাবেন আজ ?

ক্ষেপাবাবা—বিকালে বেরুব না।

পরে তিনি বললেন—হঠাৎ বিশ্বাস হয়। আবার হারিয়ে যায়, মন চঞ্চল হয়। এর কী ? আত্মবিস্মৃতি হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি যতদিন আমাদের ব্যভিচারী থাকে, ততদিন এমন হয়। কখনও প্রবৃত্তির দাসী, কখনও ইষ্টের দাসী।

ক্ষেপাবাবা কয়েকজন সাধুর বৃত্তান্ত বললেন।

এরপর তিনি প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ ক'রলেন।

২৬শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ১২। ৯। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট। অনেকেই কাছে উপস্থিত আছেন।

শচীনদা (গঙ্গোপাধ্যায়) জিজ্ঞাসা করলেন—ইষ্টে বিশ্বাস আসে কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস আসে ভক্তি থাকলে। বিশ্বাস জিনিসটা মূলতঃ ভক্তি। কারও উপর হাড়ভাঙ্গা টান হ'লে, তার সম্বন্ধে আর প্রশ্ন থাকে না। এই প্রশ্নহীন ভাবটাই বিশ্বাস। আমার নিজ অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যেমন আমার কোন প্রশ্ন নেই। আমি আছি এটা আমার কাছে অবধারিত। আমার জীবনে আমার ইষ্টই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান এমনতর অকাট্য ভালবাসা যখন গজায়, তখন সে-বোধ আর টলে না। তিনি অত্যাচার করলেও মনে কোন বিরূপ ভাব আসে না। সবতাতেই আমি রাজী। সুখে থাকলেও তাঁকে নিয়ে বিভোর হ'য়ে থাকি। দুঃখে থাকলেও তাঁকে নিয়ে বিভোর হ'য়ে থাকি। এই নেশা কিছুতেই কাটে না। একেই বলে বিশ্বাস বা নিষ্ঠা। বেকায়দায় প'ড়লে যখনই ভক্তি চ'টে যায়, দোষারোপ বা অনুযোগ-অভিযোগের বুদ্ধি আসে, তখনই বুঝতে হবে ভক্তি-বিশ্বাসের পাড়ায় আমরা ঢুকিনি। স্বার্থলোভে যারা ভগবানকে ভজে, তাদের ভক্তি স্বার্থে, ভগবানে নয়। ভগবানকে দিয়ে তারা নিজেদের সুখ-সুবিধা আদায় ক'রে নিতে চায়। ভগবানকে বাদ দিয়ে অন্য কোনভাবে সুখ-সুবিধা হাসিল হ'লে তাই নিয়ে মজে থাকতেও তাদের আপত্তি থাকে না। তবে অনেকে ভয়ে ভগবানকে মানে ও ডাকে। ভাবে, তাঁকে না মানলে পাছে যদি কোন বিপদ-আপদ হয়। ভক্তি-বিশ্বাসের নামে নানারকম মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি নিয়ে চলে অনেকে। অনেকের আছে না ক'রে ভাল ফল পাওয়ার বুদ্ধি এবং অপকর্ম্ম যা' করেছে তার ফল এড়াবার অভিসন্ধি। এই মতলবে ভগবানের দোহাই দিয়ে চলে। কিন্তু তিনি তেমন বান্দা নন যে স্তুতিবাক্যে ভুলে গিয়ে বিধি উল্টে দেবেন। তাই তাদের কল্পনা ও কামনা যখন ফলে না, তখন ভগবানের বিচারে ব'সে যায়। এই ধরণের mentality (মানসিকতা) যেখানে, সেখানে ভক্তি-বিশ্বাসের জায়গা অতি সঙ্কীর্ণ। ধর্ম্মের নামে, ভক্তি-বিশ্বাসের নামে এইসব ফাঁকিবাজী চলে ব'লে বহু লোক ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম্ম-বিরোধী এরাই। ভক্তি-বিশ্বাসের সেরা দৃষ্টান্ত হ'লো হনুমান। একটা গোটা জীবন সে রামচন্দ্রকে সুখী করার ধান্ধায়ই কাটিয়ে দিল। আর কোন ধান্ধা নেই। বুক চিরে দেখিয়ে দিল সেখানে রামচন্দ্রই বিরাজ করছেন। তার ঐ বুকজুড়ে একজনই আছেন। তিনি রামচন্দ্র। আর, রামচন্দ্র আছেন বলে রামচন্দ্রের যা'-কিছু মায় বিশ্বদুনিয়াও তার কাছে কতো মূল্যবান। কিন্তু রামবিহীন অমূল্য রত্নহারও তার কাছে অসার ও মূল্যহীন। তা সে পোছেই না। কানা-কড়িও দাম দেয় না তার। ভক্তি-বিশ্বাস এমনি ক'রেই মানুষকে একাধারে

মহা-আসক্ত ও মহা-নির্লিপ্ত ক'রে তোলে। সে দুনিয়াদারীর পিছনে ছোটে না। কিন্তু দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য-মান-যশ তার পিছনে ছোটে। তা' দিয়ে ইষ্টসেবার সুবিধা না হ'লে সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। বরং সন্তর্পণে এড়িয়ে চলে। কোন দুঃখকেই সে দুঃখ ব'লে মনে করে না, যদি তার ইষ্টভজন অর্থাৎ ইষ্টের সঙ্গ, সেবা, স্মরণ-মনন, প্রয়োজনপূরণ ইত্যাদি অটুট থাকে, অস্খলিত থাকে। আবার, কোন সুখকেই সে সুখ বলে মনে করে না, যদি সে-সুখ ভোগ ক'রতে গিয়ে তিলেকের জন্যও তার মন ইষ্টানুসরণ থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে। তাকেই সে জীবনের পরম দুর্ভাগ্য ও দুর্ঘটনা মনে করে। সে-কষ্ট সে সইতে পারে না। তাহ'লে বোঝেন তার চরিত্রটা কী রূপ নেয়। আবার, ইষ্টকে যে ভালবাসে, পরিবেশকেও সে ভাল না বেসে, সেবা না ক'রে পারে না। একজন নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী ভক্ত যে-মুল্লুকে থাকে, সে-মুল্লুকের চেহারাই পাল্টে যায়। ও যে কী জিনিস ক'য়ে বোঝাবার নয়। ঐরকম মানুষ চর্ম্মচক্ষুতে দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা।

প্রফুল্ল—প্রকৃত নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী ভক্ত দুর্লভ, তা বুঝলাম। কিন্তু মানুষ পাপ, অন্যায় ও দোষ ক'রে দুর্ভোগের মধ্যে প'ড়ে আর্ত্ত হ'য়ে পরমপিতাকে যদি বিপদ-মুক্তির জন্য কাতরকণ্ঠে ডাকে, তাতে কি কোন ফলই ফলে না। দুর্ব্বল মানুষের তাহ'লে আশ্রয় কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃত আর্ত্ত হ'লে তো হয়ই। আর্ত্ত হওয়া মানে সত্তাকে বাঁচাবার ক্ষুধা জাগা। এ-ক্ষুধা জাগলে তখনকার মতো মানুষ অনেকখানি obsession (অভিভূত) থেকে মুক্ত হয়। তার ফাঁকিবাজী, হামবড়াই, আত্মসমর্থনের বুদ্ধি নিস্তেজ হয়। আত্মবিশ্লেষণের ভাব আসে, অনুতাপ আসে, নিজেদের দোষ-স্খালনের আগ্রহ জাগে, সৎ-সম্বেগ প্রবল হয়। ঐ তো শুভমুহূর্ত্ত জীবনে। তখন বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী। সাময়িক চলেও ঠিকমতো। এই রকমটাই তো পরমপিতার দয়া। এর ফলে অনেকখানি উদ্ধার পেয়ে যায়। রামচন্দ্রের প্রতি আকুল আগ্রহে অহল্যার পাষাণ উদ্ধার হয়েছিল অমনি ক'রেই। কিন্তু মানুষ সুদিন পেয়ে আবার যদি ভগবানকে ভুলে যায়, তাহ'লে যা হবার তা' হয়ই। কর্ম্মফল এড়ান যায় না। তবে যারা সদ্‌গুরুকে গ্রহণ ক'রে নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ নিয়ে কাঁটায়-কাঁটায় তাঁর নির্দ্দেশ মেনে চলে, তাদের প্রবৃত্তি, চাল-চলন, চিন্তা ও বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হবার তালে থাকে। ঐ ধাঁজ যখন এসে যায় জীবনে তখন নতুন ক'রে দুষ্কর্ম্মের সৃষ্টি হয় কম। আর, আগের দুষ্কর্ম্ম-জনিত দুর্ভোগ যদি এসেও পড়ে, তাকেও শুভে বিন্যস্ত করার ইচ্ছা, বুদ্ধি ও শক্তি জাগে অন্তরে। প্রবৃত্তিগুলির চাইতে ইষ্ট যদি প্রিয় না হ'য়ে ওঠেন, প্রধান না হ'য়ে ওঠেন মানুষের কাছে, তাহ'লে কিন্তু কিছুই হয় না। ইষ্ট আমাদের কল্যাণকর নির্দ্দেশ দিতে পারেন, কিন্তু প্রবৃত্তির

বিরুদ্ধ-সম্বেগকে উপেক্ষা ক'রে ইষ্টানির্দ্দেশকে প্রাধান্য দিয়ে চলা আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ ব্যাপার, অনুরাগসাপেক্ষ ব্যাপার। তার উপর তাঁর কোন হাত নেই। তাই ভগবান আমাদের বাঁচাতে পারেন না। বাঁচাতে পারে ভগবদনুরাগ। এইজন্য গীতায় আছে, মানুষ নিজেই নিজের শত্রু, নিজেই নিজের বন্ধু। নিজের চেষ্টায় নিজেকে উদ্ধার ক'রতে হয়।

প্রফুল্ল—তা' যদি হয়, তাহ'লে গুরুর প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—ওরে পাগল! গুরু না হ'লে তোর টানটা ফেলবি কার উপর? টান তো বিলিয়ে দিয়েছিস্ প্রবৃত্তির উপর। সব দিয়ে-থুয়ে দেউলে সেজে ব'সে আছিস্। বাঁচা-বাড়ার সম্বল বেহাতি হ'য়ে আছে। এখন তারে হাতাবি কী ক'রে? ঐ জন্যই গুরু লাগে, যিনি কিনা প্রবৃত্তির অধীশ্বর হ'য়ে সত্তাসম্বর্দ্ধনায় স্বাধিষ্ঠিত আছেন। তাঁকে ভালবাসা ও পূরণ করা লাগে ভাল-মন্দ সব প্রবৃত্তি দিয়ে। তখনই ওগুলি কাবেজে এসে যায়। মূর্ত্ত সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে লক্ষ্য ক'রে আবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে ওগুলিও সত্তাসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে পেখম তুলে দাঁড়ায়। নানা প্রবৃত্তির নানামুখী দ্বন্দ্ব লোপ পেয়ে গিয়ে জীবনে আসে অপার শান্তি। প্রবৃত্তির জ্বলুনি, পুড়ুনি, রাহাজানি ও দাগাবাজীর হাত থেকে যে মুক্তি পায়, সে যে কতো আরাম পায়, তার কি লেখাজোখা আছে? তবে খুব সাবধানে থাকতে হয়। ইষ্টনিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হয়। ওটা ক্ষুণ্ন হ'লে প্রবৃত্তিগুলি আবার দৌরাত্ম্য সুরু ক'রে দেয়।

এরপর খবরের কাগজ পড়া হ'লো।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Disintegration is the ruler of the times (সংহতিহীনতাই বর্ত্তমানকালের নিয়ন্তা)।

লোকে দেবতার কাছে মানসিক করে। তার তাৎপর্য্য কী সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানসিক করার মধ্যেই থাকে কোন ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে থাকে দেবতার কাছে শক্তির জন্য প্রার্থনা ও তাঁর কাছে বাস্তবে কিছু উৎসর্গ করার সঙ্কল্প। দেবতার প্রতি এই উন্মুখতা মানুষের শরীর-মনের অন্তর্নিহিত সুপ্ত অবচেতন শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দিলে success (কৃতকার্য্যতা) easier (সহজতর) হ'য়ে ওঠে। তবে আমার মনে হয়, গোড়াতেই দেবতাকে যা' উৎসর্গ করাবার তা' ক'রে, অবিচল আগ্রহ নিয়ে সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য যা' করণীয় তা' করতে আরম্ভ ক'রলে মানসিক করার উদ্দেশ্য আরো ভাল ক'রে সিদ্ধ হয়। দেবতার সঙ্গে কোন condition (সর্ত্ত) করা ভাল না। ওতে ব্যবসা-দারীর মতো হয়। ফলে volitional flow (ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ) affected (ব্যাহত) হয়। আরো একটা কথা আছে—দেবকল্প যাঁরা, তাঁদের দিতে হয়।

কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে যদি আত্মোপভোগের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়, তাহ'লে ধীরে-ধীরে তাঁদের প্রতি সক্রিয় উন্মুখতা ক'মে যায়, প্রবৃত্তিবাহুল্যে মন বিক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে এবং করার urge (আকুতি) যা' কিনা মানুষকে উচ্ছল ক'রে তোলে তা' দিন-দিন দুর্ব্বল ও খোশখেয়ালী হ'য়ে ওঠে। এতে উন্নতি খতম হবার উপক্রম হয়। তাছাড়া, মানুষ যে-কোন source (উৎস) থেকেই পাক, নিজের আপ্রাণ করা দিয়ে যদি তাকে পরিপূরণ না করে, তবে সে, এমন-কি তার বংশাবলীও, inefficient (অযোগ্য) হ'য়ে উঠতে পারে। উৎসসেবী করা ও দেওয়ার মাত্রাটা যেখানে নেওয়ার মাত্রাটা ছাপিয়ে না ওঠে, সেখানেই pauperism (দারিদ্র্যব্যাধি) inevitable (অনিবার্য্য) হ'য়ে ওঠে। শ্রেয় গুরুজন নির্ব্বিবাদে তোমাকে দিয়েই যান এবং তোমার উপর কোন চাপ দেন না ব'লে যদি তাঁর প্রতি তোমার করণীয়-সম্বন্ধে তোমার বিবেক ভোঁতা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে ঐ নিথর বিবেক অজ্ঞাতসারে তোমাকে dishonest (অসাধু) ক'রে তুলবে। এখানকার কর্ম্মীদের অনেকেরই সেই দশা হ'য়ে উঠছে। তারা ভেবে দেখে না, তারা নেয়ই বা কতোখানি, আর আনে ও করেই বা কতোখানি। নেহাৎ পরমপিতার দয়ায় চ'লছে। না হ'লে চালানই কঠিন। তোমাদের এইরকম শিথিল চলন হ'লে আমি যা' চাই তার কিছুই হবে না। লোকের কোন প্রকৃত উপকার হ'তে পারবে না তোমাদের দিয়ে। তোমাদের মধ্যে ঋত্বিক্ যারা, তাদের আমি এত ক'রে বলছি ঋত্বিকীর উপর দাঁড়াতে। কিন্তু তোমরা সেদিকে খেয়ালই দিচ্ছ না। এই একটা কাজ ক'রতে পারলে দেখতে পাবে তোমরা নিজেরা কতোখানি বেড়ে উঠেছ এবং যজমানদেরও কতোখানি বাড়িয়ে তুলতে পেরেছ। ঋত্বিক্‌রা হ'লো দেশের লোকের মা-বাপ। তোমরা যদি মানুষের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জন্য হন্যে হ'য়ে না লাগ, তবে জাতিকে বাঁচাবে কে? এ কি গায় ফুঁ দিয়ে বেড়ানোর কাজ? দরদভরা দুরন্ত খাটুনি লাগে প্রতিটি মানুষের পিছনে, প্রতিটি পরিবারের পিছনে।

বিবাহ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা করলেন—সৎসঙ্গী একটি মেয়ে যদি সৎসঙ্গে দীক্ষিত নয় এমন কোন কুলীনের ঘরে পড়ে এবং সেখানে যদি তার মাছ রান্না ক'রতে হয়, সে কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপযুক্ত ঘরের সৎসঙ্গী ছেলে যদি পাওয়া যায়, তাহ'লে তো খুবই ভাল। নচেৎ সৎসঙ্গী খুঁজতে গিয়ে অশ্রেয় ঘরে মেয়ে দেওয়া চলে না। মেয়ের যদি নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও সেবাবুদ্ধি থাকে এবং তার চাল-চলন যদি ঠিক হয়, তবে সে যে-ঘরে পড়ে, তাদের সবাইকে নিজ ব্যবহার দিয়ে আকৃষ্ট ক'রে ইষ্ট ধরিয়ে দিতে পারে। শ্রেয়ঘরের মানুষ যারা, তাদের ভিতর ইষ্টগ্রহণ ও সদাচার পালনের সংস্কার থাকেই। কায়দামতো তাদের সত্তায় হাত দিতে পারলেই হয়। মেয়েরা দয়া-মায়া ও সেবাযত্নের ভিতর-দিয়ে এটা খুব ভালই পারে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সমাজে মেয়ে বেশী হ'লে জাতির longevity (দীর্ঘায়ু) denote (জ্ঞাপন) করে। সমাজের সর্ব্বস্তরে অনুলোম বিবাহের প্রচলন থাকলে automatically (আপনা থেকে) সমাজের গণ্ডী বেড়ে যায়। তবে সবর্ণ বাদ দিয়ে অনুলোম বিয়ে হওয়া ঠিক নয়।

প্রশ্ন উঠলো—মেয়েদের বহুবিবাহে দোষ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোষ অনেক রকমের আছে। তবে সব-চাইতে বড় দোষ এই যে, মেয়েদের মনে যদি বিভিন্ন পুরুষের ছাপ গভীরভাবে অঙ্কিত থাকে, তবে একটা মানসিক দ্বন্দ্ব তাদের পেয়ে বসে, মনের স্থিরতা থাকে না, কখনও একদিকে ঝোঁকে কখনও আর একদিকে ঝোঁকে। একজনের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হ'য়ে তাকে ছেড়ে হয়তো আর একজনকে ধরে। যাকে ধরে তার কাছে কোন অসুবিধা হ'লে তার প্রতি বিদ্বিষ্ট হ'য়ে অপরের কথা ভাবে। এইভাবে সহন-বহন ও একনিষ্ঠ ভালবাসাকে হারিয়ে ফেলে স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, পাগলাটে ও খেয়ালী হ'য়ে ওঠে, যা' কিনা অস্তিত্বরক্ষার পরিপন্থী। তার পেটে যদি কোন সন্তান হয়, সেও ঐ ধরণ পায়। তারা জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কোন চাপ পড়লেই সেখান থেকে তারা ছুটে পালাতে চায়। তারা মোটেই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হয় না। তারা কোন কাজেই লেগে থাকতে পারে না। কাটা-কাটা নানা গুণ থাকলেও ঐসব গুণ স্থায়ীভাবে কোন কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। এরা একমুহূর্ত্তে এক মানুষ আর-এক মুহূর্ত্তে আর-এক মানুষ। এদের নিয়ে চলাই কঠিন। সাধারণতঃ এরা হয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কিন্তু অনুরাগহীন। অন্যের জন্য কোন কষ্ট বা ত্যাগ এরা স্বীকার ক'রতে পারে না, কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এরা নিতে পারে না। এমনতর জাতকের সংখ্যা কোন জাতির মধ্যে যদি বাড়ে, তবে সে-জাতির ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারে না। শুনেছি, বহুপুরুষগামিনী বারবনিতার ছেলে হয় না। এতে indicate (সূচিত) ক'রেছে যে, প্রকৃতি এটা চায় না। It is against nature (এটা প্রকৃতির বিরুদ্ধে)। বললে খারাপ শোনায়, কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েদের বহুবিবাহ এক ধরণের prostitution (বেশ্যাবৃত্তি)। আর, এটাও ঠিক যে, একনিষ্ঠ সতীর পেটে ছাড়া একনিষ্ঠ সৎমানুষ জন্মায় না।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—সতীত্ব মানুষের জগতে যেমন কার্য্যকরী, মানুষের জগতের বাইরেও কি তা তেমন কার্য্যকরী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-নীতি হয়তো সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর কার্য্যকরী। কিন্তু যেখানে বোধশক্তির বিকাশ হয়নি, সেখানে standard (মানদণ্ড)-টা ঠিক করা যায় না ও তা' apply (প্রয়োগ)-ও করা যায় না।............আমার মনে হয়, একই মাটিতে ক্রমাগত নিত্যনূতন রকমারি জিনিসের বীজ বোনা ভাল নয়। তাতে মাটির productive adaptability (উৎপাদনী উপযোগিতা)-র উপর

দৌরাত্ম্য করা হয়। তাই ফলন ক'মে যায়। আমি দেখেছি এক জায়গায় খুব ভাল লাউগাছ হ'লো, লাউও খুব হ'লো, তারপর সেই আথালে ভাল বিলাতী কুমড়োর বীজ বোনা হ'লো, কিন্তু কুমড়োগাছ ভাল হ'লো না। পরে আবার কাঞ্চনগাছ বোনা হ'লো, কিন্তু কাঞ্চনগাছ হ'লোই না। এর অবশ্য নানা কারণ থাকতে পারে। তবে এটা অসম্ভব নয় যে মাটিরও হয়তো মন আছে, মেজাজ আছে, রুচি আছে। আর, তা' যদি আমাদের বোধের মধ্যে আসে, তবে কৃষি হয়তো আমরা আরো ভাল ক'রে ক'রতে পারবো।

৭ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ২৪। ৯। ১৯৪৭)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে আমতলায় একখানি ইজিচেয়ারে পশ্চিমাস্য হ'য়ে বসেছেন। আবহাওয়া এখন নাতিশীতোষ্ণ। বাইরে বেশ ভালই লাগে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। আশ্রম-প্রাঙ্গণ আলো-ঝলমল। তারার মালা জেগে উঠেছে আকাশে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার শব্দের মতো এক ধরণের শব্দ ভেসে আসছে দারোয়ার ঐ ওপার থেকে। শান্ত, মধুর, মায়াময় পরিবেশ। শ্রীশ্রীঠাকুর কী যেন ভাবছেন। অল্প কয়েকজন কাছে আছেন। তাঁরাও বিশেষ কোন কথা বলছেন না। এমন সময় দেওঘরের সেকেণ্ড-অফিসার এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বেড়াতে আসলেন। তাঁদের বসতে দেওয়া হ'লো। সেকেণ্ড-অফিসারটি ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি বাংলা জানেন না, ইংরাজীতে কথা বলছিলেন। প্রফুল্ল তাঁর ইংরেজী কথার বাংলা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বাংলা কথার ইংরেজী তর্জ্জমা ক'রে দিচ্ছিলেন। তিনি ভারতীয়দের বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভারতীয় আর্য্যরা পূর্ব্বতন প্রত্যেকটি মহাপুরুষকে, পিতৃপুরুষকে ও পিতৃকৃষ্টিকে স্বীকার করে, আরো স্বীকার করে পূর্ব্বপুরয়মাণ বর্ত্তমান মহাপুরুষ যিনি তাঁকে। আর্য্যবাদে কোন community (সম্প্রদায়) বাদ পড়ে না। তাদের মতে ধর্ম্ম এক, ভগবান এক, প্রেরিতরা এক, কোরান, গীতা, বাইবেল এক। Difference (পার্থক্য) হ'তে পারে না, কারণ সব-কিছু একেরই message (বাণী)। ভাইয়েদের মধ্যে বিরোধ আসে তখনই, যখন তারা practically (কার্য্যতঃ) পিতাকে স্বীকার করে না। প্রত্যেকটা মানুষ এক-একটা community (সম্প্রদায়) হ'লেও কিছু আসে-যায় না, যদি পিতৃপুরুষ, পিতৃকৃষ্টি, পূর্ব্বতন মহাপুরুষ, বর্ত্তমান মহাপুরুষ ও পরবর্ত্তী মহাপুরুষকে স্বীকার করার বুদ্ধি থাকে। পরমপিতাকে ভালবাসব, প্রেরিতকে ভালবাসব অথচ ভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ হ'লেই তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ক'রবো —এর মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। ঈশ্বর সকলেরই যেমন একজন ছাড়া দুইজন নেই, বিভিন্ন প্রেরিতপুরুষও তেমনি মূলতঃ একজনই। কারণ, একই ঈশ্বরের

প্রেরিত তাঁরা। কোন প্রেরিতপুরুষকে অস্বীকার করা মানে ঈশ্বরকে ও নিজের প্রেরিতপুরুষকেও অস্বীকার করা। কোন মানুষের প্রতি দ্রোহবুদ্ধি পোষণ করা মানেও ঈশ্বরের প্রতি দ্রোহবুদ্ধি পোষণ করা। কারণ, এমন কোন মানুষ নেই, যার ভিতর সত্তা ব'লে কিছুই নেই, আবার এমন কোন সত্তা নেই যা' ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত উদ্ভূত হয়েছে। যে-মানুষ যেমনতরই হো'ক, পরমপিতার কাছে, পরমস্রষ্টার কাছে কেউই হেয় নয়। পরমপিতাকে ভালবাসব অথচ তাঁরই সৃষ্ট মানুষকে ঘৃণা ক'রবো, এতে কখনও তাঁকে ভাল করা যাবে না। আপনাকে ভালবাসি অথচ আপনার ছেলেটাকে দু'চোখ প'ড়ে দেখতে পারি না, একি কখনও হয়? না, তাতে আপনার মন পাওয়া যায়? তাই আমরা ঈশ্বরকে বা প্রেরিতপুরুষকে ভালবাসলে জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে মানুষকে ভালবাসতে বাধ্য। সেই ভালবাসা যেখানে নেই সেখানে ঈশ্বরানুরাগও নেই। তবে অসৎ যারা তাদের বিকৃত চলনের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়—তা' তারা যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্তই হো'ক না কেন। আর, এই প্রশ্রয় না-দেওয়াটা ভালবাসারই লক্ষণ।

সেকেণ্ড অফিসার—রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন আমরা মানুষের ধর্ম্মানুরাগের সুযোগ গ্রহণ ক'রতে চাই, তখনই হয় গোলমালের সূত্রপাত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Politics fulfils life and growth (রাজনীতি বা পূর্ত্তনীতি জীবন ও বৃদ্ধিকে পরিপূরণ করে)। যা' life and growth-কে (জীবন ও বৃদ্ধিকে) disintegrate ও deteriorate (বিখণ্ডিত ও অপকর্ষী) করে, তা' politics (রাজনীতি বা পূর্ত্তনীতি) নয়। Society-তে (সমাজে) অনেক community (সম্প্রদায়) থাকতে পারে, প্রত্যেক community (সম্প্রদায়) religious (ধার্ম্মিক) হ'লে পরস্পর পরস্পরের প্রতি physically and with heart (শরীর ও অন্তর দিয়ে) interested (স্বার্থান্বিত) হ'য়ে উঠবেই। Nothing but religion can save us (ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই আমাদের রক্ষা ক'রতে পারে না)। যতই আমরা খোদার দিকে adhered (অনুরক্ত) হব, ততই আমরা সব জাতি, সব দেশ, সব সম্প্রদায় নিয়ে বজ্রবাঁধনে আবদ্ধ হব, কেউ ভাঙ্গতে পারবে না সে-বাঁধন।

সেকেণ্ড অফিসার—পাশ্চাত্য জগৎ তো আজ অনেকটা ঈশ্বরবিমুখ। তারা জড়বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। এবং তার দ্বারা জাগতিক ব্যাপারে উন্নতিও ক'রেছে খুব। তাদের সম্বন্ধে আমাদের কি কিছু করণীয় আছে? তারা যদি আধ্যাত্মিকভাবে ভাবিত হয়, তবে সারা জগৎকে সহজেই প্রভাবিত ক'রতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কথা বললাম, ঐ truth (সত্য) actively (সক্রিয়ভাবে) পরিবেষণ ক'রতে হবে সর্ব্বত্র। সেই-ই আমাদের mission (উদ্দেশ্য)। আপনার ভালকে উপেক্ষা ক'রে আমার ভাল হ'তে পারে না, আমার ভালকে উপেক্ষা ক'রে আপনার ভাল হ'তে পারে না। তাই inter-interested

(পরস্পর স্বার্থান্বিত) হওয়া নিজের interest (স্বার্থ) fulfil (পরিপূরণ) করার জন্যই প্রয়োজন। Independence (অনধীনতা) কথার মানে ঠিক বুঝতে পারি না। কারণ, কাউকে বাদ দিয়ে কেউ দাঁড়াতে পারে না। প্রত্যেকেই dependent on others (অন্যের উপর নির্ভরশীল)। Birth itself is dependent on parents (জন্ম জিনিসটাই বাপ-মা'র উপর নির্ভরশীল), বেঁচে থাকাটাও অমনি। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আছেই। কিন্তু প্রত্যেককে তার যোগ্যতা এতখানি বাড়াতে হবে, যাতে পরিবেশের কাছ থেকে নেওয়ার তুলনায় পরিবেশকে তার দেওয়া হয় বেশী। এটা অবশ্য প্রত্যেকের তার নিজস্ব রকমে। ভালবাসার দায়ে যখন মানুষ এমনতর যোগ্য হ'য়ে ওঠে, তখন তাকে freedom (স্বাধীনতা)-এর উপযুক্ত ব'লে বলা যায়। Freedom (স্বাধীনতা) মানে প্রিয়ের বাড়ীতে প্রীতি-সম্পর্ক নিয়ে পরস্পর-পরস্পরের এবং সর্ব্বোপরি প্রিয়ের প্রীতিপাত্র হ'য়ে বসবাস করার অবস্থা। দুনিয়াটা প্রিয়তম পরমপিতার বাড়ী। এইটে স্মরণ রেখে পরস্পর-পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সেবার মনোভাব নিয়ে চ'লতে হবে। নিজের পরিবার, পরিবেশ, সমাজ ও দেশকে যেমন ভালবাসতে ও সেবা ক'রতে হবে, নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে আশপাশের অন্যান্য সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্যও তেমনি সাধ্যমতো ক'রতে হবে। এই ব্যাপারে প্রধান করণীয় হ'চ্ছে ধর্ম্মদান অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার নীতি সঞ্চার। এই ক'রতে গিয়ে আমরা কারও বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্যে আঘাত ক'রবো না, বরং তাকে আরো উচ্ছল ক'রে তুলবো।

সেকেণ্ড অফিসার—চেষ্টা ক'রলেই কি মানুষকে ধর্ম্মপ্রাণ ক'রে তোলা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের চরিত্র ও আচরণে যদি ধর্ম্ম ফুটে ওঠে, তবেই আমরা ধর্ম্ম সঞ্চারণার যোগ্যতা লাভ করি। বাঁচতে চায় না, বৃদ্ধি পেতে চায় না, এমন মানুষ খুব কম। কিন্তু obsession (অভিভূত)-এর দরুন অনেকেই চলে উল্টো পথে। ও একরকমের disease (রোগ)। মানুষের শরীর রুগ্ন হ'লে, তাকে সুস্থ ক'রে তোলার জন্য আমরা কত চেষ্টা করি। কিন্তু passionate (প্রবৃত্তিপরায়ণ) চলনরূপ মহাব্যাধি যে মনুষ্য সমাজকে ক্ষয় ক'রে দিচ্ছে, তার চিকিৎসার জন্য আমরা কী করছি ? আগেই বা কী ক'রেছি ? আর, ভগবানকে যদি ভালবাসি, তাঁর জন্য তো কিছু করা লাগে। কিছু অন্ততঃ করি। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কাজ হ'চ্ছে যাজন। এ-বড় সুখের কাজ। এতে ভগবানও প্রীত হন, নিজেও প্রীত হওয়া যায়, মানুষকেও প্রীত ক'রে তোলা যায়, আবার সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশকে নিয়ে নিজে শাতনের হাত থেকে পরিত্রাণলাভের সুযোগ পাওয়া যায়। শাতন মানে, যে আমাদের নাকি পতন, পাতন, ছেদন, ক্ষয় ও বিনাশ ঘটায়। মানুষ যখন ভক্তিযুক্ত চিত্তে যাজনে রত থাকে তখনকার মতো অন্ততঃ সে ও যাজিত উভয়েই শাতনের হাত থেকে রেহাই পায়। তাই যজন, যাজন

যত বেশী চলে ততই সমাজের আবহাওয়া পবিত্র হয়। কেউ যদি সর্ব্বদা ঐ কামে লেগে থাকে, ধীরে-ধীরে সে দেবতুল্য স্বভাব পায়। ওর সঙ্গে আর একটা কাজ আছে সেটা হ'লো ইষ্টভৃতি। রোজই ভগবানের উদ্দেশ্যে বাস্তবে কিছু নিবেদন ক'রতে হয়। এতে ভগবানের 'পর, ইষ্টের 'পর টান খুব বেড়ে উঠতে থাকে। ইষ্টকেন্দ্রিক এই আগ্রহসন্দীপ্ত দৈনন্দিন করাগুলিকে অবলম্বন ক'রে ধর্ম্ম জাগ্রত হ'য়ে ওঠে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে। নইলে ধর্ম্ম কথার কথামাত্র থেকে যায়। তা' প্রতিষ্ঠা লাভ করে না মানুষের জীবনে। ধর্ম্ম মানে that which upholds the life and growth, being and becoming of every individual with his environment (তাই যা' পরিবেশ-সহ প্রতিটি ব্যক্তির জীবন ও বৃদ্ধিকে ধারণ করে)। আমরা পরিবেষণ ক'রছি শয়তানকে, ভগবানকে তো পরিবেষণ ক'রছি না, তাই দুর্দ্দৈব। মানুষ যখন মানুষের ক্ষতি করে, মানুষ যখন মানুষকে মারে, তখন সে যে নিজের কতখানি ক্ষতি করে, নিজেকে কতখানি মারে—তা' সে বোঝে না। এই অজ্ঞতার নিরসন ক'রতে হবে। মানুষের চোখ দু'টো খুলে দিতে হবে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। অক্লান্তভাবে তা' যারা ক'রবে ঈশ্বরের প্রীতিচুম্বন তাদের অমৃত-অভিসিঞ্চিত ক'রে তুলবে।

আবেগের সঙ্গে উদাত্তকণ্ঠে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একবার কাসি আসলো। প্যারীদা (নন্দী) ছিলেন পাশে। তিনি জল দিলেন। জল পান ক'রে আবার বলতে লাগলেন তিনি—হিন্দু-মুসলমান সকলেরই যেমন আছে ব্যক্তিগত সাধনা, তেমনি আছে সমষ্টিগত প্রার্থনা। আমি বুঝি না—কোন হিন্দু শুচিশুদ্ধভাবে মস্‌জিদে যেয়ে প্রার্থনা ক'রতে পারবে না কেন, আবার একজন সদাচারী মুসলমান হিন্দুর প্রার্থনা-মন্দিরে ব'সে প্রার্থনা ক'রতে পারবে না কেন! ভগবান মানুষকে তার language (ভাষা) দিয়ে চেনেন না, তিনি চেনেন তাকে তার feeling (বোধ) ও activity (কর্ম্ম) দিয়ে। তাই তিনি যা' অনুমোদন ক'রেন, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে মানুষ তা' অনুমোদন ক'রবে না কেন?

সেকেণ্ড অফিসার পুনরায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা-সম্পর্কে কথা তুলে বললেন—মহাপুরুষদের কথার মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই, তা' ঠিক। তবু দেখা যায়, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিরোধ কিছুতেই যায় না। শোনা যায়, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা নিরাপত্তা-সম্বন্ধে শঙ্কিত হ'য়ে দলে-দলে দেশ ছেড়ে চ'লে আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাজের বুকে, রাষ্ট্রের বুকে বাস ক'রে কোন সৎলোক যদি নিজেকে নিরাপদ ব'লে মনে না ক'রতে পারে, তবে সেটা সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে কলঙ্ক। Independence (স্বাধীনতা) যদি পেয়ে থাক, তবে তোমার রাজা আমি, আমার রাজা তুমি, আমার life, faith ও property (জীবন, ধর্ম্ম ও সম্পত্তি) রক্ষা করা তোমার কাজ, তোমার life, faith ও property

(জীবন, ধর্ম্ম ও সম্পত্তি) রক্ষা করা আমার কাজ। Independence (স্বাধীনতা) মানেই হ'লো inter-dependence ও inter-interestedness (পরস্পর নির্ভর-শীলতা ও পরস্পর স্বার্থ-সম্বন্ধতা। জনসাধারণের মধ্যে যদি এই বোধ সক্রিয় না হ'য়ে ওঠে, তাদের educated (শিক্ষিত) ক'রে যদি এই চলনে অভ্যস্ত না ক'রে তোলা যায়, তবে independence is a mere show (তবে স্বাধীনতা একটা মিথ্যে ভাঁওতা)।

সেকেণ্ড অফিসার—শিক্ষিত লোক যারা, তারাই তো দেখা যায় লোকের বেশী ক্ষতি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের শিক্ষিত বলে না। শিক্ষিত বলতে বুঝতে হবে তাদের যাঁরা নিজেরা বাঁচার পথে চলে ও অন্যকেও বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই বুদ্ধি যাদের নেই, তারা আবার শিক্ষিত কিসের? দু'কলম লিখতে-প'ড়তে জানলেই তাকে শিক্ষিত কয় না। ইষ্টার্থী সেবাবুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে লোকবর্দ্ধনী অভ্যাস, ব্যবহার ও যোগ্যতা অর্জ্জনই শিক্ষার প্রধান কথা।

প্রফুল্ল—আপনার ছড়ায় আছে ঃ—

মুখে জানে ব্যবহারে নাই
সেই শিক্ষার মুখে ছাই।
অভ্যাস-ব্যবহার ভাল যত
শিক্ষাও তার জানিস তত।

আরো আছে—

ইষ্টপ্রাণ জনসেবা
কর্ম্ম তৎমননে,
এই তো শিক্ষার মূল
রাখিও স্মরণে।

ছড়াগুলি ইংরেজীতে তর্জ্জমা ক'রে দেওয়ার পর সেকেণ্ড অফিসার বললেন—অপূর্ব্ব। এমন ছাড়া আরো আছে নাকি?

প্রফুল্ল—নানা বিষয়ে সহস্র-সহস্র ছড়া বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আপনার যদি শুনতে ইচ্ছা হয়, খাতা এনে আপনাকে শোনাতে পারি। অবশ্য ইংরেজীতে যে ব্যাখ্যা আমি ক'রতে চেষ্টা ক'রবো, তার মধ্য-দিয়ে মূল জিনিসের পুরো রসটা আপনি পাবেন না।

সেকেণ্ড অফিসার—যদি অসুবিধা না হয়, কিছু শোনান।

তারপর খাতা এনে শোনান হ'লো—

বৈশিষ্ট্যটি ক'রে নাকাল
হ'লি কতই বিদ্যাবান,
শিখতে গিয়ে সাজলি খোজা
জনম-ছাপটি করলি ম্লান।
ঈর্ষ্যা, আক্রোশ, হীনত্বেতে
করলি শিক্ষার উদ্বোধন,
প্রকৃতি তোর নীচুই রইল
আরো নীচু জীবন-মন।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে শোনান হ'লো—

অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে
ধর্ম্ম বলে' জানিস তাকে।
ধর্ম্মে সবাই বাঁচে-বাড়ে
সম্প্রদায়টা ধর্ম্ম না রে।
ধর্ম্মে জীবন দীপ্ত রয়
ধর্ম্ম জানিস একই হয়।
প্রেরিত যে প্রভেদ করে
অন্ধতমোয় সাবাড় করে।
পূর্ব্বতনে মানে না যারা
জানিস নিছক ম্লেচ্ছ তারা।

বুদ্ধ-ঈশায় বিভেদ করিস
শ্রীচৈতন্য রসুল কৃষ্ণে,
জীবোদ্ধারে আবির্ভাব হন
একই ওঁরা তাও জানিস নে?
ধর্ম্ম যদি নাই ফুটলো তোর
সংসারের প্রতি কর্ম্মে,
বাতিল ক'রে রাখলি তারে
কী হবে তেমন ধর্ম্মে?
কর্ম্ম মাঝে ধর্ম্মকে যে
পালন ক'রতে পারল না,
ধর্ম্মে-কর্ম্মে আনল বিভেদ
পদে-পদে পায় সে লাঞ্ছনা।

ইষ্টস্বার্থ-পথে চ'লে
নিজের বাঁচাবাড়ার ধাঁজে
রাখলে অন্যের বাঁচাবাড়ায়—
ধর্ম্ম থাকে চেতন সাজে।
ধর্ম্ম যেখানে বিপাকী বাহনে
ব্যর্থ অর্থে ধায়,
তখনি প্রেরিত আবির্ভূত হন
পাপী পরিত্রাণ পায়।
ইষ্টীচলন থাকেই যদি
রুখবে না তোর দুর্গতি,
দুর্গতি সব দুর্গ হ'য়ে
আনবে জয়ে উন্নতি।
পরের ইষ্টে নিন্দা ক'রে
হলি ইষ্টনিষ্ঠ,
নিজেরই পা ভাঙ্গলি নিজে
বুঝলি না পাপিষ্ঠ!

এইরকম আরো বহু ছড়া প'ড়ে শোনান হ'লো।

সেকেণ্ড অফিসার শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে বললেন—এগুলি জ্ঞানের খনি। এর তুলনা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিনম্রভাবে বললেন—আমি মূর্খ। আমি কিছু জানি না। ভুল-চুক থাকলে ঠিক ক'রে দেবেন আপনারা।

সেকেণ্ড অফিসার শ্রদ্ধাভরে বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে।

আবার ধর্ম্ম ও রাজনীতি-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Freedom (স্বাধীনতা) না হ'লে হবে না। Freedom (স্বাধীনতা)-এর মধ্যে অনুস্যূত আছে প্রীতিপ্রাণতা। পরমপিতার প্রতি ভালবাসায় মানুষ যদি মানুষের আপন না হয়, বান্ধব না হয়, তবে লাখ রাষ্ট্রীয় অধিকারেও মানুষের কিছু হবে না। সেখানেও চ'লবে স্বার্থের কামড়া-কামড়ি। প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার ক'রবে। দুর্ব্বল প্রবলের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে। পাকিস্তানের আগে সাকীস্থান হওয়া চাই। সাকীস্থান ব'লতে আমি বুঝি, পারস্পরিক প্রীতি-সমন্বিত পরিবেশ। ঋষি-পারম্পর্য্য নষ্ট হ'লে disintegration (ভাঙ্গন) এসে পড়ে সমাজে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল না হ'য়ে অমিল হয়। রসুল ও যীশুখ্রীষ্টের পরিবেষণ আমাদের দেশে ঠিকমতো হয়নি। হিন্দুদের কাছে তাঁদের কথা এমনভাবে ধরা হয়েছে,

যাতে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তাঁদিগকে Fulfiller (পরিপূরক) ব'লে বুঝতে পারেনি। মহাপুরুষকে বিকৃতভাবে পরিবেষণ করা একটা পাপ। ঠিকভাবে পরিবেষণ ক'রলে দেখা যায়, স্ব-স্ব সত্তাপোষণী কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে প্রত্যেকটি মানুষ সদ্‌গুরুনিষ্ঠ হ'য়ে সকল মহাপুরুষের প্রতিই নতি নিয়ে চ'লতে পারে। হজরত রসুল-সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তাঁর এক হাতে কোরান, এক হাতে তরবারি'। যেন তিনি ভয় দেখিয়েই ইসলাম গ্রহণ ক'রতে বাধ্য করেছেন সকলকে। এটা বাজে কথা। তাঁর জীবন কত করুণাময়, কত স্নেহময়—তিনি কেমন খোদা-অন্তপ্রাণ, মানুষের কত বড় দরদী বান্ধব তিনি। ধর্ম্ম কেমন সহজ ও সুন্দরভাবে তাঁর জীবনে মূর্ত্তি পেয়েছিল, সে-সব কথা কেউ কয় না। শুনতে পাই এমন কথাও নাকি তিনি বলেছেন, যদি কেউ বিদ্বেষ-বশতঃ অমুসলমানের রক্তপাত করে, সে আমারই রক্তপাত করে। রোজকিয়ামতের সময় তার কঠোর বিচার হবে। আর্য্যদের মতো সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তীকে স্বীকার করেছেন—with great ovation (পরম সম্মাননায়) কতজনের নাম করেছেন, সকলের নাম ক'রতে পারেননি। তাঁর মতে, পিতৃপুরুষকে যে অস্বীকার করে, সে ফেরেস্তা ও ভগবানের বিরুদ্ধে যায়। এমনতর কত কথা আছে তাঁর। মনে হয়, আবহমান কাল থেকে যে-ধর্ম্মের ধারা বইছে জগতে তিনি তারই একজন মহান ধারক ও বাহক। পরমপিতার প্রেরিত যিনি, তিনি সে-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারেন কী ক'রে তাও আমি বুঝতে পারি না। এ-হেন হজরতকে ভালবাসতে গেলে পিতৃপুরুষকে কেন অস্বীকার ক'রতে হবে, নাম কেন বদলাতে হবে, তা' তো আমার মাথায় ধরে না। মৈনুদ্দীন চিস্তী কামেলপীর ছিলেন। তাঁর হিন্দু disciple (শিষ্য)-ও ছিল, মুসলমান disciple (শিষ্য)-ও ছিল। কই, হিন্দুকে তো তিনি মুসলমান হ'তে বলেননি। কতো হিন্দু সিদ্ধপুরুষ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে সাধনার পথ বাতলে দিয়েছেন। তাঁরা মুসলমান বা খ্রীষ্টানকে তো বলেননি—তোমরা হিন্দু হও। যে হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে খাঁটি হিন্দু হ'তে পারে না, সে ইসলামে ধর্ম্মান্তরিত হ'য়ে খাঁটি মুসলমানও হ'তে পারে না। ধর্ম্ম চিরকালই এক। ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছু ধর্ম্ম হয় না। কোন scripture-এ (ধর্ম্মশাস্ত্রে) hatred (ঘৃণা) নেই, শয়তানের scripture-এ (ধর্ম্মশাস্ত্রে) ছাড়া।

সেকেণ্ড অফিসার—মানুষের এই দুষ্টবুদ্ধির অবসান হবে কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—শুভবুদ্ধির সঙ্গে বেঁধে ফেলতে হয় নিজেকে। অর্থাৎ, শুভবুদ্ধির মূর্ত্ত প্রতীক-স্বরূপ একটি মানুষ চাই। আর, তাঁর সঙ্গে বেঁধে ফেলতে হয় নিজেকে অচ্ছেদ্য ভালবাসার বাঁধন দিয়ে। একেই বলে গুরুকরণ। প্রকৃত তত্ত্ববেত্তা আচরণসিদ্ধ আচার্য্য বা গুরু যিনি, তিনি হ'লেন সর্ব্বময়। তাঁর মধ্যে পূর্ব্বতন সবাই জাগ্রত থাকেন। আর্য্যদের মধ্যে

অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কোন পূরয়মাণ ঋষিকে বাদ দেওয়ার উপায় নেই। দিলেই পাতিত্য এসে যাবে। হিন্দু যদি রসুলকে বা যীশুখ্রীষ্টকে মহাপুরুষ ব'লে স্বীকার না করে, সেটা তার পক্ষে অপরাধ। অন্যদের পক্ষেও এমনতর। আমরা অনেক গোঁজামিল দিয়ে চলি। কোরানে আছে, জীবের রক্তমাংস ভগবানে পেঁছায় না। যা' ভগবান গ্রহণ করেন না, তা' আমরা খেতে যাব কেন? আবার শুনেছি, রসুল খাদ্য-হিসাবে দুধ, শাকসব্জী ও ফল ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার তাৎপর্য্যটা আমরা বুঝতে চেষ্টা ক'রব না কেন? আহার-বিহার ইত্যাদি সাত্ত্বিক না হ'লে শরীর ও বুদ্ধিও বিগড়ে যায়। বিয়ে-থাওয়াও ঠিকমতো হওয়া লাগে। নইলে বংশধারা ঠিক থাকে না। আর, মানুষ যাতে ধর্ম্মের তত্ত্ব অবিকৃতভাবে জানতে পারে, তার ব্যবস্থা করা লাগে। আমার মনে হয়, হিন্দু যদি স্বধর্ম্মে সুনিষ্ঠ থেকে নিত্য যাজনের অঙ্গ হিসাবে রসুলকে পরিবেষণ করে, আবার মুসলমান যদি রসুল-ভক্তি অক্ষুণ্ণ রেখে হিন্দু প্রেরিতপুরুষদের জীবন ও বাণী যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করে, তাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও শুভবুদ্ধি tremendous (প্রবল) হ'য়ে উঠতে পারে। কবীর, মৌলানা রুম, নানক, মৈনুদ্দীন চিস্তী প্রমুখের কথা যখন ভাবি, তখন শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হ'য়ে আসে। আমি সর্ব্বদা খোদাতালার কাছে প্রার্থনা করি—লোকের শান্তির জন্য খোদা এমনতর ইমাম যেন পৃথিবীতে পাঠান, যিনি সেই পরম অমৃত পরিবেষণ ক'রে-ক'রে মানুষকে কেবলই শুচি ক'রে তুলবেন।...............এই মানুষকে সৃষ্টি ক'রতে লোকজনকের কতো পরিশ্রম ক'রতে হয়েছে, কতো কষ্টে পালন-পোষণ ক'রেছেন এদের সেই আদিমকাল থেকে। আর, শয়তান একটা ফুঁ দিয়ে মানুষের জীবন, সভ্যতা ও কৃষ্টিকে ভেঙ্গে দিয়ে যাবে, তাও কি কখনও হয়?

রাত বেড়ে চলেছে। কিন্তু এমনই একটি মধুময় দিব্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যে, তার আকর্ষণ উপেক্ষা ক'রে কারও যেন ওঠার ক্ষমতা নেই।

সেকেণ্ড অফিসার ভাবাবিষ্টের মতো বললেন—আমার কিছু বলার ছিল না। শুধু আপনার কথা শুনব ব'লে এসেছিলাম। আপনার অমূল্য উপদেশ পেয়ে আজ আমি ধন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি পাগলের মতো বকলাম।

সেকেণ্ড অফিসার—'না! না!' তারপর একটু থেমে গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন—আমি বিশ্বাস করি দুর্দ্দিন কেটে যাবে। আপনার কথায় এই বোধটাই বিশেষ ক'রে মনে জাগলো—পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু করবার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা সবাই তাঁর সন্তান। তাঁকে follow (অনুসরণ) করাই আমাদের ধর্ম্ম। That is our existence (সেই-ই আমাদের অস্তিত্ব)।

এরপর উনি আবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলেন। অনেকেই ধীরে-ধীরে গাত্রোত্থান ক'রলেন।

উনি চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা ক'রলেন—বেলয় কিছু কইনি তো?

উপস্থিত সকলেই একবাক্যে বললেন—আপনার কথা ভদ্রলোকের খুব ভাল লেগেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকটি ভাল।

৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৫। ৯। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), গোপেনদা (রায়), বীরেনদা (মিত্র), রাজেনদা (মজুমদার), যতীনদা (দাস), বিজয়দা (রায়), হরেনদা (বসু) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত আছেন। হরেনদার উপর আজকাল আনন্দবাজারের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—সবার খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হ'চ্ছে তো?

হরেনদা—আজ্ঞে, আপনার দয়ায় সবই ঠিকমতো চ'লছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখিস্, যেন কারও কষ্ট না হয়। আর, রোহিণী রোডে রাত্রে ঠিকমতো পাহারা যেন দেওয়া হয়। যে-রকম চোরের উপদ্রব শুনি, রাত্রে ঠিকমতো পাহারা না দিলে মুশকিল।

হরেনদা—পাহারাও দেওয়া হ'চ্ছে।

এরপর আনন্দবাজার পত্রিকা প'ড়ে শোনান হ'লো।

কোন একটি সংবাদের প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নেতাদের দোষ কিছু নয়। কথা হ'লো wise conduct (সুধী চলন) নেই, wisely conducted (সুধীপন্থায় চালিত) নয় ব'লে। যে conducted (চালিত) নয়, যার urge and energy (আকুতি এবং শক্তি) conducted (চালিত) নয় by love (ভালবাসার দ্বারা), সে whimsical (খামখেয়ালী) হ'তেই পারে। আচার্য্যহীন নেতা অমৃত-কথার বস্তা ফেলে দিলেও মানুষ তা' নিতে পারে না। মানুষ অনুসরণ ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে ছাড়া কিছুই আয়ত্ত ক'রতে পারে না। আর, এই অনুসরণ ও অনুশীলনের আগ্রহটা imparted (সঞ্চারিত) হ'তে পারে না মানুষের ভিতর, যদি নেতা সুনীত না হন।

বহিরাগত একটি দাদা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—গুরুর শক্তিসঞ্চার ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষাদানকে যদি শক্তিসঞ্চার বল, তা' বলতে পার। তা'ছাড়া শক্তিসঞ্চার ব'লে আমি কিছু বুঝি না। মানুষ যদি সদ্‌গুরু পায়, আর তাঁর উপর অগাধ টান হয়, তাই-ই তাকে শক্তি জোগায়। গুরু লাখ ভালবাসুন

শিষ্যকে, তাতে শিষ্যের কানাকাড়ি শক্তি জাগবে না, যদি শিষ্যের নেশা না জাগে গুরুর ইচ্ছা পূরণ করতে। তাঁর প্রতি adherence ও love (নিষ্ঠা ও অনুরাগ) না থাকলে, তাঁর জন্য কিছু ক'রতে গেলেই কষ্ট হবে। ভাববো, খামাকা খেটে মরছি, আমার লাভ কী এতে? কিন্তু প্রেয়সী যদি কিছু চায়, তাকে তা' না দিতে পারলেই প্রাণ ছটফট করে। প্রাণের দায়ে ছুটি তখন। কষ্ট ক'রেও তার ইচ্ছা পূরণ ক'রতে পারি যখন, তখন মনে হয় সব কষ্ট সার্থক। এইতো কর্ম্মশক্তির মামলোৎ। গুরুর উপর অমন টান যদি হয়, তার কি আর কিছু আটকায়? হনুমানের মতো গন্ধমাদন ঠেলে নিয়ে আসে, সূর্য্যকে বগলদাবা ক'রে ফেলে। কত সব অশৈলী কাণ্ড যে করে, তার কি শেষ আছে? শিষ্য যদি unwilling (অনিচ্ছুক) ও self-centric (আত্মস্বার্থী) হয়, তবে গুরুর কোন command (আদেশ) যদি হয়, তাতে সে কষ্টবোধ করে, resent করে (রুষ্ট হয়)। সে-অবস্থায় শক্তির সাক্ষাৎ পাবে কী ক'রে? সেইজন্য শিশুকালে চূড়াকরণ করা লাগে, সে যাতে ভবিষ্যতে গুরু-সর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠে, হাবে-ভাবে, গল্পে-গুজবে, কাজে-করণে impulse (প্রেরণা) দিয়ে তার মনকে তেমনি রঙিল মাতাল ক'রে প্রস্তুত ক'রে তুলতে হয়। Family-environment (পারিবারিক পরিবেশ) ঐটুকু ক'রে দিলে যার যেমন instinct (সহজাত-সংস্কার), সে সেইভাবে receive (গ্রহণ) করে। এর ভিতর-দিয়েই ability (শক্তি) unfold (আত্মপ্রকাশ) করে। তবে মাতৃভক্তিই হ'চ্ছে greatness (মহত্ত্ব)-এর আদিম আসন। চাণক্যের সামনের দাঁত দু'টো উঁচু ছিল। জ্যোতিষী তা'র মাকে বলেছিল, ঐটে নাকি রাজলক্ষণ। মা তাঁকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন—তুমি তো একদিন আমাকে ভুলে যাবে। চাণক্য বললেন—কেন? মা বললেন—তোমার সামনের দাঁত দু'টো নাকি রাজলক্ষণ সূচিত করে। রাজা হ'লে তোমার কি এই গরীব মায়ের কথা মনে থাকবে?—এই কথা শোনামাত্র চাণক্য কোন কথা না ব'লে নোড়া দিয়ে দাঁত দু'টো ভেঙ্গে ফেললেন। দর-দর ক'রে রক্ত প'ড়তে লাগল। মা তো বেকুব! এ-কি পাগল ছেলে! ছেলে বলে—দাঁত থাকলে যদি রাজা হ'তে হয়, আর রাজা হ'লে যদি তোমাকে ভুলতে হয়, তার মূল আমি মেরে দিলাম।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের দেশে তো বহু বিজ্ঞ লোক আছেন, তৎসত্ত্বেও দেশের দুরবস্থা ঘোচে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না করলে কি কিছু হয়? যেমন করি, যেমন চলি, ফলও তেমনি ফলে। আমরা পণ্ডিতের মতো উপদেশ দেই—হ্যান কর, ত্যান কর, কিন্তু জানি না কোথায় কী ক'রতে হবে, কিভাবে চ'লতে হবে। রামদাস স্বামী বলেছেন—"অনেক বিদ্যা শিখিল, প্রসঙ্গ না বুঝিল, সে-বিদ্বানে পোছে কেবা?" স্থান, কাল, পাত্রানুযায়ী বিদ্যার প্রয়োগ কিভাবে ক'রতে হয়, তা' যদি কেউ

না জানে, তবে তার বিদ্যা নিষ্ফল হ'য়ে যায়। আবার শুধু জানলে-বুঝলে হবে না, বিধিমাফিক করা চাই। করার আবেগ প্রবল হয় না, যদি ভালবাসা না থাকে। আমি বুঝি মানুষমাত্রেই সচ্চিদানন্দের প্রতীক। সে বাঁচতে চায়, চেতন থাকতে চায়, বৃদ্ধি পেতে চায়। সৎ-মানে অস্তিত্ব, চিৎ-মানে চেতনা, আনন্দ-মানে বৃদ্ধি। যাতে এই জিনিসগুলি nurture (পোষণ) পায়, তাকেই বলে ধর্ম্ম। তার জন্য লাগে আচার্য্য। সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহই হ'লেন প্রকৃত আচার্য্য। তাঁর চলা, বলা, ভাবা, করা, অস্তিত্ব, চেতনা ও বৃদ্ধির সুরে বাঁধা। তা' থেকে কখনও নড়চড় হয় না তাঁর। তাই, মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে হয় তাঁকেই। আর, তাঁকে fulfil (পরিপূরণ) করার জন্যই যা'-কিছু ক'রতে হয়। এই হ'লো কল্যাণের পথ। ঐ আচার্য্যে adhered (অনুরক্ত) হয় যারা, তাদের নিয়ে গ'ড়ে ওঠে society (সমাজ)। তারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালবাসে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভাল করে, আর এর ভিতর-দিয়ে খুশি করে ঐ আচার্য্যকে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্যই করে, কিন্তু এই করাটা সকলেরই একরকম নয়। প্রত্যেকে করে according to his hereditary instinct (তার জন্মগত সংস্কার-অনুযায়ী)। এর উপর দাঁড়িয়ে normal grouping of society (সমাজের স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগ) inevitable (অবশ্যম্ভাবী) হ'য়ে ওঠে। একেই বলে বর্ণবিভাগ। মানুষের profession (জীবিকা) এবং marriage (বিবাহ) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় এই অনুযায়ী। এর ভিতর-দিয়েই আসে economical emancipation (অর্থনৈতিক মুক্তি), eugenic, agricultural and industrial upliftment (সুপ্রজননগত, কৃষি ও শিল্পগত উন্নতি)। ঐ Ideal (আদর্শ)-কে প্রত্যেকটা মানুষ ভালবাসার দরুন সচ্চিদানন্দত্বই মুখর হ'য়ে উঠতে থাকে প্রত্যেকের ভিতর। আর, প্রত্যেকটি individual (ব্যক্তি)-এর এমনতর বিকাশই পরম কাম্য। Society-তে (সমাজে) সেই ব্যবস্থা যদি না থাকে, তবে শুধু অন্ন-বস্ত্রের সমাধান ক'রলে মানুষের অন্তর তৃপ্ত হবে না, সে শান্তি ও সার্থকতা খুঁজে পাবে না। আর, society (সমাজ)-ও দানা বেঁধে উঠতে পারবে না, যদি Ideal-centred inter-interestedness (আদর্শকেন্দ্রিক পারস্পরিক স্বার্থসম্বন্ধতা) না থাকে। আমি মোক্‌থা কথায় বললাম। এই ভিতের উপর যেমন-যেমন প্রয়োজন সব গেঁথে তোল, দেখবে কিছুই বাদ পড়বে না। পরমপিতা আমায় যেমন দেখিয়েছেন, যেমন বুঝিয়েছেন তাই আমি বলি তোমাদের কাছে। কর, করাও, বাঁচ, বাঁচাও। ব'সে থেকো না, দেরী ক'রো না। পরমপিতার কথা সর্ব্বত্র চারিয়ে দাও।

হরেনদা (বসু)—আপনার মুখে যখন কথাগুলি শুনি, তখন মনে হয় খুবই সহজ, এইতো হ'য়ে গেল, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে দেখি এগিয়ে যাওয়া

কী দুঃসাধ্য ব্যাপার !

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, না, কঠিন কিছু নয়। যে বিকৃত চলনে চলতে অভ্যস্ত হয়েছ, সেই চলনে চ'লে সবদিকের সুরাহা করাই বরং কঠিন। আমি যা' বলছি তা' আমাদেরই সম্পদ, আমাদের বাপ, বড়বাপ এই ক'রে গেছেন। এটা আমাদের blood-এ (রক্তে) আছে। যদি blood (রক্ত)-কে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) না ক'রে থাকি, তাহ'লে আমাদের ভাবনা কিছু নেই। লেগে-বেঁধে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচার-সমন্বিত ইষ্টীচলনের অভ্যাসকে চরিত্রগত ক'রে নিতে হবে, স্বভাবগত ক'রে নিতে হবে। পরিবেশকে যদি আমরা বদলাতে না পারি, তাহ'লে পরিবেশের চাপে আমরা বদলে যেতে বাধ্য হব। তাই চাই জোর তপস্যা, জোর যাজন আর এন্তার দীক্ষা। যে শ্রেয়সম্বেগসম্বুদ্ধ অনুশীলনের ফলে দেহবিধানে তাপের সঞ্চার হয়, তাকে বলে তপস্যা।

আমি কই—Rinse and renovate Aryanism normally nurturing the genuine shrubs of Varnasram with distribution of professions in accordance with their instinctive traditional traits and act accordingly—go on to achieve national efficiency (আর্য্যধর্ম্মকে পরিমার্জ্জিত ও নবীভূত কর, বর্ণাশ্রমের বিশুদ্ধ বংশগুলিকে পোষণ দাও, তাদের সহজাত-সংস্কার ও ঐতিহ্যগত গুণ-অনুযায়ী জীবিকার বিন্যাস কর—এর মাধ্যমে জাতীয় দক্ষতা অর্জ্জন কর)।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মাথা বাঁচাবার helmet (শিরস্ত্রাণ)-ই হ'লো দীক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধি। ইষ্টীপূত সংহতি যদি না বাড়ে, মানুষ যদি মানুষের পিছনে না দাঁড়ায়, পরস্পরে যদি কামড়া-কামড়ি করে, একে অন্যের ভাল যদি না দেখতে পারে, অপরকে down (খাটো) ক'রে নিজে বড় হওয়ার বুদ্ধি যদি প্রবল হয়, তাহ'লে কারও মাথা বাঁচবে না। এই বন্য বর্ব্বরতা ঘোচাবার জন্যই প্রয়োজন মানুষকে ইষ্টার্থী অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত ক'রে তোলা। ঐটে যদি না আসে, তবে লোকস্বার্থী অনুপ্রাণনা কিছুতেই দানা বেঁধে উঠবে না। প্রবৃত্তির ক্ষুধা সব শুভবুদ্ধিকে খেয়ে ফেলবে।

৯ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ২৬।৯।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—কোন-কোন বিশিষ্ট মানুষ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রকে ঐতিহাসিক পুরুষ হিসাবে স্বীকার করেন না, তাঁরা ঐ-সব মহাপুরুষদের সচ্চিদানন্দের প্রতীক হিসাবে ধরেন। তাঁদিগকে

ব্যক্তি হিসাবে উপাসনা করার প্রয়োজন আছে ব'লে তাঁরা মনে করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শ্‌নে বললেন—কথা হ'লো, প্রত্যেকটা মান্‌ষই ম্‌লতঃ সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ। প্রত্যেকটা সত্তারই একটা আধ্যাত্মিক দিক আছে। সেটা unfold (প্রকাশ) করলে মৌলিক একই জিনিস পাবেন। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক দিকটা তার আধিভৌতিক দিকটা বাদ দিয়ে নয়, বাদ দিলে আধ্যাত্মিকটাও পাব না। দয়াবান না হ'লে দয়াকে realise (উপলব্ধি) করতে পারি না। দয়াকে পেতে হ'লে দয়াবানকে ধরতে হবে। প্রত্যেকটা মান্‌ষ তত্ত্বতঃ সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ হ'লেও অজ্ঞানতার আবরণে আব্‌ত ব'লে সে নিজেকে তা' ব'লে জানে না। চলেও না সেই চলনে। সেই ল্‌প্ত স্বভাব ও চলনকে ফিরে পেতে গেলে চাই তার একটি জীবন্ত চেতন বিগ্রহ। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রম্‌খ হ'লেন অমনতর বাস্তব চেতন বিগ্রহ। ঐ চেতন বিগ্রহ জীবন্ত দেহ নিয়ে বার-বার আসেন মান্‌ষের মধ্যে। মান্‌ষ যদি তাঁকে গ্রহণ ও অন্‌সরণ না করে, উপাসনা না করে, তাহ'লে তার অজ্ঞতা ঘোচে না, সে আত্মপরিচয় পায় না। মান্‌ষ যখন নিজের খেয়ালী চাহিদাকে ignore (উপেক্ষা) ক'রে তাঁর ইচ্ছাপ্‌রণে উদগ্র হ'য়ে ওঠে, তখন ধীরে-ধীরে তার আত্মসম্বিৎ ফিরে আসতে থাকে। তাঁর impulse (প্রেরণা)-ই দেয় তাকে আত্ম-উদ্ঘাটনী সম্বেগ। ভগবান যদি মান্‌ষ হ'য়ে না আসেন, তাহ'লে মান্‌ষের কোন পথ থাকে না তাঁকে পাওয়ার। ঐ মান্‌ষ-ভগবানকে আমাদের চাই-ই কি চাই। নইলে আমরা নেমে যাবার পথ পাব, কিন্তু উপরে ওঠার পথ পাব না।

একটু পরে স্ববোধদা (সেন) আসলেন। তিনি বললেন—আমরা সংসারী মান্‌ষ। সংসারের প্রয়োজন-প্‌রণের দায়িত্ব আমাদের শক্তির অনেকখানি অপব্যয় ঘটায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মান্‌ষ সংসারী হো'ক, তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু নিরাশী-নির্ম্মম হ'লেই হয়, তাতে সংসার কিছ্‌ ক্ষতি করতে পারে না। এইটে মনে-প্রাণে বোঝা চাই যে, আমি বলতে যাকে বলি, সে তার সবকিছ্‌ নিয়ে ইষ্টের। ইষ্ট মানে—যাঁর মধ্যে মঙ্গল বসবাস করে। বাঁচা বা যা'-কিছ্‌ করা তা কেবল ঐ ইষ্টের জন্য। সংসারও ইষ্টার্থে। সবকিছ্‌ নিয়ে সর্ব্বতোভাবে ইষ্টের হ'য়ে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্‌রণ ক'রে চলতে হবে, সংসার ও পরিবেশের সেবা করতে হবে তদর্থে তাঁর জনের সেবা করছি এমনতর ভাব নিয়ে। একেই বলে নিরাশী-নির্ম্মম হ'য়ে সংসার করা। সংসার করার মধ্যে ঐ ছাড়া অন্য কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধান্ধা উদ্দেশ্য রাখতে নেই। ঐ ভাব নিয়ে পরিবার-পরিজন ও পরিবেশের প্রীতিপ্‌র্ণ পরিচর্য্যা করলে তাতে মান্‌ষ আবদ্ধ না হ'য়ে ম্‌ক্ত হয়, আর যারা অমনতর পরিচর্য্যা পায়, তারাও ইষ্টের প্রতি উন্ম্‌খ হ'য়ে ওঠে। ঘরে-ঘরে এইভাবে চলতে থাকলে সমাজ অজ্ঞাতসারে দেবভাবে উদ্দীপ্ত হ'য়ে

ওঠে। সংসারীরা কাম-কাঞ্চন-মত্ত হ'য়ে সংসার করবে আর সন্ন্যাসীরা সংসারের সঙ্গে সম্রব-শূন্য হ'য়ে বাইরে থেকে উপরসা ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে বেড়াবে, এতে উভয়ের চেষ্টাই নিষ্ফল হবে। কেউ কাউকে আমল দেবে না। সমাজ যে-তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। ইচ্ছা করলে গার্হস্থ্য-আশ্রমে না ঢুকতে দিয়ে সন্ন্যাসী করতে পারতাম ঢের। কিন্তু সংসার থেকে বেরিয়ে গেলে গৃহস্থদের উপর real influence (প্রকৃত প্রভাব) হয় না। তারা ভাবে, সন্ন্যাসীদের সংসারের দায়-দায়িত্ব সমস্যা নেই, তাঁরা আমাদের অবস্থা বোঝেন কতটুকু? সংসারী মানুষ হ'য়ে সংসারের মধ্যে থেকে ঈশ্বরনিষ্ঠ হ'য়ে চলার দৃষ্টান্ত দেখাতেন, তাহ'লে বুঝতাম বাহাদুরি। ও-সব ফাঁকা উপদেশের দাম কী? তাই আমি বলি, ইষ্ট-সংন্যস্ত হ'য়ে সংসার কর, সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী না হ'য়ে সংসারী সন্ন্যাসী হও। সংসার তোমার ইষ্টে সার্থকতা লাভ ক'রে অসারতার গ্লানি থেকে বাঁচুক। সন্তান-পরম্পরা ঐভাবে গ'ড়ে উঠুক। জীবনের সব ব্যাপারে, সবক্ষেত্রে ঈশ্বরানীতি জ্বলন্ত হ'য়ে উঠুক। এ কত বড় কাজ ভেবে দেখেছ? এর চাইতে শক্তিশালী আর কিছু হ'তে পারে না। ঘর-পালিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া এর কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তা'তে ক'জনের complex (প্রবৃত্তি) ঠিক-ঠিক adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, তাও বুঝতে পারি না। তবে সন্ন্যাসীর মতো সন্ন্যাসী আছেন বই কি? তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

প্রফুল্ল—আপনি গার্হস্থ্য-আশ্রমের যে আদর্শের কথা বললেন, তাও যেমন অনেকে ধ'রে রাখতে পারেন না, সন্ন্যাসাশ্রমের আদর্শও তেমনি অনেকে ঠিকমতো পালন করতে পারেন না। এমতাবস্থায় ত্যাগ, বৈরাগ্য, সাধনা ও সেবার উদ্দেশ্যে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁরা তো আমাদের নমস্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গৃহী, সন্ন্যাসী সবারই লক্ষ্য হ'লো ইষ্টার্থে নিজের জীবন সঁপে দেওয়া। তাই প্রকৃত গৃহস্থ হবার জন্য যে চেষ্টা করে, সে কোন অংশেই ন্যূন নয়।

প্রফুল্ল—ত্যাগের জীবন ভোগের জীবন থেকে তো উচ্চতর?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাপোষণী ভোগ দোষের কিছু নয়, আর ঐভাবে ভোগ করতে গেলে সত্তাসম্বর্দ্ধনার বিরোধী যে ভোগ, তা' তাকে ত্যাগ বা নিয়ন্ত্রণ করতেই হয়। আর, তা' যদি কেউ না করে, প্রকৃতিই তাকে শাস্তি দেয়। জীবনের বাস্তব সংঘাত তার চেতনার জাগরণে সাহায্য করে, অবশ্য যদি তার বিন্দুমাত্র ইষ্টানুরাগ থাকে। সে তখন আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসংশোধনে তৎপর হয়। কিন্তু কারও যদি প্রবল ইষ্টানুরাগ না থাকে অথচ সঙ্গে-সঙ্গে ভোগ-বাসনার আগ্রহও অনেকখানি থাকে, আর সেই অবস্থায় সে যদি জীবনসংগ্রামের ভয়ে বা লোকমান্যের লোভে বা অন্য কোন consideration-এ (বিবেচনায়) গেরুয়া প'রে সন্ন্যাসী সাজে, তাহ'লে সে-ত্যাগের জীবন কিন্তু তার পক্ষে মিথ্যাচার

হ'য়ে দাঁড়ায়। ঘা-গ্নুতো খেয়ে গৃহীর জীবনে যে adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হবার সম্ভাবনা থাকে, কপট জীবন-যাপন করার জন্য, তার জীবনে সে-সম্ভাবনা কমই থাকে। এর ফলে ধীরে-ধীরে সে distorted (বিকৃত) হ'য়ে পড়তে পারে। আধ্যাত্মিক উন্নতি তার পক্ষে সুদূরপরাহত হ'য়ে ওঠে। প্রবৃত্তিকে জোর ক'রে চাপা দিয়ে তার হাত থেকে কখনও নিস্তার পাওয়া যায় না। এই জীবনে বা জন্মান্তরে সে তার শোধ তুলে ছাড়ে। গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েরই fundamental asset (মৌলিক সম্পদ্) হ'চ্ছে ইষ্টপ্রাণতা। কিন্তু অমোঘ ইষ্টপ্রাণতা যদি কারও না থাকে, তার সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়। বাইরের কেউ টের পাক বা না-পাক, ভিতরে-ভিতরে তার খাবি খেতে হবেই। আর, ঐ-রকম ইষ্টপ্রাণতা যার থাকে, সে সংসারী হ'লেও তা'র আটকায় না। তা'র মধ্যেও তা'র সন্ন্যাস অক্ষুন্ন থাকে। একাধারে সে হয় আদর্শ সংসারী ও আদর্শ সন্ন্যাসী। তার দ্বারা কতো লোক, কতো সংসার যে কতভাবে উপকৃত হয়, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। আমার এই রকমটা ভাল লাগে। তোমরা এমনতর হ'য়ে দেখাও। তাহ'লে লোকের বুঝতে কষ্ট হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে সুবোধদাকে বললেন—তুই বিপ্রসন্তান, তুই পৈতে নিসনি, এটা ঠিক নয়। পৈতে নেওয়া নিয়ে ব্রাত্য আত্মীয়দের সঙ্গে সাময়িক একটা tussle (দ্বন্দ্ব)-ও যদি বাধে, তাহ'লেও ভাল। Compromise (আপোষ) না ক'রে যা' করণীয়, তা' যদি নিষ্ঠার সঙ্গে কর, তাহ'লে তারা এবং তোমার ছেলেপেলেরাও জানবে তারা কী। এতে আপাততঃ অসুবিধা বা বিরোধ হ'লেও পরে ভাল হয়। যীশু বলেছেন—I have not come to bring peace but a sword (আমি তথাকথিত শান্তি আনতে আসিনি, আমি এসেছি তরবারি নিয়ে)। তার মানে প্রবৃত্তিচলনের সঙ্গে সায় দিয়ে চলার যে-শান্তি, সে-শান্তি তাঁর কাম্য নয়। সে-শান্তি কালে-কালে মরণের কবর খোঁড়ে। কিন্তু প্রবৃত্তিচলনের বিরোধিতাও যদি করতে হয়, সাহসের সঙ্গে তাও করতে হবে —সপরিবেশ নিজের মঙ্গলের জন্য। যারা ধর্ম্মের জন্য, কৃষ্টির জন্য, ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করতে ভয় পায়, তারা কিন্তু নিজেদেরও ক্ষতি করে, অপরেরও ক্ষতি করে।

চুনীদা (রায়চৌধুরী)—উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হ'য়েও তো অনেকে দ্বিজোচিত চলনে চলে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন একদিন ঐ উপবীতই হয়তো তার স্মৃতি জাগিয়ে দিতে পারে। কুলোচিত আচার-আচরণ, সংস্কার ও বিবাহ-বিধান যদি লোপ ক'রে দেওয়া যায়, তাহ'লে বংশগত বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত জৈবীদানাই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর, আমি বলি—Never wipe off the genuine pedigreed shrubs, then you lose once for all the genuine gene of the

varietal groupings that specialise (খাঁটি বংশগুলিকে মুছে ফেলো না, তাহ'লে বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত বর্ণ-উৎসৃজী জনিগুলিকে চিরতরে হারাবে)।

১১ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৮।৯।১৯৪৭)

বেলা প্রায় আটটা। শরতের সোণালী রোদে চারিদিক ঝলমল করছে। গগনে, পবনে, প্রান্তরে, দারোয়া নদীর বুকে, ডিগরিয়ার চূড়ায় যেন এক অখণ্ড আলোকবন্যা উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গায়িত হ'য়ে চলেছে। বাতাসও যেন আজ সুধামধুর গন্ধে ভরপুর। শ্রীশ্রীঠাকুর আমতলায় এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), সুবোধদা (সেন), বিভূতিদা (সাহা), আদিনাথদা (মজুমদার), রাজেনদা (মজুমদার), শরৎদা (সেন), মহিমদা (দে), সন্তোষদা (রায়), ঈষদাদা (বিশ্বাস) প্রমুখ অনেকেই কাছে উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনান হচ্ছে। বিশ্বশান্তি-সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট ভারতীয় নেতার বক্তৃতা প'ড়ে শোনান হ'লো।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যারা নিজেরা properly adjusted, integrated ও powerful (যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত, সংহত ও শক্তিমান) নয়, তাদের কথা অন্যে শুনতে চায় না। আমার মনে হয়, জগাই-মাধাই যখন দেখলো যে বৈষ্ণবরা অতো integrated ও powerful (সংহত ও শক্তিমান), তাদের অতোখানি regard (শ্রদ্ধা) নিত্যানন্দের উপর, তখন ওরা ভড়কে গেল। ভাবলো —যদি সবাই মিলে একটা ক'রে চুল ছিঁড়ে নেয়, তাহ'লেও টিকতে পারবে না। অন্তরে ভয় জাগায় নরম হ'লো, তারই সঙ্গে-সঙ্গে জাগলো কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা। তাই প্রেম যদি শক্তি-সমন্বিত না হয়, তাহ'লে শুধু নীতিকথা বা মিঠেবুলিতে মানুষের দুরিতবুদ্ধি দমিত হয় না। আবার, শক্তি যদি সংযত ও শুভেচ্ছাপ্রবুদ্ধ না হয়, তাহ'লেও কাজ হয় না। বরং উল্টো ফল ফলে। শক্তি ও দক্ষতার দম্ভে মানুষ যদি শিবকে অবমাননা করে, তাহ'লে তার সুস্থমস্তিষ্ক উচ্ছিন্ন ও ছন্ন হ'য়ে যায়, অজবুদ্ধিই পেয়ে বসে তাকে। মহাপণ্ডিত হ'লেও সে অহঙ্কারের ঘোরে অজমূর্খের মতো ব্যবহার করে, আর ক্রমাগত নিজেকে বিপন্ন ও হাস্যাস্পদ করে।

পরে অন্য প্রসঙ্গ উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি মানুষের কাছে fact (তথ্য)-গুলি এত ক'রে unfold (ব্যক্ত) করি, কিন্তু অনেকের কাছেই কোন উত্তর পাই না। উত্তর দিতে পারে না; তার কারণ adjusted (নিয়ন্ত্রিত) নয়। যেন obsessed (অভিভূত) হ'য়ে আছে। অনেকেই গল্পের মতো আমার কথাগুলি শোনে,

কিন্তু ভাবে না, করে না, তাই মেধানাড়ী খোলে না। মেধানাড়ী না খুললে কথা কথাই থেকে যায়, চলনায় প্রতিফলিত হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—ম্যাথেম্যাটিক্স্ কথা কিসের থেকে এসেছে জানিস ?

প্রফুল্ল—না, কিসের থেকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি সংস্কৃত মেধার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। যাতে মেধার exercise (অনুশীলন) হয়, তাই-ই ম্যাথেম্যাটিক্স্। ভাল ক'রে দেখে নিস্। আমার শোনা কথা। কি বলতে কি কই! তবে কথাটা আমার মনে ধরে।

১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ২।১০।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর তাঁবুর তলে পাতা তক্তপোষে ব'সে আছেন। কাছে দু'-চার জন আছেন। এমন সময় এক ভদ্রলোক দেখা করতে আসলেন। তিনি অবাঙালী, কলকাতায় থাকেন। তাই বাংলায় কথাবার্ত্তা বলতে পারেন।

তিনি আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর চিরচেনা আপনজনের মতো পরম প্রীতিভরে বললেন —আসেন দাদা! বসেন।

ভদ্রলোক প্রণাম ক'রে সামনের একখানি বেঞ্চিতে বসলেন। পরে বললেন—আমি কলকাতায় থাকি, এখানে এসেছিলাম একটা কাজে। এখানে এসে লোকমুখে খবর পেলাম আপনি এখন এখানে আছেন। শুনে আমার খুব আনন্দ হ'লো। অনেকদিন থেকে আপনাকে দর্শন করার ইচ্ছা। হঠাৎ ভগবান সুযোগ জুটিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ায় আমিও আপনাকে দেখতে পেলাম। যাহো'ক, কয়েকদিন আছেন তো ?

ভদ্রলোক—না, কালই চ'লে যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি ? আমি ভাবছিলাম—আপনি থাকবেন। আসবেন মাঝে-মাঝে—বেশ আনন্দ হবে।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—ভারত ও পাকিস্তান এই উভয়-দেশের কল্যাণ হবে কিসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেশবিভাগই মস্ত ভুল হয়েছে। উভয়দেশ যদি আবার মিলিত না হয়, তাহ'লে কারও পক্ষে ভাল হবে না। ধর্ম্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ এটা একটা আজগবী কথা। ধর্ম্ম মানে বাঁচা-বাড়ার বিজ্ঞান। যে-কোন মহাপুরুষই তার প্রবক্তা হউন না কেন, তাতে ধর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তন হয় না; ধর্ম্ম চিরকালই এক। হিন্দুর ধর্ম্ম যা', মুসলমানের ধর্ম্মও তাই; প্রত্যেক ধর্ম্ম-মতের লোকই ঈশ্বরপন্থী। আর, সেই ঈশ্বর একজন ছাড়া দুইজন নন।

তাঁর প্রেরিত বাণীবাহক যাঁরা, তাঁরাও একই সত্যের উদ্গাতা—একই পথের পথিক—নানা কলেবরে একই সত্তা। তাই ধর্ম্ম মানুষকে মিলিত ছাড়া বিচ্ছিন্ন করে না। ধর্ম্মের থেকে চ্যুত হ'লেই সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিভেদ-বিরোধের সৃষ্টি হয়। হিন্দু যদি প্রকৃত হিন্দু হয়, মুসলমান যদি প্রকৃত মুসলমান হয়, তারা বান্ধববন্ধনে আবদ্ধ হ'তে বাধ্য; বাপকে যে ভালবাসে, সে কখনও ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হ'তে পারে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপাস্যই এক ও অদ্বিতীয়; তাই সম্প্রদায়গুলি ভাই-ভাই ছাড়া আর কী? মানুষের সহজ বুদ্ধিতে সবই ধরা পড়ে; গোলমাল করে দুরভিসন্ধিপ্রসূত অপব্যাখ্যা ও অপযাজন। ধর্ম্ম যদি বিপন্ন হ'য়ে থাকে, তবে সবচাইতে বেশী বিপন্ন হ'য়েছে অমনতর ব্যাখ্যাতা ও যাজকদের হাতে। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের আসল রূপটি তুলে ধরতে হবে সাধারণ লোকের কাছে; তাহ'লে দুষ্টলোকের জারিজুরি খাটবে না। হিন্দুর যেমন হিন্দুত্বের বিকৃতি বরদাস্ত করা উচিত নয়, তেমনি উচিত নয় ইসলামের বিকৃতি বরদাস্ত করা। মুসলমানেরও তেমনি উচিত নয় ইসলাম ও হিন্দুত্বের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ হ'তে দেওয়া। কোন ধর্ম্মাদর্শকে ক্ষুণ্ণ হ'তে দেওয়া মানে শয়তানের সাগরেদি করা। আমাদের নিজেদের যেমন ধর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে উঠতে হবে—পরিবেশকেও তেমনি ধর্ম্মপরায়ণ ক'রে তুলতে হবে—প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম্মাদর্শ-অনুযায়ী। হিন্দু যেমন গীতা পড়বে, তেমনি কোরাণ-বাইবেলও পড়বে; মুসলমান যেমন কোরাণ পড়বে, তেমনি গীতা-বাইবেলও পড়বে। প্রত্যেকে চেষ্টা করবে বাস্তব আচরণে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হ'তে এবং অন্যকেও সাহায্য করবে ও প্রেরণা জোগাবে অমনতর হ'য়ে উঠতে। এমনতর হ'তে থাকলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য গ'ড়ে তুলতে ক'দিন লাগে? আমি তো বুঝি, হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা যেমন আমার দায়, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাও তেমনি আমারই দায়। আমার পরিবেশের প্রত্যেকে তার মতো ক'রে যদি ঈশ্বরপরায়ণ না হ'য়ে ওঠে, আদর্শপ্রেমী না হ'য়ে ওঠে, ধর্ম্মনিষ্ঠ না হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে তো আমারই সমূহ বিপদ। পরিবেশকে বাদ দিয়ে আমার একলা ধর্ম্ম করা অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার পথে চলা তো সম্ভব নয়।

নবাগত ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় খুবই মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠলেন। বার-বার বলতে লাগলেন—এমন কথা কারও মুখে কোনদিন শুনিনি; আমার মনটা খুবই আশান্বিত হ'য়ে উঠেছে। আপনার কাছে এসে এত উদ্দীপনা পায় ব'লেই তো দূর-দূরান্তর থেকে মানুষ আপনার কাছে ছুটে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উদ্দীপনাকে ধ'রে রাখতে গেলে কিন্তু করতে হয়। উদ্দীপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যদি না করে, তাহ'লে কিন্তু নিথর হ'য়ে পড়ে।

এরপর ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

একটু পরে অমূল্যদা (ঘোষ) আসলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বড়দার বাড়ীতে হ্যারিকেন নেই, মাঝে-মাঝে আলো নিভে যায়। তখন অসুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Insight বা farsight (অন্তর্দৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি) ব'লে তোমাদের কিছু নেই, না ঠেকলে আর শেখ না। এটা ভাল নয়। সবদিকে ভেবেচিন্তে আগে থাকতেই প্রস্তুতি ঠিক রাখা লাগে। আগেই কিনে রাখা লাগতো। যাহো'ক, এখনই ব্যবস্থা ক'রে ফেল।

অমূল্যদা তখনই উঠে পড়লেন।

১৭ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ৪।১০।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় এসে বসেছেন। সম্প্রতি দেওঘরে বাংলাদেশ থেকে বহুলোক এসেছেন বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য। তাঁদের কতিপয় এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে। বেঞ্চিতে বসতে দেওয়া হয়েছে। চুনীদা (রায়চৌধুরী), কমলাক্ষদা (সরকার), উমাদা (বাগচী), বীরেনদা (মিত্র) প্রমুখও কাছে আছেন।

একজন হিন্দু-সমাজের নানা গলদ ও অনৈক্যের কথা উল্লেখ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—এ-সবের প্রতিকার কিভাবে হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের চাই সমাজকে মাজাঘষা, ভাঙ্গা নয়। একটু মাজা-ঘষায় যা' হ'য়ে দাঁড়াবে, তাতে সমস্ত জগৎ উপকৃত হ'তে পারবে। আমাদের যা'-কিছু বিধান সবটারই মূল উদ্দেশ্য ভাল। হয়তো মানুষের অজ্ঞতার দরুন পরে বিকৃতি এসে থাকতে পারে। বিকৃতি তাড়াতে হবে, কিন্তু কাঠামোশুদ্ধ যদি বিদায় দিই, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে। সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলে যে মিলমিশ হবে ব'লে বলছিলেন, আমি সে-কথা বুঝি না। তাহ'লে দুইভাই এক অন্নে থেকেও ঝগড়া-বিরোধ করে কেন ? সদাচারের বিধি মেনে চলাই ভাল। যেখানে-সেখানে, যার-তার হাতে, যে-সে অবস্থায় যা'-তা' খাওয়া শরীরের পক্ষেও ভাল নয়, মনের পক্ষেও ভাল নয়। তাই ব'লে যে কাউকে ঘৃণা করতে হবে এমনতর কোন কথা নেই। আবার, মানুষের সঙ্গে মিশতে reverential distance (সম্মানযোগ্য দূরত্ব) বজায় রাখা ভাল। Too much familiarity breeds contempt (অতিরিক্ত মাখামাখি ঘৃণার জন্ম দেয়)। এমন-কি, অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ যেখানে, সেখানেও যদি সমীচীন দূরত্ব না থাকে তাহ'লে সে-অবস্থা উভয়ের কাছে বিরক্তিকর ও পীড়াদায়ক হ'য়ে ওঠে। কেউ কাউকে দিয়ে লাভবান হয় না। একজনের charm (আকর্ষণ) থাকে না আর-এক জনের কাছে। সেইজন্য সব জিনিসেরই মাত্রাজ্ঞান থাকা উচিত। এই মাত্রাজ্ঞান দেখে বোঝা যায়, একজনের personality (ব্যক্তিত্ব),

intelligence (বুদ্ধি) ও self-control (আত্মসংযম) কেমন। এ-সব তো আছেই। সব চাইতে বেশী যা' দরকার, তা' হ'লো শ্রেয়ের প্রতি টান বাড়ানো। দেওয়ার ভিতর-দিয়ে টান বাড়ে। মাতৃভৃতি, পিতৃভৃতি ও ইষ্টভৃতি নিত্য করতে হয়। অর্থাৎ, রোজই মা, বাবা ও ইষ্টকে কিছু দিতে হয়। দিতে-দিতে, করতে-করতে টান বেড়ে ওঠে। আবার, সঙ্গে-সঙ্গে ভাবতে হয়, বলতে হয় তাঁদের কথা। ইষ্টকে নিয়ে ভাবা, বলা ও করা যত বেড়ে যায় আমাদের ততই তাঁর প্রতি টান বাড়ে, আর তাতে আমাদের চরিত্র বদলে যায়। না করলে যে টান হয় না তা' সহজেই বোঝা যায়। ধর, একজনের সহধর্ম্মিণীর গর্ভের সন্তান একটি আছে এবং আর একটি আছে অবৈধ সন্তান। অবৈধ সন্তানের জন্মদানের পর, সে আর তার খোঁজখবর নেয় না, কিন্তু স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে মানুষ ক'রে তোলার জন্য যা' করণীয় প্রতিদিন অক্লান্ত আগ্রহ সহকারে করে। এখন দেখা যাবে দুইটিই তার ঔরসজাত সন্তান হ'লেও যার জন্য তার কিছু করা নেই, যার সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই, তার প্রতি তার বিশেষ কোন টানই জন্মাবে না। দীক্ষা ও বিয়ে এই দু'টো ব্যাপার যদি ঠিক থাকে তাহ'লে কিছুতেই deviation (বিচ্যুতি) আসতে পারবে না, বরং বংশপরম্পরায় কিছুটা-কিছুটা বেড়েই চলবে। ধর্ম্মের পথে চলা হাতী-ঘোড়ার ব্যাপার নয়, এর চাইতে সহজ আর কিছু হয় না। তার কারণ, জীবন যেখানে গজায়, তার সঙ্গে-সঙ্গে গজিয়ে ওঠে বাঁচা-বাড়ার সম্বেগ।

ভদ্রলোকটি বললেন—নিজের আচরণ তো বড় কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন যজন চাই, তেমনি যাজন চাই, যেমন অধ্যয়ন চাই, তেমনি চাই অধ্যাপনা, আবার চাই দান এবং প্রতিগ্রহ দুই-ই। এই দুইদিক সামাল না দিলে ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে শুভের স্রোত প্রবল হ'য়ে প্রবহমান থাকে না। "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।" কোন-কিছুর আবৃত্তি মানে সম্যক্‌ভাবে তাতে থাকা। আচরণকে অবলম্বন ক'রে আমরা যাতে বসবাস করি, যা' নিয়ে লেগে থাকি, তা' আমাদের স্বভাবগত হ'য়ে ওঠে, তাই তা' নিষ্ক্রিয়-বোধের থেকেও শ্রেয়। যা' করায় থাকে, সে-সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী বোধ না থাকলেও আটকায় না। অবশ্য করার ভিতর-দিয়ে বোধ গজিয়ে ওঠেই। শুধু করলে হবে না। মানুষকে দিয়ে করাতেও হবে। যারা ধর্ম্ম করে ও করায়, তাদের বলে ঋত্বিক্। সৎসঙ্গেও অনেকে ঋত্বিকতার কাজ করে। অবশ্য আমার ঋত্বিক্‌দের মধ্যে কমই আছে, যাদের প্রকৃত ঋত্বিক্ বলা যায়। তবে তাদের অনেকেই এই culture (অনুশীলন) নিয়ে চলতে চেষ্টা করছে। আর, culture (অনুশীলন) করলে আঙ্গুল by আঙ্গুল (আঙ্গুল-আঙ্গুল ক'রে) বাড়েই। যত sincere (অকপট) হয়, তত বাড়ে। বাইরে থেকে হয়তো

ঠিক পাওয়া যায় না। আমি বলি—চোর-বদমাইস যেই ভগবানের নাম চায়, তাকেই নাম দেবে। আচার্য্যের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে নাম করলে এবং আনুষঙ্গিক যা' করণীয় করলে রত্নাকরের মতো একদিন বদলেও যেতে পারে। রত্নাকর তো দস্যু ছিল, কোথায় মিলিয়ে গেল সে-দস্যুতা। ভিতরের চাপা বাল্মীকি জেগে উঠলো। Misdirected (বিপথে পরিচালিত) যারা তাদের কতজনের মধ্যে কত শুভ সম্ভাবনা ঘুমিয়ে আছে—তা' কি বলা যায়? তাই কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে নেই। সবাইকে ভালবাসতে হয়, আশা দিতে হয়, উৎসাহ দিতে হয়, সৎপথে পরিচালিত করতে হয়। পরমপিতার পথে যদি মানুষ চলতে সুরু করে, তাহ'লে তার ভাল হয়ই। তবে অধৈর্য্য হ'লে চলে না। অভ্যাসের বড় জোর। বদভ্যাস একবার যদি মজ্জাগত হয় সহজে ছাড়তে চায় না। ওদিকে বেশী খেয়াল না দিয়ে প্রত্যেকের ভিতর সদভ্যাস যাতে সুদৃঢ় হয়, তাই করতে হয়। তাতেই মঙ্গল হয়, তাতেই মানুষ ধীরে-ধীরে বেড়ে ওঠে। অবশ্য এই বাড়াটা চোখে পড়ে না। একটা গাছের বাড়া দেখা যায় না, তবু বাড়ে। ঘণ্টার কাঁটার নড়া ঠিক পাওয়া যায় না, তবু নড়ে। তবে ভিতরে কপটতা থাকলে অথবা ভাল হওয়ার রোখ প্রবল না হ'লে মানুষ এগোতে পারই কমই।

ভদ্রলোকটি বললেন—যান্ত্রিক যুগে মানুষ ধর্ম্মের কথা বড় একটা ভাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যান্ত্রিক যুগ সৃষ্টি করেছে মানুষ তার নিজেরই সুবিধার জন্য। এই যন্ত্রকে যদি জীবনের উপযোগী ক'রে পরিচালনা করতে হয়, তাহ'লেও মানুষের ধর্ম্ম চাই। আর, ধর্ম্ম মানেও তাই, যাতে মানুষ পরিবেশকে নিয়ে বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে, সত্তা বা অস্তিত্বকে ধ'রে রাখতে পারে। ধর্ম্মপরায়ণতা যদি লোপ পায়, তবে প্রবৃত্তিপরায়ণতা প্রবল হবে। আর যন্ত্রকে যদি মানুষ প্রবৃত্তিপরায়ণতার সেবায় লাগায়, তবে তা' তার ruin (ধ্বংস)-কেই hasten (ত্বরান্বিত) করবে। কিংবা যন্ত্রের দাবী মানতে গিয়ে সে যদি সত্তার দাবীকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তাহ'লেও যন্ত্রই তার কাল হ'য়ে দাঁড়াবে। যন্ত্র বা যে-কোন জিনিসই হোক তার ঊর্দ্ধে না দাঁড়ালে, তাকে সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে তোলা যায় না। আর, ঊর্দ্ধে দাঁড়াতে গেলেই পরমপিতাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকা চাই।

প্রশ্ন—যন্ত্রের আমদানি ক'রে তো মানুষ যন্ত্রদাস হ'য়ে পড়েছে। এখন কি সে যন্ত্র ভেঙ্গে ফেলবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যন্ত্রে যদি efficiency (দক্ষতা) বাড়ে, না বুঝে-সুঝে আগে ভাঙ্গতে যাই কেন? পরমপিতাকে প্রধান ক'রে নিয়ে যদি আমরা চলি, তাহ'লে আমরা যন্ত্র বা কোন-কিছুরই দাস হব না, বরং যন্ত্র ইত্যাদি আমাদের ভৃত্যের মতো সেবা করবে। যন্ত্রের সাহায্যে ভারত যদি সারা পৃথিবীর অন্ন-বস্ত্রের ঘাটতি পূরণ করতে পারে, তাহ'লে সেটা কি অবাঞ্ছনীয়? আমরা নিজেরাও দাঁড়াব

এবং চেষ্টা করবো প্রত্যেক দেশ যাতে দাঁড়াতে পারে। এই-ই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারত সর্বাদিক থেকেই আবার জগতের গুরু হয়তো হবে—যদি আমরা করি। এখন এই যদিটার অপসারণ চাই।

খগেনদা (তপাদার) পাশে ব'সে টাটানগরের এক দাদার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে দাদাটিকে বললেন—পরমপিতার দয়া আছে আপনার ওপর। আপনার আটকাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে বললেন—তাঁর দয়া তো আমাদের সকলের উপরই আছে। কিন্তু আমরা বাস্তব করার ভিতর-দিয়ে তাঁর দয়ার দিকে যত এগুব, ততো তাঁর দয়া পাব।

দাদাটি বললেন—অনেকের ভাগ্য ভাল থাকে, তারা বিশেষ কিছু না ক'রেও অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাগ্য মানে ভজনফল বা কর্ম্মফল। ভাগ্য এসেছে ভজ্-ধাতু থেকে। ভজ্-ধাতু মানে ভক্তি, অনুরাগ, সেবা, আশ্রয়, প্রাপ্তি, বিভাগ, দান ইত্যাদি। অনেকের পূর্ব্বজন্মে অনেকখানি করা থাকে, যার ফল এ-জন্মেও পায়। তাই মনে হয় কিছু না ক'রেও পেল। কিন্তু পেতে গেলেই করতে হয়। অবশ্য দাগাবাজি ক'রে পাওয়ার কথা বলছি না। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির কথা যা' বললাম, ওর উপর নির্ভরশীল না হ'য়ে যা' পেতে গেলে যা' করতে হয়, বর্ত্তমানকালে তা' বিধিমতো করার তালে থাকাই ভাল। ঐ করাই পাইয়ে দেয়। অদৃষ্টবাদী ও আলস্যপরায়ণ হ'লে মানুষ পদে-পদেই ঠ'কে যায়। যে যা' পায় তা' ক'রেই পায়। আগের করা এগোন থাকলে কর্ম্মদক্ষতা, বুদ্ধি ও চরিত্র তদনুযায়ী বিকশিত হয়। তার বিহিত প্রয়োগে মানুষ এ-জন্মে অপেক্ষাকৃত কম চেষ্টায় কৃতকার্য্যতা লাভ করে।

বহিরাগতদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—নিজে ধর্ম্মপথে চলাই তো বড় কথা। অন্য কে ধর্ম্ম করলো না করলো সে-দিকে নজর দিতে গেলে তো নিজের মন বহির্ম্মুখী হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Environment (পরিবেশ) মানুষের একটা মস্ত nurturing agent (পোষণ সরবরাহকারী)। পরিবেশকে যদি আমরা উন্নতভাবে প্রবুদ্ধ ক'রে না তুলি, সমগ্র পরিবেশ যদি উল্টোপথে চলে, সেখানে আমাদের ধর্ম্মপথে চলা দুরূহ হ'য়ে উঠবে। তাই যাজন ধর্ম্মের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। যাজন মানুষকে বহির্ম্মুখী করে না, বহুমুখী করে না, বরং বেশী ক'রে ইষ্টমুখী করতে সাহায্য করে, অবশ্য যদি তার সঙ্গে যজন থাকে। জীবন-ধারণ করতে গেলেই মানুষকে বাইরের সঙ্গে নানা সংস্রব রেখে চলতে হয়। সেটা কারও এড়িয়ে চলার উপায় নেই। যাজনমুখর হ'য়ে কেউ যদি তা' করে তাহ'লেই বরং সে নিজের ইষ্টপ্রাণতাকে অক্ষুন্ন রেখে চলতে পারে। আমরা যখন যজন, যাজন

অর্থাৎ ইষ্টচিন্তা ও ইষ্টপ্রসঙ্গ বাদ দিয়ে চলি, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে উপেক্ষা করি, তখনই অজ্ঞাতসারে প্রবৃত্তি-আবিষ্ট হ'য়ে পড়ি। মনে রাখতে হবে, অধ্যয়ন মানে শুধু পড়া নয়—আয়ত্ত করার পথে চলা। আর, যখনই প্রবৃত্তি-আবিষ্ট হ'য়ে পড়ি, তখনই প্রবৃত্তি আমাদের ঈশ্বর হ'য়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বর যিনি তাঁকে ভুলে যাই। ভুলে যাই ঈশ্বর এক, আত্মা এক, মহাপুরুষরা এক, ধর্ম্ম এক। তখন দ্বেষ, হিংসা, ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়। একে অপরকে খাটো ক'রে বড় হ'তে চায়, একে অন্যের ক্ষতি ক'রে লাভবান হ'তে চায়। এই হ'লো অধর্ম্মের চেহারা। অর্থাৎ, মানুষ যেখানে পরস্পর-বিরোধী সেখানে কারও অস্তিত্ব নিরাপদ হয় না। আর, অধর্ম্ম মানে তাই যাতে বাঁচা-বাড়া ব্যাহত হয়। কিন্তু যতই আমরা আদর্শে অনুরক্ত হই, ততই inter-interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) হই, তার ফলে তদনুপাতিক সংহতি আসে, সংহতি থেকেই আসে শক্তি ও সম্বর্দ্ধনা।

উমাদা—এক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত যারা, তাদের মধ্যেও তো অনেক সময় সংহতির অভাব দেখা যায়। হয়তো আদর্শানুরাগের দোহাই দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করে ও নিন্দা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তারা আদর্শে অনুরক্ত নয়। অনুরক্ত অহমিকা ও স্বার্থের সেবায়। আদর্শে অনুরক্ত যে, সে অন্যের দোষ দেখে দুষ্ট হ'য়ে সেই দোষ ছিটিয়ে বেড়ায় না। তার নজর সব সময় নিরাকরণের দিকে। সে তাই করে যাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল হয়। বিষাক্ত হ'য়ে বিষ ছড়ায় না। যার মধ্যে এতটুকু sincerity (আন্তরিকতা) আছে, সে অপরের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ দেখে এবং তা' দূর করতেই ব্যস্ত থাকে। সর্ব্বসমক্ষে নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে সে আদৌ কুণ্ঠিত হয় না। তা ঐ আত্মানুসন্ধানী নিরভিমান চলনই অপরকে আত্মসংশোধনে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে। আবার তার সহনশীলতাও বেড়ে যায় খুব। দোষগুণ সব নিয়ে সে মানুষকে ভালবাসতে শেখে। তবে আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর কেউ কিছু করলে তাকে বিহিতভাবে নিরোধ করতে সে পরাঙ্মুখ হয় না। এই নিরোধ করতে গিয়ে সে বিরোধ বাধায় কমই। কারও অহংকে অযথা আঘাত করার বুদ্ধি থাকে না তার। আলগোছে অন্যের দোষ-ত্রুটিটা ধরিয়ে দিয়ে সে তার সামনে glowing (উজ্জ্বল) ক'রে তুলে ধরে—তার ভাল হওয়ার ও ভাল করার সম্ভাবনা কত বিপুল। মানুষের ভালটাকে উস্‌কে দিয়ে তাকে ক্রমাগত ভাল ক'রে তোলাই হয় তার নেশা। ইষ্টানুরাগী যে তার চরিত্র সংহতিসন্দীপী হবেই।

কমলাক্ষদা—বিষাক্ত হ'য়ে বিষ যে ছড়ায়, সে কি বোঝে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ইষ্টপ্রাণতা না থাকলে আহত ও অপমানিত অহং নিজের বেদনা ও আক্রোশ ভুলতে পারে না। ঐ বিষাক্ততা-দ্বারা obsessed (অভিভূত) হ'য়ে থাকে, তাই বুঝতে পারে না কী সর্ব্বনাশ সে করছে নিজের ও পরের।

তবে একথাও ঠিক, যারা মানুষের মনে অমনতর বিষাক্ততা সৃষ্টির কারণ ঘটায়, তারাও সমাজের শত্রু। সে যাই হো'ক, কোন কারণে মনে যদি অমনতর বিষাক্ততার সঞ্চার হয় ইষ্টানুগ বিচার-বিবেচনা বা উপেক্ষা দিয়ে তাকে মন থেকে ঝেঁটিয়ে বের ক'রে না দিতে পারলে কিন্তু মহতী বিনষ্টি। সাময়িক বিক্ষেপ অনেকের আসতে পারে। কিন্তু ইষ্টের প্রতি গভীর টান থাকলে সহসা চমক ভেঙ্গে যায়। ভাবে, ঠাকুরের চিন্তা না ক'রে এ আমি কি সর্ব্বনাশা চিন্তা করছি? এতে আমার লাভ কী? জোর ক'রে সে ঐ obsession (অভিভুতি)-কে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিয়ে ইষ্টের, নিজের ও পরিবেশের পক্ষে profitable (লাভজনক) যা' এমনতর চিন্তা ও কাজে উদ্দাম হ'য়ে লেগে পড়ে। যাদের প্রবৃত্তিটান ভগবানের টানের চাইতে বেশী, তাদের ঘন-ঘন নানারকম obsession (অভিভুতি) আসার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সেগুলি resolved (নিরাকৃত) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কমই। ঐ-সব পাষাণ-চাপই মানুষের জীবনে যমদূতের মতো কাজ করে।

প্রমথদা (দে)—এমনতর obsessed (প্রবৃত্তি-অভিভূত) মানুষ যারা, তাদের নিস্তারের পথ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Obsessed (প্রবৃত্তি-অভিভূত) হ'লেও জীবনের মায়া, সত্তার মায়া যায় না! ঐ রাস্তা দিয়ে দয়ালু যদি কেউ থাকে, ঢুকে ঠিক করতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত প্রবৃত্তি-ঝোঁকা যারা, তারা আর্ত্ত অবস্থায় গুরুকে ধরলেও নিষ্ঠা-সহকারে তাঁকে ধ'রে থাকতে পারে না। তাদের অনেকে গুরু-আনুগত্যের নামে গুরুকে ভাঙ্গিয়ে খায়, কেউ-কেউ তাঁকে betray (বিশ্বাসঘাতকতা)-ও করে।

কাজলভাইকে এদিক পানে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর আদরের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—বাপুন সোনা! কোনে (কোথায়) যাও?

কাজলভাই—যাই না কোথাও, এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাস্তার দিকে যদি যাও, কায়ীকে (কালিদাসী-মাকে কাজলভাই ছেলেবেলা থেকে কায়ী ব'লে ডাকতে অভ্যস্ত) সঙ্গে নিয়ে যেও।

কাজলভাই—আচ্ছা!

কমলাক্ষদা জিজ্ঞাসা করলেন—একজন ভাল কাজ করে, কিন্তু পারিপার্শ্বিককে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে বা overcome (জয়) করতে পারে না। সেটা কি দুর্ব্বলতার দরুন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে tendril of passion (প্রবৃত্তির লতাতন্তু) তাকে ধ'রে রেখেছে। একজন তাকে দয়ালু ব'লে প্রশংসা ক'রে তার দয়ার অহঙ্কার জাগিয়ে দিল তো সে একেবারে গ'লে গেল। বেহিসাবী হ'য়ে, আত্মহারা হ'য়ে দয়া করলো, ঠিক পেল না কতটুকু কী করতে হবে। আবার, হিসাব ক'রে দেখল না, ঐ দয়া ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে সার্থকই বা হ'লো কতখানি।

কোথাও অনেক ভাল কাজ ক'রে ক্রোধ, দুর্ব্বাক্য, অহঙ্কার বা অভিমানের বশে হয়তো সব সুফল পণ্ড ক'রে দিল। আবার, নিজের দুর্ব্বলতার জন্য হয়তো বন্ধুকে শত্রু ভাবল এবং ছদ্মবেশী শত্রুকে বন্ধু ব'লে ধ'রে নিল। কেউ হয়তো ভাল কাজও করলো, go-between (কথাখেলাপ)-ও চালাল। কেউ হয়তো ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে মুখ্য ক'রে না ধ'রে আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠার তাড়নায় তথাকথিত সৎকাজ করতে লাগল এবং আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হ'লেই ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো। কেউ হয়তো কাজের পথে ঈর্ষ্যা, আক্রোশ বা ঘৃণার কবলে প'ড়ে গেল এবং উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হ'য়ে গেল। প্রবৃত্তি যাদের কাছে বড়, তাদের সামান্য ব্যাপারের জন্য বৃহৎ ব্যাপার পণ্ড করতে আটকায় না। তাই পারিপার্শ্বিকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রে তারা তাদের আয়ত্ত করতে পারে না। মানুষ যদি মূলতঃ ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন না হয় এবং ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার খাতিরে নিজেকে যেখানে যেমন adjust (নিয়ন্ত্রণ) ও rule (শাসন) করা দরকার, তা' না করতে পারে, তবে সে যত ভাল কাজই করুক, পারিপার্শ্বিকের উপর তার কোন real influence (সত্যিকার প্রভাব) হয় না।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কি এই জীবনে পরমার্থ লাভ হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের আচার্য্যের প্রতি ভক্তি অর্থাৎ active love (সক্রিয় ভালবাসা) যত বেশী হবে, ততই পরমার্থ লাভ হবে। Mercy equitable (দয়া সমদৃষ্টিসম্পন্ন)। যে আলোর দিকে যতটা এগোয়, সে আলোর প্রাখর্য্যও ততটা পায়।

প্রশ্ন—মহাপুরুষের special (বিশেষ) দয়া ব'লে কিছু পাওয়া যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যখনই special (বিশেষ) হই, তখনই special (বিশেষ) দয়া পাই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে কাঠের কাজ দেখতে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অনেকে চললেন।

১৯শে আশ্বিন, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ৬।১০।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। সুধাংশুদা (মৈত্র), কমলাক্ষদা (সরকার), অনিলদা (সরকার), ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী), মহেন্দ্রদা (হালদার), জিতেনভাই (দলুই), চিত্তভাই (মণ্ডল) প্রমুখ অনেকেই কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অনেকেই আমার কাছে হামেশা চায়, কিন্তু আমার ওপর কোন sympathy (সহানুভূতি) নেই। তা' থাকলেই আমাকে তাজা রাখার জন্য, আমাকে স্বস্তি দেবার জন্য নিজেরা effort (চেষ্টা) ক'রে

যোগ্যতর হ'য়ে ওঠে। আর, আমার ইচ্ছা করে যে, আমার যারা তারা এতখানি inter-interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) হ'য়ে উঠুক যে কারও যেন কোন ব্যাপারে বেগ পেতে না হয়। এখানে কিছু লোক আছে যাদের অপরের জন্য করার বুদ্ধি আছে, আবার অনেকের আছে কারও জন্য কিছু না ক'রে ষোল আনা সুযোগ-সুবিধা আদায় করার বুদ্ধি। এমনতর পরিস্থিতি হ'লে যারা ক'রতে চায় তারাও shattered (বিধ্বস্ত) হ'য়ে পড়ে, ব'সে যায়। যারা কেবল অপরের fluid (রস) suck ক'রে (চুষে) বাঁচতে চায়, নেওয়ার অনুপাতিক দেয় না বা করে না, দায়িত্ব এড়িয়ে গায় ফু দিয়ে চলে, তারা পরগাছার মতো শোষক ছাড়া আর কিছু নয়। দিতে আমি কাতর নই। কিন্তু আমি বলি—তোরা যদি উপযুক্ত না হো'স, তাহ'লে আমার সুখটা কোথায়? আমি ভাবি পাঁচশ' ঋত্বিক্ যদি আড়াইশ' ক'রে family (পরিবার)-কে সবদিক দিয়ে উন্নত ক'রে তোলার ভার নেয়, এবং ঐ family (পরিবার)-গুলি যদি আবার সাধ্যমত ঐ ঋত্বিক্‌দের ভরণ-পোষণের ভার নেয়, তাতে বহুলোক মানুষ হ'য়ে ওঠার সুযোগ পায়। কতকগুলি family (পরিবার) যদি গ'ড়ে তোলা যায়, তার প্রভাব পারিপার্শ্বিক অন্যান্য family-র (পরিবারের) উপর গিয়েও পড়ে। এটা জাতি-গঠনের একটা foundation (ভিত্তি)-স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়। Urge (আকুতি) থাকলেই হয়। প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলাম, ও কিন্তু দীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঋত্বিকী চারিয়ে যাচ্ছে। আবার মানুষের জন্য করেও সাধ্যমতো। ওর go-between-এর (দ্বন্দ্বীবৃত্তির) অভ্যাস আছে, নচেৎ আরো ফুটে উঠতো। ঋত্বিকতার কাজ করতে গেলে নিজের চরিত্রের ছেঁদাগুলি বন্ধ করা লাগে। নচেৎ মানুষের উপকার করার সামর্থ্য গজায় না। উপকার করা বলতে আমি বুঝি সুনিষ্ঠ সঙ্গতিশীল চৌকস চরিত্র গঠনে সাহায্য করা। নিজ দৃষ্টান্ত দিয়েই তা' করতে হয়।

অনিলদা—আড়াইশ' পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া তো কম কথা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজন ঋত্বিকের যদি আড়াইশ' পরিবারের উপর প্রভাব-পরিচর্য্যা না থাকে, সক্রিয় শুভেচ্ছা না থাকে, তাহ'লে তার weight (ওজন) কতটুকু?

খেটে-খেটে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য এমন করবে যে সে একচুলও পিছাবে না—নিত্য এগোন ছাড়া। আমাদের পাণ্ডাদের অনেকের পরকে দেবার বুদ্ধি নেই। পরিচর্য্যার বুদ্ধি নেই। তাই বোঝ আমাদের potency (দক্ষতা) কতখানি। মানুষগুলি নষ্ট হচ্ছে প্রত্যাশী হ'য়ে। আমি দেখেছি, লোভ বা প্রয়োজনের খোরাক দিয়ে মানুষকে ধর্ম্মদান করা যায় না, বরং তাকে ইষ্টার্থে দিতে প্রবুদ্ধ ক'রেই ধর্ম্মদান করা যায়। প্রত্যাশাশূন্য হ'য়ে একটা লেবেনচুষ বা রসগোল্লা যে দিল, তারও আশা আছে। মানুষের জন্য ভিক্ষা ক'রে-ক'রে আমার হাতে কড়া প'ড়ে গেছে। কিন্তু নেওয়ার নেশায় যারা কেবল নিয়ে চলেছে, তাদের

পরকাল ঝরঝরে হ'য়ে যাচ্ছে। মানুষকে ধর্ম্মদান মানে urge (আকুতি) দান—to fulfil and uphold the Ideal (আদর্শকে পূরণ ও ধারণ করতে)। মানুষ পায় না, দেয় না ব'লে। প্রত্যাশা নিয়ে দিলে কাজ হয় না। প্রত্যাশা শূন্য হ'য়ে যে পরমপিতা ও পরিবেশের জন্য দেয়-থোয় ও করে, তার বোঝা প্রকৃতি ব'য়ে বেড়ায়। Nature abhors vacuum (প্রকৃতি শূন্যতাকে অপছন্দ করে)। আমি বলি—কর, হও, পাও। কোন ফাঁকির কারবার নেই বিধাতার রাজ্যে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মুখে মানুষ কয়, সে মরতে চায় না, কিন্তু মরার কামই করে। আর, কর্ম্মের ফল যখন চেপে ধরে, তখন সকলের ঘাড়ে দোষ চাপায়। কিন্তু নিজের দোষ যে কোথায় তা' আর দেখে না বা শোধরাতে চেষ্টা করে না। তাই পরমদয়াল লাখ চাইলেও এমনতর মানুষকে রক্ষা করতে পারেন না। হিতাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে একটা মানুষের চলনার ভুল ধরিয়ে দিলে যখন সে চ'টে যায়, তখন ধ'রে নিতে হবে সে নিজের ভাল চায় না। অবশ্য অন্যের ভুল ধরাতে গেলে তার কায়দা জানা চাই। কারও অহং বা আত্মমর্য্যাদায় আঘাত ক'রে নীতিকথা বললে তাতে কাম হয় না। দরদের সঙ্গে মানুষকে গালি দিলেও সে-গালি তার কাছে মিষ্টি লাগে। তুমি রেগে গেছ কি তখনকার মতো তোমার সদুপদেশ দেবার অধিকার রহিত হ'য়ে গেছে। রাগের ঝাল মেটাতে যত বড়-বড় কথাই বল, তার কোন দাম হবে না। সে যাই-হো'ক, যদি কেউ রাগ ক'রেও ভুল ধরিয়ে দেয়, তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা ভাল।

প্রফুল্ল—এক-কথায় মানুষের জীবনচলনার মোক্ষম তুক কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর কণ্ঠে প্রাণকাড়া ভঙ্গীতে সুর ক'রে বললেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—তোমার মনগড়া ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বোধ ছেড়ে দিয়ে, সমস্ত কাজে, সমস্ত চিন্তায়, সমস্ত কথায়, সমস্ত কামনায় একমাত্র আমাকে রক্ষা ক'রে চল, পরিপালন ক'রে চল, প্রাধান্য দিয়ে চল। আমাকে কিছুতেই কখনও sacrifice (ত্যাগ) ক'রো না। এইটুকু যদি ক'রে চলতে পার, তাহ'লে তোমার পালন, তোমার রক্ষণ কখনও পতিত হবে না, কখনও স্খলিত হবে না। অনুশোচনা করবার কোনই কারণ থাকবে না তোমার। শরণ এসেছে শৄ-ধাতু থেকে। শৄ-ধাতুর মানে শুনেছি রক্ষণ।

প্রফুল্ল—ঋত্বিক্-সঙ্ঘের প্রয়োজন থাকবে চিরকাল এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ নির্ভর করে ঋত্বিক্-সঙ্ঘের স্থায়িত্ব ও সুষ্ঠু কর্ম্মতৎপরতার উপর। কী করলে ঋত্বিক্-সঙ্ঘ চিরায়ু হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। ঋত্বিকরাই হ'লো goading teacher of society

(মানবসমাজের সঞ্চালনী শিক্ষক)।…………সব নির্ভর করে তোমাদের উপর। তোমাদের চলন-চরিত্র যদি ঋত্বিকোচিত হয়, ইষ্টার্থী লোকসেবাই যদি তোমাদের স্বার্থ, ধ্যান, জ্ঞান, জীবনতপ হ'য়ে ওঠে, তাহ'লেই হয়। এতে তোমাদের সাহচর্য্যে এসে অনেকে ঋত্বিক্ হওয়ার মতো তৈরী হবে, তোমাদের ছেলেপেলেদের মধ্যেও এটা সঞ্চারিত হবে। তাই লোকের অভাব হবে না। অবশ্য instinct (সহজাত-সংস্কার)-ওয়ালা মানুষ না হ'লে, সবাইকে দিয়ে ঋত্বিকতার কাজ হবে না! যাদের মধ্যে এই ধাঁজ আছে তারা যদি সুনিষ্ঠ তপপ্রাণতা নিয়ে চলে, তাদের বিয়ে-থাওয়া ও পারিবারিক চর্য্যা যদি ঠিক থাকে, তবে কালে-কালে অনেক ভালমানুষ গজাবে। আর চাই ঋত্বিকীটা চারিয়ে দেওয়া। ঋত্বিক্ চাকুরে বা ভাতাভুক হয় এ আমার ভাল লাগে না। ওতে তারা বাড়তে পারে না। আমি চাই তারা লোকের স্বতঃস্বেচ্ছ প্রীতি-অবদানের উপর দাঁড়াক। ঋত্বিক্ যজমানদের সংসারের সর্ব্বতোমুখী কল্যাণবিধায়ক অভিভাবকস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াক এবং যজমানরাও সাধ্যমতো তাদের প্রতিপালন করুক। ঋত্বিক্‌রা ঋত্বিকীর উপর দাঁড়ালে ঋত্বিক্ ও যজমানের মধ্যে একটা material cementing of interest (বাস্তব স্বার্থ-সম্বন্ধতা) হবে। ঋত্বিক্ যজমানকে না দেখে পারবে না, যজমান ঋত্বিক্‌কে না দেখে পারবে না। একটা যজমান মরলে, পড়লে বা বিব্রত-বিধ্বস্ত হ'লে ঋত্বিকের কটক ন'ড়ে যাবে—নিরাকরণী সরঞ্জাম ও সঙ্কল্প নিয়ে। ঋত্বিক্‌দের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি মানুষই তাদের সেব্য ও সম্বর্দ্ধনীয়। এই ইষ্টানুগ স্বতঃদায়িত্বশীল সেবাপ্রাণতার অভ্যাস চরিত্রগত হ'লে তখন কাতারে-কাতারে লোক ছুটে আসবে দীক্ষার জন্য। নিজের দীক্ষিত হোক বা অপরের দীক্ষিত হোক বা অদীক্ষিত হোক, সবাইকে তোমরা ভালবাসবে, সেবা দেবে, জীবনে সুখী ক'রে তুলবে, বড় ক'রে তুলবে। তবেই না তোমরা ঋত্বিক্!…………মরণকে মিস্‌মার ক'রে এগিয়ে চল তোমরা পরমপিতার লোকরক্ষণী, লোকবর্দ্ধনী অভিযানে। মানুষ খোলা চোখে দেখে নিক ধর্ম্ম কী বস্তু। ধর্ম্ম এসেছে ধৃ+মন্ থেকে অর্থাৎ যা' অস্তিত্বকে ধ'রে রাখে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ এখন দিব্য আবেগে ডগমগ। সারা দেহে এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে যে কার সাধ্য তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরায়? হয় অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকতে হবে তাঁর পানে, নয়তো নিমীলিত নেত্রে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে ঐ ধ্যানানন্দকর মূর্ত্তি।…………সবাই এখন তন্ময়।

একটু বাদে আবার কথাবার্ত্তা সুরু হ'লো।

প্রফুল্ল—মানুষকে অর্থনৈতিক জীবনে আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোলা ঋত্বিক্‌দের একটা প্রধান দায়িত্ব, কিন্তু বহু ঋত্বিকেরই সে-বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। এ-সম্বন্ধে কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—ওরে পাগল! বাপ-দাদা হাঁড়ি গড়ে,

আর এ-দিকে ঐ কুমোরদের বাড়ীর ছোট্ট ছেলে পাশে ব'সে থাকে, চেয়ে-চেয়ে দেখে, কখনও বা তামাক সেজে দেয়। একদিন কোন্ ফাঁকে লাঠি দিয়ে দেয় এক ঘুরান, বেরিয়ে যায় কেইসান হাঁড়ি। এমনি ক'রেই তো মানুষ শেখে। তোমরাও যদি লেগে থাক মানুষের পিছনে, দেখ, শোন, বোঝ, কর, করাও, তবে পারবেই। পারার মালমশলা তোমাদের ভিতরে মজুত আছেই। চাইলেই পারবে, করলেই পারবে। "Seek and ye will find, knock and it will open." (খোঁজ, তাহ'লে পাবে, (দরজায়) টোকা দাও, তাহ'লে খুলবে)। যা' করব তা' প্রাণমন ঢেলে করব, thoroughly (পুরোপুরি) করব, তার মধ্যে কোন ফাঁক রাখব না—এমনতর রোখ থাকলে দিন-দিন মানুষের ability ও achievement (যোগ্যতা ও কৃতিত্ব) বেড়ে যায়। গোড়ায় চাই ইষ্টানুগ লোককল্যাণবুদ্ধি। অপরের ভাল না করতে পারলে আমারই সমূহ ক্ষতি হ'য়ে যাচ্ছে, এমনতর একটা ব্যাকুল বোধ ও চেষ্টা থাকলে, তাই-ই ভিতরের শক্তিকে টেনে বের ক'রে আনে।

কমলাক্ষদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ঠাকুর! আপনাকে আমার খুব দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ইচ্ছা-অনুপাতিক কিছুই করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার efficiency (দক্ষতা) থেকে দিও, existence (অস্তিত্ব) থেকে দিও না, তাহ'লে আমিই loser (ক্ষতির ভাগী) হব। তোমরা যদি বেড়ে না ওঠ, তাহ'লে তোমাদের কাছ থেকে পেয়েও আমার সুখ নেই, তোমাদের দিয়েও আমার সুখ নেই। তবে আমাকে যাদের দেওয়ার বৃদ্ধি হয় তারাই ভাগ্যবান, যাদের আমাদের কাছ থেকে নেওয়ার লালসা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, তারা দিন-দিন হতচ্ছাড়া হ'য়ে ওঠে। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি, কর্ম্মশক্তি ও যোগ্যতার কাম নিকেশ হ'তে থাকে। কেউ-কেউ পাকে-প্রকারে কায়দা ক'রে আমার কাছ থেকে বেশী-বেশী নিতে পারলে নিজেদের বুদ্ধিমান ব'লে বিবেচনা করে, অথচ আমার উপচয়ী কোন কাজে অর্থাৎ লোককল্যাণের কাজে নিজেদের সাধ্যমতো ব্যাপৃত রাখার ধার ধারে না। এর মানে নিজের ক্ষতিসাধনেই তারা তাদের বুদ্ধিকে নিয়োজিত করেছে। আমি বুঝিয়ে বললেও শোনে না। কিন্তু কঠোর হ'তেও পারি না। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন তার বিহিত না করলে পাছে কী না কী হয় এই আতঙ্কে কাবু হ'য়ে পড়ি। দায় উদ্ধার করতেই হয় আমাকে। কিন্তু কাজটা ভাল করি না। প্রত্যেককে pursue (অনুসরণ) ক'রে, active (সক্রিয়) ক'রে তুলতে প্রত্যেকের পিছনে যতখানি time ও attention (সময় ও মনোযোগ) দেওয়া লাগে, লোক বেড়ে যাওয়ায় এবং শরীর অপটু হ'য়ে পড়ায় তাও পারি না। অথচ আমার হ'য়ে যে কেউ একাজ করবে, তেমন লোকও বিশেষ দেখি না। যারা একটু নড়াচড়া ক'রে, তাদের উপর অনেক কাজের চাপ। তবে এ-কথা ঠিক, সামর্থ্য থাকতেও যারা

কাজ করে না, আলস্যে সময় কাটায়, তারা বিবেকী নয় মোটেই। এই রকমটাও pauperism-এর (দারিদ্র্যব্যাধির) একটা prime symptom (প্রধান লক্ষণ)—তা' যতই ভদ্রবেশী হো'ক না কেন।

প্রফুল্ল—লোককে কাজে না লাগানও তো তাদের পক্ষে ক্ষতিকর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা কি এখানে চাকরী করতে এসেছ যে তোমাদের পদে-পদে হুকুম ক'রে কাজ করাতে হবে? আর, কাজের সম্বন্ধে তো মোটামুটি আমার নির্দ্দেশ দেওয়াই আছে। একজন ঋত্বিকের বাইরে গেলে কাজ আছে, এখানে কোন কাজ নেই, তা' তো হ'তে পারে না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানা ছাড়ে না। এখানে ব'সে কত কিছু করার আছে। যে যেমন পারে দেখে-শুনে মাথা খাটিয়ে করতে যদি লেগে যায়, তাহ'লেই হয়। কাজ না করার বুদ্ধি যাদের, তাদের কোন কাজের দায়িত্ব দিলেও নানা অজুহাতে এড়িয়ে যায়। Continuity (ক্রমাগতি) বজায় রাখতে পারে না। তাদের complex (প্রবৃত্তি) যেখানে টানে, সেই ঘূর্ণি'র ভিতর গিয়ে পড়ে। এইতো অবস্থা। এটা তো গোলামখানা নয় যে তাগিদ ও চাপ দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হবে, তবেই মানুষ কাজ করবে, নইলে নিজের আগ্রহে করবে না কিছু। আমিও ছেড়ে দিয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখি—কে কী করে, কে কিভাবে চলে। যা-হো'ক, তোমরা যারা করতে চেষ্টা কর তাদের কিন্তু উচিত নিজেরা নিজেদের করণীয় করার সঙ্গে-সঙ্গে অন্যদেরও তাদের স্ব-স্ব করণীয় করতে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা। আর, তা' উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে—সুকৌশলে—স্ফূর্ত্তি জুগিয়ে। অনুযোগ ক'রে বা দোষ ধ'রে কাউকে উদ্দীপ্ত করা যাবে না। চেষ্টা করা সত্ত্বেও কাউকে-কাউকে চেতাতে পারবে না। তাদের nerve (স্নায়ু)-ই ঢিলে। তাতেও তাদের উপর চটতে পারবে না। স'য়ে-ব'য়ে যাকে দিয়ে যতটা করান যায়, তাই করতে হবে।

প্রফুল্ল—এ-সব তো আমাদের কাজ নয়। আমাদের উপর যে কাজের দায়িত্ব আছে, তাই-ই তো সম্যক্‌ভাবে ক'রে ওঠা যায় না। লাগাজোড়া খেটেও পারা যায় না। তার উপর এত দিকে নজর দিতে গেলে কোনটাই সুষ্ঠুভাবে হ'য়ে উঠবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের সামর্থ্যের ইতি নেই। যতই করবে, ততই পারবে। কালে-কালে এমন দক্ষ হ'য়ে উঠবে যে একসঙ্গে অনেক কাজ করতে পারবে। নিজে charged (উদ্দীপ্ত) হ'য়ে থাকলে লহমায় মানুষকে inspired (প্রেরণাদীপ্ত) ক'রে দিতে পারবে। তোমার উপর যে কাজের দায়িত্ব আছে সে দায়িত্ব তো উদ্‌যাপন করতেই হবে। সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্য দিতে হবে যাতে আমার প্রত্যেকটি ইচ্ছা পূরণ হয়। তার জন্য নিজের কাজের ফাঁকে-ফাঁকে যেখানে, যখন, যা' করতে পার, তা' করবে। প্রত্যেকের কাজেই সাধ্যমতো সাহায্য, সহযোগিতা করবে। এমনি

ক'রেই কাজের span (বিস্তার) বেড়ে যাবে, personality (ব্যক্তিত্ব)-এর span (বিস্তার) বেড়ে যাবে, কর্ম্মশক্তি ও আয়ু পর্য্যন্ত বেড়ে যাবে।

প্রফুল্ল—অনেককে দেখেছি তারা আমাকে utilise করে (কাজে লাগায়), কিন্তু যেখানে তাদের সহযোগিতা আমার প্রয়োজন, সেখানে সুকৌশলে পাশ কেটে দাঁড়ায়। এমনতর insincerity (কপটতা) দেখলে মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেই নিও যে অনেকে ওরকম করতে পারে। তৎসত্ত্বেও মানুষ যখন তোমার সাহায্য-সহযোগিতা চায়—বিশেষতঃ সত্তাপোষণী ব্যাপারে বা ইষ্টকাজে, তখন পারতপক্ষে তাদের বিমুখ ক'রো না। তোমার পক্ষে যেমন, যতটুকু সম্ভব তা' দিও, ক'রো। এতে শেষ পর্য্যন্ত ঠকবে না। পরমপিতার Divine economy (ভাগবত বিধান) সতত সাহায্য করবে তোমাকে। আর, অন্যের insincerity (কপটতা) দেখলে তার উপর চটবে কেন? সে তো তোমার সহানুভূতির পাত্র। অমন ক্রূর ব্যাধিতে যাকে ধরেছে, তার উপর চটার কি আছে? তাকে সুস্থ ক'রে তুলবার জন্য চেষ্টা করবার আছে—যদিও সে নিরাময় নাও হ'তে পারে। আমাকে তোমরা যারা ভালবাস, তাদের করণীয়ের অন্ত নেই পৃথিবীতে। তাই বলি, শরীর শক্ত কর, আরো সহনপটু কর। তবে একটা কথা বলি—মানুষকে পট ক'রে ভাল বা মন্দ ব'লে ভেবে নিও না। কে কোন্ অবস্থার মধ্যে প'ড়ে কী করে, সেটা সহানুভূতির সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা ক'রো। আর, অযথা প্রত্যাশা পুষে রেখে কষ্ট পেয়ো না। Worst (সবচেয়ে খারাপ) যা' হ'তে পারে, তার জন্য প্রস্তুত থেকেও সেই পরিস্থিতির ভিতর-দিয়ে কিভাবে best (সর্ব্বোত্তম)-কে attain (লাভ) করা যায় তার বুদ্ধি এঁটে রেখো মাথায়।

২০শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ৭।১০।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় পশ্চিমাস্য হ'য়ে (রোহিণী রোডের দিকে মুখ ক'রে) ব'সে আছেন। এমন সময় সুধাংশুদা (মৈত্র), হরেনদা (বসু) প্রমুখ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরেনদাকে লক্ষ্য ক'রে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে! আনন্দ-বাজারে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে তো?

হরেনদা—আপনার দয়ায় একবেলা ডাল-ভাতের ব্যবস্থা বেশ ভালভাবেই হচ্ছে। পিকদের পেটে সবাই খুব পরিতোষ-সহকারে খায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই হ'লেই হয়। তবে দু'বেলা ব্যবস্থা করতে না পারলে অনেকেরই অসুবিধা হয়। দেখা যাক পরমপিতার দয়ায় কী হয়। (একটু চুপচাপ থেকে পরে আবার বললেন) পরমপিতার দয়ায় প্রচুরও যদি জোটে, তাহ'লেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়াটা বাদ দেওয়া ভাল। ওতে বরং শরীর

ভাল থাকে। ঠিক খাওয়া ও ঠিক চলনে মানুষের চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত, পা প্রভৃতি প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সঙ্গে-সঙ্গে মন মস্তিষ্ক ever ready ও ever active (সদাপ্রস্তুত ও সদাসক্রিয়) হ'য়ে ওঠে, অবশ্য যদি শরীর মোটামুটি সুস্থ থাকে। আবার, শরীর রুগ্ন হ'লেও অনেকখানি make up (পরিপূরণ) করে এতে। গোড়ার আমলে আশ্রমে আনন্দবাজারে কি রকমটা ছিল! একটা লঙ্কা পাতে পড়লে যেন feast (ভোজ), একটু কচুর শাক হ'লে উৎসব। ঐ খাওয়া খেয়ে কী খাটাটা খাটতো। সবাই উৎসাহ ও আনন্দে মাতাল হ'য়ে থাকত। বেশীর ভাগ লোক অজ্জী ছিল, বাইরে কোথাও গেলে ফেরবার পথে একটা লাউ হাতে ক'রে আসলেও আসত। Untussling (বিরোধহীন) রকমটা বেশ prominent (প্রধান) ছিল। পরস্পরের মধ্যে কী ভাব! পরস্পর পরস্পরকে সেব দেবার জন্য উম্মুখ হ'য়ে থাকত। একজনের হয়তো কাপড় ময়লা হয়েছে। সে কাজে ব্যস্ত আছে। কোন্ ফাঁকে যে কে এসে সেটা সাফ ক'রে দিয়ে যেত তার হদিশ পাওয়া যেত না। কী সুখের দিনই গেছে! তখন পয়সা ছিল না, কিন্তু প্রাণ ছিল এন্তার। আর, মা কী করাটাই না করতেন সবার জন্য!

সন্ধ্যায় কয়েকজন কর্ম্মীর চিঠি পড়ে শোনান হ'লো শ্রীশ্রীঠাকুরকে। কার কাছে কী লিখতে হবে, সে-সম্বন্ধে তিনি নির্দ্দেশাদি দিলেন। নির্দ্দেশগুলি টুকে নিয়ে উঠে যাবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই প্রফুল্ল! তুই নাম করিস্ তো?

প্রফুল্ল—কোন-কোন দিন ক্লান্তিবশতঃ সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরী হ'য়ে যায়। সেদিন আর ভাল ক'রে নাম-ধ্যান করা হ'য়ে ওঠে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম-ধ্যান রোজ ঠিকমতো করবি। ঐদিকে কমতি হ'লে জীবনের সব ক্ষেত্রেই খাঁকতি ও অসামঞ্জস্য দেখা দেবে। বিশেষ ক'রে তুই কর্ম্মীদের কাছে চিঠিপত্র লিখিস্, তোর আচরণ যদি ঢিলে হয়, অজ্ঞাতসারে সেটা অনেকের মধ্যে চারিয়ে যাবে। মানুষ যদি ঠিকমতো চলে, করে, তাতে শুধু তারই ভাল হয় না, পরিবার-পরিবেশের অনেকেরই ভাল হয় তাতে। আর, তার চলায় যদি ত্রুটি থাকে, তাতে শুধু তারই ক্ষতি হয় না, তার পরিবার-পরিবেশেরও ক্ষতি হয় তাতে।

একজন সৎসঙ্গী ভাই ব্যবসায়ের নানা সমস্যার কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—কিভাবে চললে এই সব অসুবিধা এড়ান যায়, আপনি দয়া করে ব'লে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রথম জিনিস হচ্ছে—Sweet serviceable behaviour within and without (ভিতরে-বাইরে মিষ্ট সেবাপ্রাণ সদ্ব্যবহার)।

ভিতরে-বাইরে—এ-কথার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। নিজের অন্তরটাকে যদি সদ্ভাবে ভাবিত না করা যায়, তবে শুধু বাহ্যিক মোলায়েম ব্যবহারে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা যায় না। ভিতরের ভাব বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তাই, নিজেকে একই সঙ্গে দুই দিক থেকেই নিয়ন্ত্রিত করা লাগে। আবার, খরিদ্দার ও মহাজনদের সঙ্গে যেমন মিষ্ট সেবাপ্রাণ ব্যবহার করা লাগে, তোমার দোকানে যদি কোন কর্ম্মচারী থাকে, তার বা তাদের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করা লাগে। কর্ম্মচারীকে শুধু টাকা দিয়ে তার মন জয় করা যায় না। তার সঙ্গে আপনজনের মতো ব্যবহার করতে হয়। তাহ'লেই সে আগ্রহভরে যা' করণীয় তা' করতে উৎসাহিত হয়। এতে তারও লাভ, তোমারও লাভ। আবার, কথায় বলে খদ্দের লক্ষ্মী। তাই খরিদ্দারদের সঙ্গে খুব সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে হয়। এমন হৃদ্য ব্যবহার করতে হয় যে, একবার যে তোমার দোকানে ঢুকেছে, সে যেন তোমার সান্নিধ্য পাবার প্রলোভনে বরাবর তোমার দোকানে আসতে বাধ্য হয়। আর, জিনিসপত্রও রাখতে হয় খাঁটি ও যথাসম্ভব সুবিধা-দরে দিতে হয়। সেবাবুদ্ধিকে যদি বড় ক'রে ধর, তাহ'লে তোমার লাভ হবেই। আর দাঁ মারার বুদ্ধি যদি প্রবল হয়, তাহ'লে সেবাবুদ্ধি হারাবে এবং ব্যবসায়ে দাঁড়াতে পারবে না। ধর্ম্মই হ'লো ব্যবসায়ের দাঁড়া। আর, ধর্ম্ম মানে অন্যকে বাঁচিয়ে নিজের বাঁচাকে অটুট করা। আর, ব্যবসায় কথার মানেও হ'লো সেই লোক-পরিচর্য্যা যা' দিয়ে মানুষকে বিনাশ থেকে রক্ষা করা যায়।

তারপর হ'লো direct supervision (প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ)। অপরের উপর ছেড়ে দিলাম, নিজে দেখাশুনা করলাম না, তাতে কিন্তু ভাল হয় না। ব্যবসায়ের প্রত্যেকটা ব্যাপার নিজের শ্যেনদৃষ্টির মধ্যে থাকা চাই। যে-সব ছিদ্র দিয়ে লোকসান আসতে পারে তা' বন্ধ করা লাগে। আর, যাতে বিহিত লাভ হ'তে পারে, আগে থাকতে তার প্রস্তুতি রাখতে হয়। নিজস্ব একটা চিন্তা চাই, ধ্যান চাই এ-বিষয়ে। লোকের কী প্রয়োজন, কিভাবে তা' মেটান যায়, চোখ-কান খোলা রেখে তা ইয়াদে রাখতে হয়। পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে এতখানি আছে কিন্তু। জগৎটা কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। ক্রমাগত তার পরিবর্ত্তন হচ্ছে। তোমার ব্যবসায়ের উপর কোন্‌টার কী প্রভাব আসতে পারে, দেখেশুনে ভেবে তা' আঁচ ক'রে নেওয়া চাই।

তৃতীয় হ'লো—Progressive profitable management with due up-to-date accounting (দৈনন্দিন বিহিত হিসাবপত্রসহ উন্নতিমুখর লাভজনক পরিচালনা)। হিসাবপত্র ঠিক না থাকলে বোঝা যায় না, ব্যবসায়ের বাস্তব অবস্থাটা কী। আর, শুধু স্থিতাবস্থায় চালিয়ে গেলে হবে না। তাকে আরো উন্নতির দিকে চালিয়ে নিতে হবে। উন্নতিমুখী চেষ্টা থাকলে উন্নতিও কিছু-কিছু হয়, আবার স্থিতিটাও পাকা হয়। উন্নতিমুখী চেষ্টা না থাকলে

ক্রমে-ক্রমে উৎসাহ উদ্দীপনা ঢিল পড়ে। কখন যে অবনতি সুরু হ'য়ে যায় ঠিক পাওয়া যায় না।

চতুর্থ হ'লো—Avoidance of go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি অর্থাৎ কথার খেলাপ পরিহার ক'রে চলা)। কথার মূল্য না থাকলে কখনও ব্যবসায়ে দাঁড়ান যায় না। ধর, একজন মহাজনের কাছ থেকে তুমি ধারে মাল আনলে, ওয়াদা দিলে 'অমুখ তারিখে টাকা দেব', কিন্তু তা' দিলে না। এমনতর রকম থাকলে কিন্তু কিছুতেই লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারবে না, তোমার ব্যবসায় অচল হ'য়ে উঠবে। কথা দিলে, তা' পালন করাই চাই। বরং সময় বেশী নেবে, কিন্তু সময়ের মধ্যে দেওয়াই চাই। বেশী সময় নিয়ে আগে-আগে যদি দিয়ে দিতে পার, তাহ'লে আরো ভাল হয়। আবার খরিদ্দারের সঙ্গেও কথা ঠিক রাখতে হয়। ধর, তোমার দোকানে এসে একজন একটা হর্‌লিক্‌স্‌ চাইলো। তুমি বললে—এখন নেই, বিকালে দিতে পারব। কিন্তু উদ্যোগ ক'রে আনিয়ে রাখলে না। বিকালে খরিদ্দারটি এসে ফিরে চ'লে গেল। তুমি একটা ধানাই-পানাই অজুহাত দিলে। কিন্তু খরিদ্দারের বুঝতে বাকী রইল না কিছু। তুমি যে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ও মিথ্যেবাদী তা' ঠিকভাবেই ধরিয়ে দিলে তাকে। সে যদি আর কোনদিন তোমার দোকান না মাড়ায়, তার দোষ কি বল? তাই, কথা দেবার সময় সাবধানে দিতে হয়। বলতে হয়—'চেষ্টা করব'। আর, 'চেষ্টা করব' —বললে করতেই হয়। আবার, খরিদ্দারের বিশেষ প্রয়োজন দেখলে বলতে হয়—আমি সময়মতো এনে দিতে পারি কিনা, আপনি বরং দয়া ক'রে অমুক দোকানে দেখুন। যেখানে যেমন বলা সমীচীন তাই বলবে। তুমি নির্লোভ ও খরিদ্দারের সুবিধার দিকটা বড় ক'রে ভাব, এইটে যদি সে বুঝতে পারে, তাতেই তোমার লাভ বেশী। খরিদ্দার যদি উপায় করতে পার, ব্যবসায়ে টাকা উপায়ের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। কাউকে কোন কথা দিয়ে পাছে ভুলে যাও, সেইজন্য এক জায়গায় তা' নোট ক'রে রাখা ভাল। আর, টাকাপয়সা লেন-দেনের ব্যাপারে এমন কতকগুলি source (উৎস) ঠিক ক'রে রাখতে হয়, যাতে একটা গড়বড় হ'য়ে গেলেও অন্য একটা জায়গা থেকে কাজ হাসিল করতে পার। তবে ধার-বাকীর মধ্যে যত কম যেয়ে পার, সেই-ই লাভ।

শেষ কথা হ'লো—At least 1/4th of the profit should always be added to the capital (লাভের অন্ততঃ ১/৪ অংশ সর্ব্বদা মূলধনে যোগ করতে হবে)। আয় বুঝে ব্যয় করা একান্ত প্রয়োজন। তোমার যদি এক টাকা আয় হয়, তবে তা' থেকে বড় জোর বার আনা তোমার সংসার খরচের জন্য নিতে পার। এতে যদি কিছুটা কৃচ্ছ্রতার ভিতর-দিয়েও চলতে হয়, তাও চলা ভাল। বাদবাকী চার আনা তুমি মূলধনে যোগ দেবেই কি দেবে। এইভাবে যদি চল, তাহ'লে তোমার ব্যবসায় দিন-দিন progressive (উন্নতি-

মুখর) হ'য়ে উঠবে। মানুষ যদি strict principle-এ (কড়া নিয়মে) চলে, তবে প্রথমটা তা'র কষ্ট হলেও, সেই কষ্টটাই তা'র ভবিষ্যৎ সুখের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। যারা নিজেদের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের প্রতি দৃকপাত না ক'রে অতিরিক্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস খোঁজে, কষ্ট তাদের সাথের সাথী হ'য়ে থাকে। তাই ব'লে সত্তাপোষণের জন্য যা' প্রয়োজন, সে-বিষয়ে কিন্তু কার্পণ্য করা ঠিক নয়। সে-ব্যাপারে ঋণ না ক'রে অর্জ্জনপটুতা বাড়াতে হয় রকমারি পন্থায়।

প্রশ্ন—ব্যবসায়ের আয়ে যদি সংসার না চলে, তাহ'লে আর কিভাবে অর্জ্জনপটুতা বাড়ান যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওসব ব'লে দিয়ে হয় না। তোমার ভিতরে যদি অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি ও শ্রমশীলতা থাকে, তাহ'লে পরিস্থিতির ভিতর প'ড়ে তোমার ভিতর থেকেই কত এৎফাকী কায়দা ফক্ ক'রে বেরিয়ে যাবে, তা'র কি ঠিক আছে ? তুমি নিজেই কি একজন কম ? ভাব না ! চল না ! কর না ! পথ তো তোমার সামনে এন্তার খোলাই রেখে দিয়েছেন পরমপিতা। বুদ্ধি-বিবেচনা ও শক্তিও কম দেননি।

দাদাটি উৎফুল্ল হ'য়ে বললেন—এইবার মনে হচ্ছে পথ পাব, পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—জয়গুরু।

৫ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৩। ১০। ১৯৪৭)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), গোপেনদা (রায়), যোগেনদা (হালদার), জিতেনদা (রায়), প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখ অনেকেই কাছে আছেন।

কাম ও প্রেম-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-ভালবাসা পরমপিতায় সার্থকতা লাভ করে না, তাই-ই কাম। আর যে-ভালবাসা পরমপিতায় সার্থকতা লাভ করে, তাই-ই প্রেম। ইষ্টানুরক্তি ছাড়া অন্য কিছুতেই মলিনতা পরিশুদ্ধ হয় না, আর ঐ জিনিসটি যেখানে ফুটে ওঠে, সেখানে মলিনতা ঠাঁই পায় না। চণ্ডীদাস আর রামী ধোপানির ভালবাসা মানুষের চোখে কলঙ্কময় ছিল, কিন্তু বাশুলীকে অবলম্বন ক'রে সেই কলঙ্ক পবিত্রতার চরণ-চিহ্ন এঁকে গেছে। আমার মনে হয়, যদি কেউ সত্যিকার মাতৃভক্ত হয়, সে ইষ্টানুরাগী হবেই। আরো মনে হয় কারো মাতৃভক্তি যদি তাকে ইষ্টে পৌঁছে না দেয়, তবে ঐ ভক্তির মধ্যেই খাঁকতি আছে। শুধু মাতৃভক্তি কেন, সবরকমের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ-সম্পর্কেই এ-কথা খাটে। একজন দেশপ্রেমিক, অথচ সে পরমপিতার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন নয়, এ কেমন ক'রে সম্ভব হয় তা' আমি বুঝি না। ভালবাসা যদি খাঁটি হয় তবে সেই ভালবাসার সুতো হে'টে-

হেঁটে ভগবান পর্য্যন্ত পৌঁছাবেই। এই হ'লো ভালবাসার রীতি। যেখানে তা' হয় না, সেখানে গোলমাল আছে, তা' ধ'রেই নেওয়া চলে। আবার, শুধু আকাশের ভগবানকে মানলে হবে না। জীয়ন্ত সদ্‌গুরু-রূপী ভগবানকে খুঁজে পাওয়া চাই।

কেষ্টদা—অনেকেই তো গুরুবাদকে একটা অন্ধ কুসংস্কার ব'লে মনে করে। তাদের ধারণা গুরুকরণ বাস্তব জীবনের রকমারি সমস্যার সমাধানে আদৌ কোন সাহায্য করতে পারে কিনা সন্দেহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্যের হাসি হেসে বললেন—ঐ রকমই মনে হয়। গুরুকরণ বলতে আমি বুঝি গুরুকে জীবন-সর্ব্বস্ব ক'রে নেওয়া। আবার গুরুও হওয়া চাই প্রকৃত গুরু, যিনি আলোর রাজ্যে নিয়ত বসবাস করেন অর্থাৎ গুরুনিষ্ঠা যাঁর কিছুতেই টলে না। এমনতর গুরুকে পেয়ে সক্রিয় তাৎপর্য্যে গুরুময় হ'য়ে চললে মানুষের যে কী হয়, তা'র দৃষ্টান্ত তো সচরাচর মানুষ চোখে দেখতে পায় না, তাই ঐ সব কথা বলে। তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির আশায় গুরু ভজলে গুরুশক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু গুরুগতপ্রাণ হ'য়ে গুরুর লোক-কল্যাণ ইচ্ছাপূরণে যে নিজেকে ঢেলে দেয়, তার হাড়ে ভেল্কি খেলে যায়। পদে-পদে সে অসাধ্যসাধন করে। হনুমানের জীবনটা দেখলেই হয়। ……… আসল জিনিস হ'লো সত্তা। এই সত্তাকে ধারণ ক'রে রাখে যা' তাই-ই ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে যিনি জেনেছেন, realise (উপলব্ধি) করেছেন, materialise (বাস্তবায়িত) করেছেন, নিরূপিত করেছেন অর্থাৎ নিঃশেষে রূপ দিয়েছেন নিজ জীবনে, তিনিই হচ্ছেন আচার্য্য বা সদ্‌গুরু। তাঁকে গ্রহণ ও অনুসরণ করাই চাই—কারণ, তিনি হলেন মানুষের বাঁচা-বাড়ার পথ, আর সপরিবেশ বাঁচা-বাড়াই মানুষের চিরন্তন কাম্য। ঐ আচার্য্য বা আদর্শকে যারা follow (অনুসরণ) করে, তাদের নিয়েই গ'ড়ে ওঠে সমাজ। Common Ideal (অভিন্ন আদর্শ)-কে ভালবাসার দরুন তারা normally (স্বভাবতঃই) inter-interested (পরস্পর-স্বার্থান্বিত) হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেক community (সম্প্রদায়) তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কাজ করে। এই কাজ মানে সেবা। এমনতর পারস্পরিক সেবায় সকলেই উপকৃত হয়। এইভাবে সমাজ যত consolidated (সংহত) হ'য়ে ওঠে through inter-interested service (পারস্পরিক স্বার্থসম্বন্ধ সেবার ভিতর-দিয়ে), ততই তা' সব-দিক-দিয়ে powerful (শক্তিমান) হ'য়ে ওঠে। এমনতর একটা শক্ত ভিত ও সুন্দর সামাজিক পরিবেশ গ'ড়ে না উঠলে ব্যক্তি শত চেষ্টা সত্ত্বেও সুষ্ঠুভাবে সত্তাসম্বর্দ্ধনার অধিকারী হ'তে পারে না। তাহ'লেই ভেবে দেখেন ধর্ম্মেরই বা প্রয়োজন কী, গুরুরই বা প্রয়োজন কী, যাজনেরই বা প্রয়োজন কী, আর সমাজসেবারই বা প্রয়োজন কী। গোড়া কেটে

আগায় যতই জল ঢালুন, কাজের কাজ কিছু হবে না। মানুষের প্রবৃত্তি-অভিভূতি, স্বার্থ-অভিভূতি দূর করতে গেলে তাকে গুরুস্বার্থী ক'রে তুলতে হবে। আর, গুরুস্বার্থী হ'লেই সে সমষ্টিস্বার্থী হবে। তাই সমাজকে বাঁচাতে গেলে গুরুকরণ চাই-ই কি চাই।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখেন কেষ্টদা! মানুষই মূল্যবান বস্তু, জীবনই মূল্যবান বস্তু, টাকা-পয়সার কোন দাম নেই যদি তা' মানুষের সেবায় না লাগে, জীবনের সেবায় না লাগে। প্রয়োজনের দিকটা বাদ দিয়েও অনেকের অর্থের প্রতি একটা আসক্তি জন্মে। অর্থাসক্তির এমন একটা কুপ্রভাব হয় যে তার ফলে মানুষ মানুষকে sacrifice (ত্যাগ) করতে কুণ্ঠিত হয় না। এর মতো foolishness (মূর্খতা) আর নেই। টাকা-পয়সা প্রয়োজনীয় জিনিস হ'লেও আমার কিন্তু তা' ছুঁতে ইচ্ছা করে না—গু ব'লে মনে হয়, মনে হয় devil's dung (শয়তানের বিষ্ঠা)।

একটি দাদা এসে তার ব্যক্তিগত কতকগুলি সমস্যার কথা নিবেদন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—কষ্ট দেখে ভয় পেয়ো না। কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না। আর, পরিবার-পরিবেশের জন্য ন্যূনতম ত্যাগ স্বীকার করতে তুমি যদি নারাজ হও, তারাও কিন্তু তোমার বেলায় অমনতরই হ'য়ে চলবে। তার ফলে suffering (দুর্ভোগ)-ই তোমার সাথী হবে। স্বস্তির জন্য যা' করণীয়, তা' করতে যদি প্রস্তুত না থাক, তাহ'লে বুঝতে হবে অস্বস্তির প্রতি তোমার অনুরাগ অসীম। তার ফলে যা পাওয়া যায়, সেই পাওয়া তোমার জন্য অবধারিত হ'য়ে থাকবে। তাই কে কী করলো না করলো, সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে তোমার সাধ্যমতো প্রত্যেকের ভাল করতে চেষ্টা ক'রো। অবশ্য আত্মরক্ষার প্রতি নজর রাখাটা সব সময়ই দরকার। আমার বাবা বলতেন—মানুষের ভাল করতে গেলেও এমনভাবে করা ভাল, যাতে সেই করাটা আমারই অমঙ্গলের কারণ হ'য়ে দাঁড়াতে না পারে। আগে আমি লোককে টাকা-পয়সা যা' দিতাম, এমনিই দিয়ে দিতাম। একজন যে সাহায্য হিসাবে কিছু নিল বা পেল, তার কোন স্বীকৃতি সে নিজ হাতে লিখে দিয়ে যেত না। পরে দেখলাম, এইভাবে সাহায্য দেওয়াটা একটা বিপদের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। তারপর থেকে খাতাপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কালের আবর্তের মধ্যে প'ড়ে পদে-পদে সাদামাঠা ব্যাপারের মধ্যেও কালিমার ছাপ পড়ে। তাই শুভবুদ্ধি নিয়ে কুশলকৌশলী হ'য়ে অসৎ যা' তার নিরাকরণ ক'রে চলা লাগে। সরল হওয়া ভাল, কিন্তু অপরের কুটিলতা পূর্বাহ্নেই ধরতে বা নিরাকরণ করতে না-পারাটা ভাল নয়। 'যেইজন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।' কেষ্ট ঠাকুর ছিলেন চতুরচূড়ামণি। আমরাও যদি তাঁর পথে চলি, আমাদের ভিতরও চাতুর্যের সম্পদ্ জেগে উঠবে। অর্থাৎ আমরা শুধু ভোল বা বোল বা ভেল দেখে ভুলব না। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে যথাযথভাবে

দেখে নেব কোথায়, কার বা কিসের ভিতর আসল বস্তু কতখানি আছে। ভালর মধ্যেও বা খারাপ কতখানি আছে, খারাপের ভিতরও বা ভালর সম্ভাব্যতা কতখানি আছে। পক্ষপাতহীন এমন দৃষ্টিই বিজ্ঞানদৃষ্টি। এই দৃষ্টি না থাকলে মানুষ নিজ ধারণারঞ্জিত দর্শনের অবাস্তব জগতে বাস করে, আর পদে-পদে হোঁচট খায়। বিভ্রান্তি তাদের কাটে না। মানুষকে তারা ভুল বোঝে, ব্যাপারকে তারা ভুল বোঝে, বিষয়কে তারা ভুল বোঝে, পরিস্থিতিকে তারা ভুল বোঝে, বস্তুকে তারা ভুল বোঝে— অসৎকে তারা এড়িয়ে চলতে, নিরোধ করতে বা সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে তুলতে পারে না। সৎকেও পারে না তারা অভ্যুদয়শীল ক'রে তুলতে। মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে অসৎকে হয়তো সৎ মনে করে, সৎকে হয়তো অসৎ মনে করে। একজনের চাটুবাক্যে ভুলে হয়তো তার বদ-মতলব ধরতে পারে না, আবার কোন বন্ধু সশ্রদ্ধভাবে ত্রুটি ধরিয়ে দিলে রুগ্ন অভিমানে আঘাত লাগায় তাকেই হয়তো শত্রুভাবাপন্ন ব'লে মনে করে।

১৯শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ৬। ১১। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। বেলা প্রায় বারোটা। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে চৌকীতে ব'সে আছেন। বিছানাটি সাদা ধবধবে। তামাক খাচ্ছেন ও টুকটাক কথাবার্ত্তা বলছেন। এমন সময় ডক্টর জে, সি, চ্যাটার্জ্জী এবং আরো কয়েকজন জসিদি থেকে আসলেন দেখা করতে। তাঁরা কলকাতায় থাকেন। জসিদিতে এসেছেন বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য। ডাক্তারবাবু পরিচয় দিলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলে ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি নাকি ওখানে অধ্যাপনা করতেন। এই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ডাক্তারবাবু না-বসা পর্য্যন্ত বসলেন না। তামাক সেজে দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু তিনি ইঙ্গিত করলেন যাতে ডাক্তারবাবুর উপস্থিতিতে তামাক না দেওয়া হয়। তাই তখন আর তামাক দেওয়া হ'লো না।

পঞ্চকন্যাকে কেন মান্য দেওয়া হয় সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দ্বিতীয় স্বামীগ্রহণরূপ মহাপাতক থাকা সত্ত্বেও তাদের আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতার জন্যই তারা পূজ্য। মানুষের সব অপরাধ ধুয়ে-মুছে যায়, যদি মানুষ কায়মনোবাক্যে ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। পাতিব্রত্যের অপলাপ মেয়েদের পক্ষে গুরুতর পাপ। কিন্তু সে-পাপ থেকেও তারা পরিত্রাণ পেয়ে পরিশুদ্ধ হ'তে পারে যদি কিনা ঐকান্তিক ইষ্টনিষ্ঠার অধিকারী হ'য়ে ওঠে তারা। তাই পঞ্চকন্যাকে নিত্য স্মরণ করার কথা আছে, যাতে মানুষ কোন অবস্থায় ঘাবড়ে না যায়, হতাশ না হয়।

জ্যোতিষবাবু (ডক্টর চ্যাটার্জ্জী) বললেন—আজকাল উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মেয়ের বিয়ে দেওয়া একটা মহা সমস্যার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের অবিবাহিত থাকতে হয়, তার দরুন অনেক স্খলন, পতন ঘটে। তাছাড়া আগে উপযুক্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ে হওয়ার ফলে তারা যেমন শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারত, আজকাল তেমন পারে না। বয়স্ক মেয়েদের অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্যবোধের ফলে আজকাল হিন্দুর যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণও অবশ্য জড়িত আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পণপ্রথাটা যদি তুলে দিতে পারেন, তাহ'লে মেয়েদের বিয়ের সমস্যা অনেকটা সহজ হ'য়ে আসে। মেয়েরা শ্বশুর-শাশুড়ী, জা-জাওয়ালী, দেবর-ননদ ইত্যাদি শ্বশুরঘরের আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে যদি সংসার করতে না পারে, তবে সেটা তাদের পক্ষে একটা disqualification (অগুণ)। পারিবারিক ঐতিহ্য ধ'রে রাখতে গেলে মেয়েদের উচিত স্বামীর জীবনোৎস-স্বরূপ যাঁরা, তাঁদের সেবায় রত থাকা। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের সঙ্গ-সাহচর্য্য সেবা-যত্ন করতে-করতে তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক-কিছু আহরণ করা যায়। ঐ জ্ঞানই জীবন-পথের পাথেয়-স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়। তার উপর দাঁড়িয়ে মেয়েরা সুষ্ঠুভাবে সংসার পরিচালনা করতে শেখে, আবার সন্তান-সন্ততিকে nurture (পোষণ) দিতে হবে কেমন ক'রে, তাও ধরতে পারে। এতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। যে মা গুরুজনের প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন, তার সন্তান-সন্ততিও তার অনুগত হয়। তাছাড়া, সংসারের পাঁচজনকে স'য়ে-ব'য়ে চলতে গিয়ে character (চরিত্র) যতখানি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, অমন আর কিছুতে হয় না। ওটা একটা মস্ত লাভ। সত্তাপোষণী কুলপ্রথা ও কুলাচার যেগুলি, সেগুলিও পরিপালন ক'রে চলা ভাল। ওতে healthy sentiment (সুস্থ ভাবানুকম্পিতা)-গুলি পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। অন্তরের সম্পদ্ ও সম্বল বাড়ে। বিয়ের পর সংসারের প্রবীণদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর জীবন-যাপন করলে, তাদের ভিতর পরিবারের পরম্পরাগত পূতধারা যথাযথভাবে সঞ্চারিত হ'তে পারে না। অনেক ভেড়ুয়া পুরুষ আছে, যারা বাপ-মা'র ধার ধারে না, কিন্তু বৌকে খুশি করার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ীর অঙ্গুলিহেলনে চলে। তাদের কুল-সংস্কৃতিও তাই বিপর্য্যস্ত হ'য়ে চলে। সন্তান-সন্ততিও পিতৃবংশের গৌরব-সম্বন্ধে সচেতন হয় না! অতিরিক্ত মাত্রায় মামাবাড়ী-ঝোঁকা হ'য়ে পড়ে। এমনতর রকমটা তাদের ব্যক্তিত্বের সহজ বিকাশের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়।

কথাবার্ত্তা হচ্ছে এমন সময় ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন—আমরা বড় অসময়ে এসেছি। আপনার শরীর ভাল নয়। এখন আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। যদিও আপনার কথা শুনতে খুব ভাল লাগছে, উঠতে ইচ্ছা করছে না, তবু এখন

আমাদের পক্ষে উঠাই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ভালই লাগছে আপনাদের পেয়ে। আমার বহু ভাগ্য যে আপনি দয়া ক'রে এসেছেন, ওদেরও (সঙ্গের অন্যান্য লোক) সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

এরপর ওঁরা বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। পূব দিকের তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়ে উত্তরাস্য হ'য়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। গায় একটা কাঁথা দেওয়া, পা পর্য্যন্ত ঢাকা। মন্মথদা (দে), হরিদাসদা (সিংহ), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), জিতেনদা (রায়), যোগেনদা (হালদার), সুরেনদা (পাল) প্রমুখ কাছে আছেন।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার মনে হয় piety (ধর্ম্ম)-এর সঙ্গে যদি power (শক্তি) না থাকে এবং power (শক্তি)-এর সঙ্গে যদি piety (ধর্ম্ম) না থাকে, তবে তার কোন মূল্য হয় না, মানে হয় না। আর, power (শক্তি) ছাড়া forbearance (ক্ষমা) হ'লো morality of the weak (দুর্ব্বলের নৈতিকতা)। Power (শক্তি)-হীন piety (ধর্ম্ম) ও forbearance (ক্ষমা)-এর কোন মর্য্যাদা নেই। আবার, power (শক্তি) আছে, কিন্তু তা' সংযতভাবে সদ্ব্যবহার ক'রে লোকের ভাল করার মতো দায়দায়িত্ব বা ধর্ম্মবোধ নেই, তাও কিন্তু সর্ব্বনাশা। Power (শক্তি) ও piety (ধর্ম্ম) যখন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে, তখন তারা রুগ্ন ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, ঘাতসহ হয় না। ভারত যদি ধর্ম্মসমন্বিত শক্তির সাধনায় মনোনিবেশ করে, তাহ'লেই সে শান্তির উদ্‌গাতা হ'তে পারবে জগতে। ধর্ম্মই ডেকে আনে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানই ডেকে আনে শক্তি, সম্পদ্‌ ও প্রাচুর্য্য। আবার, ধর্ম্মনিঃসৃত শক্তি, সম্পদ্‌ ও প্রাচুর্য্য মানুষকে কখনও প্রমত্ত করে না, তা' চিরকাল সত্তাসম্বর্দ্ধনী আদর্শের সেবক হ'য়ে সার্থকতা লাভ করতে চায়। আপনারা যদি ভাল ক'রে লাগেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসতে পারে যে 'ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' আর তা' সব দিক-দিয়ে। তখন সারা পৃথিবী fulfilled (পরিপূরিত) হবে ভারতকে দিয়ে।

দুই-এক মিনিট চুপ ক'রে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আপসোসের স্বরে বললেন—আপনারা সব disaster (বিপর্য্যয়)-এর বিরুদ্ধে বজ্রকপাট সৃষ্টি ক'রে দাঁড়াতে পারতেন, কিন্তু যা বললাম তা' materialise (রূপদান) করলেন না, যা' করণীয় ব'লে বুঝলেন, তা' করলেন না, তাই দাঁড়াতে পারলেন না। আপনারা দাঁড়াতে পারলে অখণ্ড ভারতের কোটি-কোটি হিন্দু-মুসলমানের কারও গায়ে একটা

কাঁটার আঁচড় লাগত না। শাতনী বিভেদ, বিরোধ ও বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে তারাই রুখে দাঁড়াত।

মন্মথদা—আপনার ইচ্ছাকে রূপ দেবার মতো লোক আজও আসেনি আমাদের মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা নয়। এরাই পারত, করল না আলস্যবশে। আগে কোটি-খানেক দীক্ষার কথা বলেছিলাম। ৩০০ টাকা ক'রে চাইলাম, তা' যারা দিল, যোগাড় করল, তারা কোটিখানেক দীক্ষা দিতে পারতই। লাখো-লাখো পরিবার বাংলার বাইরে থেকে এনে বাংলাদেশে বসান খুব কঠিন ব্যাপার ছিল না। কাজও সুরু করেছিলেন আপনারা। হ'তোও, কিন্তু local (স্থানীয়) বাধা আসল কত! যাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করছিলাম, তারাই বুঝল না, সাহায্য করল না, বরং প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়াল। এ-অবস্থায় কি ক'রে হবে? অবশ্য আমাদেরও যে করার খাঁকতি নেই—তা' নয়। বাধাকে ডিঙ্গিয়ে চলতে গেলে করার মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে চলতে হয়।

মন্মথদা—আমরা disciplined (বিনায়িত) নই।

শ্রীশ্রীঠাকুর সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বললেন—Discipline (নিয়মানুবর্ত্তিতা) সাধা লাগে না, discipleship (শিষ্যত্ব)-ই সাধ্য। করণীয় হ'লো to obey and to follow the teacher (আচার্য্যকে মান্য করা এবং অনুসরণ করা), to follow (অনুসরণ করা) মানে to materialise his wishes (তাঁর ইচ্ছাগুলিকে বাস্তবায়িত করা)।

জিনিসটা কী হয়! আমি ছিলাম একা, কেউ চিনত না, জানত না। তবে আমিও ভালবাসতাম লোককে, লোকেও ভালবাসত আমাকে। কিশোরীকে পেলাম। তাকে লোকে পয়লা নম্বরের গুণ্ডা ব'লে জানত। কিন্তু আমি দেখলাম, ওর একটু ক্ষুধা আছে। ওকে গান বেঁধে দিতাম, ঠাকুর হরনাথের কথা বলতাম, খুব ভক্তি হ'লো তাঁর প্রতি। সেই ভক্তি ক্রমে-ক্রমে দানা বেঁধে উঠল আমাকে নিয়ে, ও আমাকেই চেপে ধরল। মহারাজ ছিল বসন্ত ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার। ধ্যানধারণা করত। সত্যবস্তুকে খুঁজত। সেও রস পেয়ে গেল আমার কাছে এসে। এইতো আমার hands (কর্ম্মী)। এদের নিয়ে সুরু। এই সামান্য দু'-এক জনকে নিয়ে কী অসম্ভব সম্ভব হয়েছে সে-যুগে। তখনকার দীক্ষিতদের list (তালিকা) নেই, তখন দীক্ষা হয়েছে কাতারে-কাতারে। সে number (সংখ্যা)-এর তুলনা হয় না। ওদের জ্ঞানকাণ্ড ছিল না, কিন্তু যা' কইতাম, তা কাটায়-কাটায় করত। পঞ্চানন তর্করত্ন একবার ওদের কথায় মহা মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। কিশোরী নামে-গানে বিভোর হ'য়ে পাগলের মতো নাচতে-নাচতে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় কাশীতে বিশ্বনাথের মাথার উপর চ'ড়ে গিয়েছিল। তার ঐ ভাবোন্মত্ত অবস্থা দেখে পাঁচ হাজার লোক হাত জোড় ক'রে

দাঁড়িয়ে গেল। ভক্তি-বিশ্বাসের তীব্র উন্মাদনায় কত কীই করেছে এরা। অমন ক'রে অঘটন-ঘটানর পথ নিত্যই উন্মুক্ত রেখেছেন পরমপিতা। 'Sing, I am a king' (গান কর, আমি রাজা)…………। ওই বাজখাই গলায় কিশোরী যখন হরিবোল ব'লে গেয়ে উঠত, তখন সে যাই হো'ক, he was a king (সে হ'য়ে দাঁড়াত রাজা)। কিশোরী গরব ক'রে বলত—'মানুষকে ভূতে ধরে, আমাকে ভগবানে ধরেছে। আমি না করেছি এমন অকাম নেই, কিন্তু ঠাকুর আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর কথা কওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই।' আপনারাও পারেন সবাইকে ঐভাবে পরমপিতার জন্য পাগল ক'রে ছেড়ে দিতে। কিন্তু নিজেরাই যে পাগল হননি তাঁর জন্য, পেছটানে কাবু হ'য়ে calculating (হিসেবী) বুদ্ধি নিয়ে পা টিপে-টিপে কুণ্ঠিত চলনে চলছেন। তাই আমিও আপনাদের পুরোপুরি enjoy (উপভোগ) করতে পারছি না, আপনারাও আমাকে পুরোপুরি enjoy (উপভোগ) করতে পারছেন না। আমিও বঞ্চিত হচ্ছি, আপনারাও বঞ্চিত হচ্ছেন। আর, সঙ্গে-সঙ্গে জগৎও বঞ্চিত হচ্ছে পরমপিতাকে না পেয়ে। পারেন তো এই মুহূর্তেই অন্তরায়ের পর্দা ছিঁড়ে ফেলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় চুপ ক'রে রইলেন, তারপর সমাজ-সংগঠন-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সমগ্রভাবে হিন্দু-সমাজ। হিন্দু community (সম্প্রদায়) বলা চলে না। বিপ্র, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি community (সম্প্রদায়)। আর, এই community (সম্প্রদায়)-গুলি সমাজেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রত্যেক community (সম্প্রদায়) work (কাজ) করবে according to its traits to fulfil the principle (তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী—আদর্শেরই পরিপূরণ-মানসে)। ঐ আদর্শকে অবলম্বন ক'রেই গজায় পারস্পরিক সম্প্রীতি। যেমন merchant's community (বণিক সম্প্রদায়), teacher's community (শিক্ষক সম্প্রদায়), law-yer's community (আইনজীবী সম্প্রদায়), doctor's community (চিকিৎসক সম্প্রদায়) সবারই লক্ষ্য যদি হয় কোন পূরয়মাণ-জীবন্ত আদর্শের স্বার্থপ্রতিষ্ঠাকল্পে সমাজের সেবা নিয়ে চলা, তাহ'লে স্বতঃই তাদের মধ্যে গজিয়ে ওঠে বান্ধববন্ধন। কোন একজন মানুষ যদি কেন্দ্রে না থাকে, তাহ'লে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে একপ্রাণতা গজায় না। একপ্রাণতা বা একতা অর্থাৎ একের প্রতি ভাবানুকম্পিতা ছাড়া সংহতি হয় না। সংহতি ছাড়া শক্তি হয় না। অল্পের মধ্যে দেখেন এই আমাকে আপনারা ভালবাসেন, প্রত্যেকে তার instinctive way-তে (সহজাত সংস্কার নিয়ে) আমাকে fulfil (পরিপূরণ) করতে চেষ্টা করেন, তাই আপনাদের ভিতর অবনিবনা যাই থাকুক না কেন, পারস্পরিক দরদ, সহানুভূতি

ও সেবার ভাব খুবই প্রবল। এই দানা-বাঁধা রকমটায় আপনাদের ভিতর যে শক্তির আবির্ভাব হয়েছে তার তুলনা হয় না। এইটেই হ'লো সমাজশক্তির মূলে। আর্য্যসমাজে কেউ বাদ নেই, হরিজন-ফরিজন ব'লে কাউকে আলাদা ক'রে দেওয়া নেই। বৈশিষ্ট্য ও সংস্কার-অনুযায়ী যার যেখানে স্থান, যার যে কাজ, তাকে সেখানে ও তাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতা নিয়ে আদর্শানুগ চলনে উন্নতির অধিগমনই আর্য্যসমাজের লক্ষ্য। সবাইকে নিয়ে সবাইকে মিলিয়ে এই সমাজ। কাউকে অবজ্ঞা করার অধিকার নেই। শূদ্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞ হ'লে বিপ্রের গুরুপদে আসীন হ'তে পারে। কিন্তু তাই ব'লে সে বিপ্রের কন্যা বিয়ে করতে পারে না। কারণ, তার বংশানুক্রমিক জননকোষ বিপ্রকন্যার বংশানুক্রমিক জনন-কোষের তুলনায় less evolved (স্বল্প-বিবর্ত্তিত)। আর, আর্য্য হিন্দুসমাজে যে ঘৃণার অস্তিত্বের কথা বলে, তা' আছে প্রতিলোম জাতকের বেলায়। তা থাকাই বাঞ্ছনীয়। তা' যদি না থাকত, সমাজে সবাই যদি সমমর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত হত, তাহ'লে প্রতিলোম চারিয়ে যেত এবং তাতে সমাজের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেত। তাই প্রতিলোমদের বাহ্যজাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তারা সমাজের কেউ নয়। কারণ, তাদের জৈবীসংস্থিতি ও তৎপ্রসূত মনোবৃত্তি স্বতঃই সমাজবিরোধী, কৃষ্টি-বিরোধী, সত্তাবিরোধী। বিশ্বাসঘাতকতা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। এ-হেন যারা তাদের ঘৃণ্য ব'লে কেন চিহ্নিত করা হবে না বল? সমাজ-সংস্থিতির জন্যই তা' অনিবার্য্য প্রয়োজন। শূদ্র কিন্তু তা' নয়। সে সমাজ-দেহের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। তারও একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদা আছে।

সুরেনদা--বৈশ্য ও শূদ্রদেরও তো অনেক সময় ঘৃণার চক্ষে দেখা হয় সমাজে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হওয়া উচিত নয়। তা' যদি কোথাও হয়, তবে বুঝতে হবে তা' অজান মানুষের আত্মম্ভরিতাপ্রসূত বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। বিপ্র-ক্ষত্রিয় যদি বৈশ্য-শূদ্রদের সমাদর না করে এবং বৈশ্য-শূদ্র যদি বিপ্র-ক্ষত্রিয়কে বিহিত মর্য্যাদা না দেয়, তা উভয়তঃই সমান দূষণীয়। এক আদর্শের অনুসরণ এবং অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ—এই দু'টি জিনিস যদি চালু থাকে, তাহ'লে এর প্রতিকার হ'তে পারে। ফলকথা, আপনাদের যে socialism (সমাজতন্ত্র) ছিল, তা' rinse (পরিষ্কার) ক'রে, renovate (নূতন) ক'রে যদি নেন, তবে তা' সবদিক দিয়ে Russian socialism (রুশীয় সমাজতন্ত্র)-কে হার মানিয়ে দেবে। আমাদের এটাকে বলা যায় constitutional monitorial monarchy (গুরুমুখী নেতৃপরম্পরা-সমন্বিত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র)। সমাজদেহের সর্ব্বত্র চাই গুরুমুখীনতা, ও তদভিমুখী নিয়মতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সমন্বয়। সঙ্গে-সঙ্গে চাই লোকের রাখালী ক'রতে পারে এমনতর ঋত্বিকের দল। তাদের কাজ হবে মানুষকে মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলা। সেই মানুষদের ভিতর-থেকে গজিয়ে উঠবে দায়িত্বশীল যোগ্য নেতা। আবার, বিভিন্ন

community (সম্প্রদায়) যাতে actively inter-interested (সক্রিয়ভাবে পরস্পর-স্বার্থান্বিত) হ'য়ে ওঠে তেমনতর নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা রাখা লাগে।

যোগেনদা—সে কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কোন লোক নির্ব্বাচনে দাঁড়াক না কেন, তাকে নির্ব্বাচিত হ'তে গেলে তার constituency (নির্ব্বাচন-কেন্দ্র)-এর প্রত্যেকটি community (সম্প্রদায়)-এর কাছ থেকে কম পক্ষে এত percent অর্থাৎ শতকরা এত ভোট পাওয়া লাগবে—এইরকম আইন থাকা ভাল। তাতে কেউ কোন community (সম্প্রদায়)-এর লোককে ignore (উপেক্ষা) করতে সাহস পাবে না। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সব community (সম্প্রদায়)-এর লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে বাধ্য হবে। এটা common-sense (সহজজ্ঞান) ও intelligence (বুদ্ধিমত্তা)-এর বিকাশের জন্যও অপরিহার্য্য। মানুষের যদি বিভিন্ন ধরণের মানুষের সঙ্গে সেবা ও সহযোগিতামূলক বাস্তব যোগাযোগ না থাকে, তাহ'লে তার সহজ জ্ঞান ও বোধশক্তি যথাযথভাবে বিকশিত হ'তে পারে কিনা সন্দেহ। তাই, যাজন ও ভিক্ষা ছিল আর্য্য-শিক্ষাপদ্ধতির আবশ্যকীয় অঙ্গ। ভিক্ষার মধ্যে আছে ভজন অর্থাৎ অনুরাগসমন্বিত অনুশীলন ও সেবা। আগে যে ব্রহ্মচারীরা বাড়ী-বাড়ী যেয়ে ভিক্ষা করত, সঙ্গে-সঙ্গে তারা দরদী ও অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে লোকের অভাব ও প্রয়োজন অনুধাবন ক'রে তাদের সাধ্যমতো সেবা দিতে চেষ্টা করত। এই অভ্যাস বদ্ধমূল হওয়ার ফলে তাদের কখনও বেকার হ'তে হত না।

ঘরের মধ্যে রেডিওতে গান হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইদানীং বেশীরভাগ গান যা' শুনি, তার রচনা ও সুর এমনতর যে শুনলে মনটা যেন নিস্তেজ, হতাশ ও অবসন্ন হ'য়ে পড়ে কিংবা একটা অন্তঃসারশূন্য পাতলামির দিকে ঝুঁকে পড়ে। গান হওয়া উচিত এমনতর যাতে মানুষ আনন্দ ও উদ্দীপনা পায়, আশা-ভরসায় মেতে ওঠে, কর্ম্মের প্রেরণা পায়। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা ইত্যাদি যদি জীবনসম্বেগকে প্রবল ক'রে না তোলে, তা' হ'লে তা' ব্যর্থ।

শৈলেনদা—করুণরসেরও তো একটা স্থান আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব রসেরই প্রয়োজন আছে কিন্তু তা' balanced psycho-physical development (সাম্যসঙ্গত শারীর ও মানসবিকাশ)-এর জন্য। তাই সেগুলি পরিবেষণের বেলায় এমনতর মাত্রাজ্ঞান ও adjustment (বিন্যাস) চাই, যাতে সত্তা সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে। Imbalance (ভারসাম্যহারা রকম) হ'লেই মুশকিল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাজনের খুব প্রয়োজন আছে, কিন্তু অপ-যাজন বিশ্রী জিনিস। অপযাজন মানে মহাপুরুষদের বাণী ও নীতিবিধিকে

নিজেদের প্রবৃত্তিমাফিক বিকৃতভাবে পরিবেষণ ও ব্যাখ্যা করা। শুনেছি বুদ্ধদেব নাকি বর্ণাশ্রমের মূল তাৎপর্য্য মানতেন। কিন্তু মহাযানীরা নাকি সভা-সমিতি ক'রে কোথাকার কি লেখার দোহাই দিয়ে তা' বাতিল ক'রে দিল। যুগে-যুগে এই রকমই হয়। প্রবৃত্তির সমর্থন যারা খোঁজে, তাদের অছিলার অভাব হয় না।

মন্মথদা—যুগে-যুগেই তো দেখা যায়, প্রত্যেক মহাপুরুষ গত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আলাদা এক-একটা দলের সৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু প্রত্যেক মহাপুরুষ বলেন—পরমপিতা, পুরয়মাণ পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ, পূর্ব্বপুরুষ এবং পরিপূরণী বর্ত্তমান মহাপুরুষকে স্বীকার কর। সেই কথা যদি আমরা মেনে চলি, তবে লাখ থাকলেও আটকায় না। প্রত্যেকটি দল তখন প্রত্যেকটি দলের asset (সম্পদ্‌) হ'য়ে ওঠে। Material (বস্তু) সব আছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে। যেমন ইঁট, বালি, সিমেণ্ট আলাদা-আলাদা জায়গায় র'য়ে গেছে। দক্ষ স্থপতি যদি কাজে লাগাতে চায় তবে কাজে লাগাতে পারে। Plan (পরিকল্পনা) ক'রে সৌধ গ'ড়ে তুললেই হয়। পরমপিতার দয়ায় বিহিত চেষ্টায় পৃথিবীর সব দেশ, সব দল integrated (সংহত) হ'য়ে যাবে এক ঠেলায়। ব্যাপার সোজা হ'য়ে আছে। আপনারা লাগলেই হয়। আগে পাকিস্তান-সহ ভারতবর্ষের সব সম্প্রদায়কে, সব দলকে, সব মানুষকে, পরমপিতার নামে আত্মীয়তার বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ ক'রে তুলুন। তাহ'লেই কাম ফর্সা। "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।" পরমপিতার পতাকা বহন ক'রে অবিশ্রান্তভাবে এগিয়ে চলতে পারলেই হ'য়ে যাবে। Common Ideal (এক আদর্শ) যদি থাকেন, লাখো-পন্থী লোক থাক না কেন, তাতে কী আসে যায়? ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, প্রেরিতগণ এক-বার্ত্তাবাহী—এইটে হ'লো বাস্তব সত্য। আমাদের জীবন দিয়ে এই factual philosophy (বাস্তব দর্শন) impart (সঞ্চার) করা লাগবে, establish (প্রতিষ্ঠা) করা লাগবে human society-তে (মনুষ্য সমাজে)। তা' যদি করা যায়, সব মানুষকে ঐক্যসূত্রে গেঁথে তুলতে কত সময় লাগবে? এক কোপে সব অবান্তর বিভেদ, বিরোধ ভেঙ্গে যাবে। কোন্ বনে কোন্ বাঘ আছে কে জানে? আপনারাই যে পারবেন না, কে বলতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য প্রেরণাদীপ্ত কথাগুলি শুনতে-শুনতে সকলের মন এখন দুর্জ্জয় আশা, বিশ্বাস ও সঙ্কল্পের উত্তুঙ্গ শিখরে উত্তরণ লাভ করেছে। সকলেই এখন ভাবমগ্ন।

২২শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ৯। ১১। ১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকীতে বসে আছেন। রাত এখন

আটটা আন্দাজ হবে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহভরে বললেন—আসেন কেষ্টদা! বসেন।

কেষ্টদা বসার পর নানা বিষয়ে কথা উঠলো। কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—সংগঠনের ব্যাপারে মুখ্য করণীয় কী, তা' যদি ব'লে দেন, তাহ'লে আমাদের কাজের পক্ষে সুবিধা হয়। আমাদের দীক্ষিতের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা properly (যথাযথভাবে) organised (সংগঠিত) নয়। তাই আমাদের strength (শক্তি) আমরা উপলব্ধি করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষিতদের মধ্যে আনতে হবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সেবা-বিনিময় এবং প্রত্যেকটি দীক্ষিতকে তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য-অনুযায়ী চিন্তা ও চরিত্রে ইষ্টানুপরিপূরণতায় উচ্ছল কর্ম্মপটু ক'রে তুলতে হবে। এই দু'টি দিকে লক্ষ্য রেখে চললে প্রকৃত সংগঠন হবে। সংগঠনের এই মূল সূত্র প্রয়োগ করতে হবে যেমন আপনাদের নিজেদের বেলায়, তেমনি অন্যদের বেলায়। এর মূল কথা হ'লো উপযুক্ত কর্ম্মী। মানুষকে ধারাবাহিকভাবে nurture (পোষণ) দিতে গেলে নিজেরা adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হওয়া লাগে। আর, প্রত্যেককে তার মতো ক'রে nurture (পোষণ) দিতে হয়। এক-এক জনের এক-একটা বদ্ধমূল বদভ্যাস থাকে। তার দরুন জীবনে উন্নতি করতে পারে না। মানুষকে এমনভাবে উসকে দিতে হয় যাতে সে নিজেই নিজের দোষ খুঁজে বের করতে ও সংশোধন করতে বদ্ধপরিকর হয়। তাছাড়া মানুষের সদ্‌গুণ যেগুলি আছে, সেগুলি খুব glowing (উজ্জ্বল) ক'রে তার ও অপরের সামনে তুলে ধরতে হয়, যাতে সে ঐগুলির অনুশীলন ও প্রবর্দ্ধনে আরো তৎপর হয়। বাস্তব গুণের প্রশংসা ক'রে মানুষকে যতটা ভাল করা যায়, তার দোষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে, তার শতাংশের একাংশও হয় না। বরং উল্টো ফল ফলে। তাই অন্যের চারিত্রিক গলদ যদি আপনার অসুবিধারও সৃষ্টি করে, তাও চ'টে যাওয়া চলবে না। সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, ক্ষমা ও উদারতাকে চিরসাথী ক'রে নিয়ে চলতে হবে। মনে রাখবেন—আপনার অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি-উন্মোচনা যদি কিছু থাকে, তাও কিন্তু পরিবেশের কম অসুবিধা ও অস্বস্তির সৃষ্টি করে না। চুলচেরা বিচারের মধ্যে ফেললে কেউই রেহাই পায় না। তাই সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন প্রত্যেককে। তখন আপনার প্রতি ভালবাসার বশে মানুষ আত্ম-সংশোধনের তাগিদ অনুভব করবে। নিজেকে সর্ব্বদা শাসন ক'রে চলুন, তাহ'লে আপনার সংস্পর্শে আপনার পরিবেশ, বিশেষতঃ সম্রদ্ধ যারা আপনার প্রতি, তারা স্বতঃই শাসিত হ'য়ে উঠবে। আর, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সেবা-বিনিময়ের ব্যাপারেও নিজেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা লাগে। একজনের হয়তো অসুখ করেছে। চিকিৎসা করবার ক্ষমতা নেই। আপনি দায়িত্ব নিয়ে পাঁচজনের কাছ থেকে যোগাড়-যন্ত্র ক'রে চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

এইভাবে প্রত্যেককে দিয়ে প্রত্যেকের জন্য করিয়ে নিতে হয়। দল, মত ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সবার মধ্যে এটা চারিয়ে দিতে হয়। মানুষ যাতে স্বতঃই পরিবেশের জন্য ভাবে ও করে তেমনভাবে প্রেরণা জোগাতে হয়। কিছু লোক পাবেন, যারা শুধুই সুবিধা নিতে চাইবে, দিতে চাইবে না কিছু। তা' দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। মানুষের যেমন দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধি থাকে, তেমনি দুরারোগ্য চারিত্রিক ও মানসিক ব্যাধি থাকে। তাই ওতে বিরত না হ'য়ে, তাকে অন্য যে-যে উপায়ে, যে-যে দিক দিয়ে সমাজের পক্ষে profitable (উপচয়ী) ক'রে তোলা যায়, সেইদিকে নজর দেবেন। এমন মানুষ আছে, যার কাছে একটা পয়সা চাইলে, সে প্রাণে ধ'রে দিতে পারবে না। কিন্তু তাকে যদি বলেন, এই ছেলেটাকে একটু অঙ্ক শিখিয়ে দেবেন, ও কিন্তু কিছু দিতে পারবে না, তাহ'লে সে হয়তো সহজেই রাজী হবে। ফলকথা, সবার কাছ থেকে সব আশা করবেন না। যাকে দিয়ে যতটুকু হয়, ততটুকুই ভাল। কেউ শুধু আলোও নয়, আবার শুধু অন্ধকারও নয়। সাধারণতঃ এই কথা খাটে। তাই যার মধ্যে অনেক আলো দেখছেন, তার মধ্যেও কালো দেখবার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। আবার যার মধ্যে অনেক কালো দেখছেন, তার ভিতরও আলো কোথায় আছে, তা' আবিষ্কার ক'রে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন। এইভাবে চললে, কোথাও ঠকেছেন ব'লে আপসোস করতে হবে না। মানুষ যে টাকার চেয়ে মূল্যবান—এইটে হ'লো আসল economy (অর্থনীতি)। টাকার consideration-এ (বিবেচনায়) মানুষ ত্যাগ করবেন না, মানুষের ভালোর জন্য টাকার প্রতি নির্ম্মম হবেন। একটা মানুষ যদি বিলকুল আপনার হয়, টাকার অঙ্কে কি তার মূল্য নিরূপণ করা যায়? সে যে অমূল্য সম্পদ্। এই কথাগুলি মাথায় রেখে এগিয়ে চলেন, আপনারাও দেখবেন, দুনিয়াও দেখতে পাবে সংগঠন কাকে বলে।

২৩শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ১০।১১।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে আছেন। এমন সময় কালিদাসদা (মজুমদার) আসলেন। কালিদাসদা এসে প্রণাম ক'রে বসার পর যাজনকার্য্য সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বললেন—তোমাদের পিছটান বড় বেশী, তাই পার না। পিছটান নিয়ে কোন বড় কাজ করা যায় না। কেউ কোনদিন পারেনি। এখনও কর, তাড়াতাড়ি কর। পিছটানের মায়ায় আটকে থাকলে, যাদের জন্য পিছটান, তাদেরই ক্ষতি করা হবে সবচাইতে বেশী। কারণ, ওতে তোমার যোগ্যতা বাড়বে না, জেল্লা বাড়বে না, প্রসারণা প্রশস্ত হবে না, সঙ্কীর্ণতায়

ডুবে যেতে থাকবে দিন-দিন। তাতে সবদিক দিয়েই ঠেকে পড়বে। জীবন অচল হ'য়ে উঠবে, জীবনীয় উল্লাস, আবেগ নিথর হ'য়ে পড়বে। হেয় হ'য়ে থাকতে হবে পৃথিবীতে। কিন্তু পরমপিতার কাজ নিয়ে, ইষ্টানুগ লোকপরিচর্য্যা নিয়ে সর্ব্বদা মেতে যদি থাকতে পার—সাময়িক দুঃখ-কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, তাহ'লে তোমার নিজের জন্য বা নিজ পরিবারের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। সে-ভাবনা ভাববে তখন অপরে। তাদেরই দায় হবে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা। বিহিত করা কালক্রমে বিহিত ফল প্রসব করেই। তাই ফলের জন্য ব্যস্ত না হ'য়ে কষ্টের জন্য রাজী থেকে ধৈর্য্য ও উৎসাহ-সহকারে করণীয় যা', তা' নিখুঁতভাবে ক'রে যেতে হয়। জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সবারই পরিচর্য্যা ক'রে সবার মধ্যেই পারস্পরিকতা গজিয়ে তুলতে হয়। প্রত্যেকেই তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখুক, কিন্তু তা' করতে গিয়ে যেন অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে না পড়ে।

সন্ধ্যায় কলকাতার এক ভদ্রলোক (বিনোদরঞ্জন দত্ত) এসেছেন। বড়াল-বাংলোয় শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলছেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে কীভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে আছে শ্রমিকের মালিকের প্রতি ভালবাসা এবং যে-কাজে যে নিযুক্ত আছে সেই কাজ তার ভাল লাগা। প্রকৃতি-সঙ্গত কাজ না হ'লে সেই কাজ মানুষের ভাল লাগে না, তাতে সে আনন্দ পায় না। তাই লোক-নিয়োগের সময় দেখতে হবে, যাকে যে-কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে, সেই কাজে তার জন্মগত ঝোঁক ও দক্ষতা আছে কিনা। বর্ণাশ্রমের এই principle (নীতি)-অনুযায়ী লোক-নিয়োগ হ'লে উৎপাদন-বৃদ্ধির সহায়তা হবে। আর চাই মালিকের এমনভাবে বাস্তবে শ্রমিক-স্বার্থী হ'য়ে শ্রমিকের হৃদয় জয় করা, যাতে মালিককে উচ্ছল ক'রে তোলাই তার সহজ প্রবণতা হ'য়ে ওঠে। মালিক-শ্রমিকের মধ্যে এই প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছাড়া শ্রমিকের কর্ম্মশক্তি উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে না। আবার, শ্রমিক যদি মালিককে profitable (উপচয়ী) না ক'রে নিজের পাওয়ার দাবীটাই বেশী ক'রে করে, তেমন ক্ষেত্রে মালিকও স্বতঃই rigid (অনমনীয়) হ'য়ে ওঠে। এর ফলে উৎপাদন ব্যাহত হ'তে বাধ্য। দায়িত্ব মালিকের বেশী হ'লেও শ্রমিকেরও কম নয়। মালিকের দায়িত্ব এইজন্য বেশী বলছি যে, উভয়ের মধ্যে তারই সুযোগ, সুবিধা, ক্ষমতা ও যোগ্যতা বেশী ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। সেগুলির সদ্ব্যবহারে শ্রমিককে ও দেশকে ক্রমোন্নত ক'রে তোলার মধ্যেই নিহিত আছে ও-গুলির সার্থকতা। নচেৎ তার দাম কী? আবার, শ্রমিকের শ্রমশক্তি যদি তার নিয়োগকর্ত্তা মালিক ও সেই

সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বার্থের সেবায় সম্যক নিয়োজিত না হয়, তাহ'লে তারই বা সার্থকতা কোথায়? মালিক হো'ক, শ্রমিক হো'ক, রাজা হো'ক, প্রজা হো'ক, প্রত্যেককেই মনে রাখতে হবে যে, স্বার্থান্ধতাই স্বার্থসিদ্ধির সবচেয়ে বড় অন্তরায়। ওটা অপরাধপ্রবণতা ও বিকৃতিরই প্রথম ধাপ। আর, অপরের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে চলাই স্বার্থ বজায় রাখার শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই-ই হ'লো সুস্থবুদ্ধির লক্ষণ।

আরো কিছু কথাবার্ত্তার পর বিনোদবাবু প্রীতমনে বিদায় নিলেন। এরপর হাউজারম্যানদা আসলেন।

তিনি ইংরাজীতে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলা ইংরাজী মিশিয়ে সেগুলির উত্তর দিলেন। প্রফুল্ল দোভাষীর কাজ করলেন।

হাউজারম্যানদা—অনেকে বলে আমরা যা'-কিছু করি, তা' ভগবানের ইচ্ছাতেই করি। এইরকম একটা দার্শনিকতার দোহাই দিয়ে তো মানুষ অনেক অন্যায় কাজ করতে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্য্যোধন বলেছিল—'জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ, ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি'। ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ এবং অধর্ম্মের প্রতি বিরাগ না থাকলেই মানুষ নিজ প্রবৃত্তির পোষকতায় অমনতর কথা কয়। ধর্ম্মের প্রতি অর্থাৎ being and becoming-এর (সত্তা-সম্বর্দ্ধনার) প্রতি আগ্রহ থাকলে মানুষ শুধু হৃদিস্থিত হৃষীকেশকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, সে জীয়ন্ত হৃষীকেশের শরণাপন্ন হ'য়ে তাঁকেই কায়মনোবাক্যে অনুসরণ ক'রে চলে এবং যেখানেই deviation (বিচ্যুতি) হয়, সেখানেই মুক্ত কণ্ঠে নিজের দোষ স্বীকার করে। আবার, ভাল যা'-কিছু করে, তার জন্য সে নিজে গৌরব নিতে চায় না। লোকে যখন তাকে সৎকাজের জন্য প্রশংসা করে, তখন সে আন্তরিকতার সঙ্গে বিনীতভাবে বলে—'ঠাকুর দয়া ক'রে প্রেরণা দিয়ে আমাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার ক'রে আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। আমার কোন কৃতিত্ব নেই এতে।' এই বোধই ভক্তের বোধ, এই বোধই প্রকৃত বোধ। সে কখনও নিজের দোষের দায়িত্ব ভগবানের উপর চাপায় না। ভক্তের মধ্যে আর-একটা জিনিস থাকে। তার নিজের উপর কেউ অত্যাচার করলে, তাকে হয়তো সে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু তার প্রেষ্ঠের উপর কেউ অত্যাচার করলে তাকে সে কিছুতেই রেহাই দেয় না। রামচন্দ্র সীতাহরণকারী দুষ্ট রাবণকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু হনুমান তাকে ক্ষমা করতে পারেনি।—যাকে দিয়ে প্রভুর এত কষ্ট, মা জানকীর এত অপমান—তাকে আবার ক্ষমা? এই হ'লো তার মনোভাব। ইষ্টের আদেশ একটি ক্ষেত্রে violate (লঙ্ঘন) করা যায়, সে কেবল তাঁর স্বস্তি ও জীবন যেখানে বিপন্ন সেই ব্যাপারে। রামচন্দ্র কতবার হনুমানকে যুদ্ধ থেকে dissuade (প্রতিনিবৃত্ত) করতে চেয়েছেন, কিন্তু হনুমান সেখানে

কিছুতেই রাজী হয়নি। কারণ, এর সঙ্গে রামচন্দ্র ও মা সীতার জীবন ও স্বস্তি জড়িত।

হাউজারম্যানদা—প্রত্যেকে ইষ্টকে বোঝে তার মতো ক'রে, এবং তার নিজস্ব রকমে তাঁর ইচ্ছা পরিপূরণ করতে চেষ্টা করে। এর ফলে বিভিন্ন লোকের এই প্রয়াসের মধ্যে তো বিরোধ দেখা দিতে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকের conception (বোধ) ও efficiency (যোগ্যতা) আলাদা ধরণের ও আলাদা grade-এর (পর্য্যায়ের)। কিন্তু মানুষ যদি sincere (একনিষ্ঠ) হয়, তাহ'লে তার বোধের মধ্যে গলদ যা' আছে, তা' ধীরে-ধীরে শুধরে যেতে থাকে। তবে করার ভিতর-দিয়ে ছাড়া মানুষের experience (অভিজ্ঞতা) হয় না। বোধ-বিবেচনামতো করা চাই, আর সঙ্গে-সঙ্গে চাই self-analysis (আত্মবিশ্লেষণ)—কী ক'রে কী ফল হ'লো, আর কী না-করায় কী অসুবিধা হ'লো। আর, সেইভাবে নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলতে-চলতে বোধও বাড়ে, efficiency-ও (দক্ষতাও) বাড়ে। ভুল ক'মে যায়। তাই ভুল-ত্রুটির জন্য ভাবনা নেই যদি নিষ্ঠা ও শুভবুদ্ধি থাকে। তবে মুশকিল হয় যদি দুষ্ট স্বার্থবুদ্ধি থাকে ভিতরে। তাদের conceptual error-ও (বোধগত ভ্রান্তিও) শোধরায় না, efficiency-ও (যোগ্যতাও) বাড়ে না। আবার, যারা জেগে ঘুমায়, তাদের ঘুম ভাঙ্গানও কঠিন। তাদের চলনা blundering (ভ্রান্তিপূর্ণ) ও deviating (ব্যতিক্রমী) হ'তে বাধ্য। এর একমাত্র ওষুধ হ'লো surrender (আত্মসমর্পণ)। তাঁর চাহিদা পরিপূরণ করার অভিপ্রায় ছাড়া অন্য কোন মতলব রাখতে নেই ভিতরে। এই surrender-এর (আত্মসমর্পণের) সঙ্গে-সঙ্গে আসে untiring activity (অক্লান্ত শ্রম)। Indolence-এর (অলসতার) কোন স্থান থাকে না সেখানে। এমনতর surrendered (আত্মনিবেদিত) যারা, তাদের ইষ্টার্থপূরণী কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকেই।

হাউজারম্যানদা—আধ্যাত্মিক জীবনে মূল প্রয়োজন কোন্‌টি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূল জিনিস হ'লো unrepelling adherence to the Ideal (আদর্শে অচ্যুত অনুরাগ)। কারও-কারও ইষ্টের প্রতি খুব exuberance of emotion (আবেগের প্রাচুর্য্য) দেখা যায়, আরো দেখা যায় নামধ্যানে ardour (আগ্রহ), realising tenor (অনুভূতিপ্রবণ ধাঁজ) ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষ কোন কামনা, স্বার্থ বা প্রবৃত্তির উপর চোট লাগলেই হয়তো দেখা যাবে ভক্তি চ'টে গেল, ইষ্টকে ধ'রে থাকতে পারল না। তাই অমনতর ধর্ম্মানুপ্রাণতা কিন্তু ভণ্ডামির ডাইনী-প্রভাবমুক্ত নয়। প্রকৃত ভক্তি যেখানে, শয়তান সেখানে powerless (শক্তিহীন)। সে বলে—'ঠাকুর! আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে চাই না, কিছু চাই না। আমার সব গেলেও কিছু

যাবে না যদি তুমি থাক এবং তোমার প্রতি ভালবাসা থাকে। আর, দুনিয়াদারীর সব-কিছু পেয়েও আমার কোন লাভ নেই, যদি তার সঙ্গে তুমি না থাক। তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব, ইহকালসর্ব্বস্ব, পরকালসর্ব্বস্ব। তোমাকে পেতে গিয়ে যদি লাখ কষ্ট পেতে হয়, অজস্র অপমান, অসম্মান, লোকসান, নিন্দাগ্লানি ও নির্য্যাতন সইতে হয়, তাও আমার মহালাভ। তোমার জন্য কোন মূল্যই আমার কাছে অধিক নয়।' শুধু বলে না—ভাবেও অমনতর, করেও অমনতর, চলেও অমনতর। ঠাকুরই যে তার অস্তিত্ব। এই অহৈতুকী অব্যভিচারিণী ভক্তির ছিটেফোঁটাও যদি কারও থাকে, তাই নিয়ে সে জগৎ মাতিয়ে দিতে পারে, শয়তানের শয়তানি পুড়িয়ে খাক ক'রে দিতে পারে। The fire of a match-stick, if well nurtured, can make ashes of all the world (একটা দেশলাইয়ের কাঠির আগুন যদি ঠিকভাবে খোরাক পায়, তাহ'লে তা' সমগ্র জগৎ পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে পারে)। তোমার adherence (অনুরাগ) ক্রমসঞ্চারণায় এমনতর একটা unending chain (অশেষ শৃঙ্খল-পরম্পরা) সৃষ্টি করতে পারে যে, তাই-ই হয়তো সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে সবার বাঁচার পথ পরিষ্কার ক'রে দিতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময় কথা শুনতে-শুনতে হাউজারম্যানদা এবং অন্যান্য সকলের চিত্ত ও চেতনা এখন অমৃতলোকে সমুন্নীত। তার কেন্দ্রবিন্দুতে জ্বল-জ্বল করছেন একটিমাত্র মানুষ, যিনি এক, অদ্বিতীয় ও অনুপম ত্রিভুবনে।

২৪শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ১১।১১।১৯৪৭)

বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট আছেন। কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেক ঋত্বিক্ তার যজমানদের ভিতর থেকে অন্ততঃ আড়াইশ' লোক বেছে নিয়ে তাদের প্রত্যেককে ঋত্বিকী পাঠাতে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক। ঋত্বিক্‌রা ঋত্বিকীর উপর দাঁড়াক। ঋত্বিকীটা ভাল ক'রে চারাতে পারলে, ঋত্বিক্‌দের মধ্যে যারা আজ উদরান্ন-সংস্থানের জন্য চাকরী-বাকরী বা অন্য কাজ করে, তারা তা' ছেড়ে অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে ঋত্বিকতা করতে পারবে। এতে কাজ এগিয়ে যাবে। সৎসঙ্গীরা বেশী ক'রে nurture (পোষণ) পাবে। তাতে তারা সবদিক দিয়ে progressive (উন্নতিমুখর) হ'য়ে উঠতে পারবে। কতকগুলি লোক যদি ঋত্বিকীর উপর দাঁড়িয়ে যায়, তখন তা' দেখে ঋত্বিকের কাজ করার মতো instinct (সহজাত সংস্কার) যাদের আছে, তারা wholetime worker (পূর্ণকালিক কর্ম্মী) হিসাবে কাজে ঝাঁপ দিতে উৎসাহিত হবে। উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব হবে না। এক ঋত্বিকীর ভিতর-দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান

হবে। ঋত্বিক্‌দের ব'লে দেবেন—নূতন যাদের দীক্ষা দেবে, তাদের দিয়েও যেন ঋত্বিকী সই করিয়ে নেয়। এটা পাঠাবে তো ঋত্বিকের জন্য আমাকে। আমারই নির্দ্দেশ এটা। তাই, ঋত্বিক্‌দের সংকোচের কোন কারণ নেই। ঋত্বিকীর হিসাবপত্রের জন্য ফিলান্‌থ্রপি অফিসের মধ্যে আলাদা একটা ঋত্বিকী-বিভাগ খুলবেন। দরকার হ'লে এ-জন্য আলাদা লোক নেবেন। এটা ভালভাবে চালু করা চাই-ই। এইটে চালু করবেন আর ইষ্টভৃতির আশীর্ব্বাদী দেওয়াটা স্থগিত ক'রে দেবেন। আর, যেমনতর বিশিষ্ট নূতন দেড়লাখ লোক এখনই চাই ব'লে বলেছি, তা' immediately (অবিলম্বে) দীক্ষা দিয়ে জোগাড় ক'রে ফেলুন। যা' worker (কর্ম্মী) আছে, তার উপর East Bengal field-এ (পূর্ব্ববঙ্গ এলাকায়) moving active একজন leader (চলৎশীল সক্রিয় একজন নেতৃত্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি) এবং West Bengal field-এ (পশ্চিমবঙ্গ এলাকায়) moving active একজন leader (চলৎশীল সক্রিয় একজন নেতৃত্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি) দিয়ে অন্য সব existing worker (বর্ত্তমান কর্ম্মী)-সহ যা' প্রয়োজন সব কাজই হ'তে পারে। সবার উপর নজর রেখে আপনি সব করিয়ে নেবেন।

কেষ্টদা—Leader type-এর worker (নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী)-এর কথা আপনি যা' বলছেন, তারই তো বড় অভাব। অনেকে নিজে কাজ করতে পারে, কিন্তু অন্যকে কাজে লাগাতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ায় মানুষের অভাব নেই। যারা আছে, তাদের যদি ঠিকমতো nurture (পোষণ) দিতে পারেন, তাহ'লে কে যে কিভাবে উতরে যাবে, তা' বলা যায় না। দেখবেন কথায়-কাজে কাদের মিল বেশী, tenaciously (নাছোড়বান্দা হ'য়ে) কাজে লেগে থাকে কারা, uncompromising অথচ untussling (আপোষরফাহীন অথচ নির্ব্বিরোধ) কারা, কারা তোয়াজের ধার ধারে কম, কারা ইষ্টার্থে ও লোকস্বার্থে স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত, কারা ঈর্ষ্যাহীন ও সেবাপরায়ণ, অপরকে ন্যায্য প্রশংসা ও মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত নয় কারা, কারা মানুষকে সইতে-বইতে পারে, কারা খুঁটিনাটি সবদিকে নজর রেখে balanced way-তে (সাম্যসিদ্ধ রকমে) চলতে অভ্যস্ত, ইত্যাদি। এইসব গুণ অল্পবিস্তর যাদের ভিতর দেখতে পাবেন, জানবেন তাদের ভিতর নেতৃত্বের বীজ আছে। আপনাদের ভিতর এ-ধরণের লোক যে নেই, তা নয়। কারও সঙ্গে মত ও মাথায় আপনার পুরোপুরি মিল থাক বা না থাক, কারও ভিতর এইসব গুণ দেখলে, তাকে কখনও ignore (উপেক্ষা) করবেন না। তাকে কেন, কোন মানুষকেই ignore (উপেক্ষা) করবেন না। আপনাদের personality (ব্যক্তিত্ব) যত বেশী sheltering (আশ্রয়প্রদানশীল) হবে, ততই integration (সংহতি) বাড়বে। অসম্ভব সম্ভব করতে পারবেন আপনার হাতের মানুষ-

গুলিকে দিয়ে।

কেষ্টদা—পূর্ব্ববঙ্গে কি এখন আগের মতো কাজ করা সম্ভব হবে? রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে অসুবিধা তো হ'তে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন রাষ্ট্রই লোকের অকল্যাণ চাইতে পারে না। লোক অসৎ হোক, উচ্ছৃঙ্খল হোক, তা' চাইতে পারে না। আমরা ঈশ্বরকে মানি, রসুলকে মানি, সেই সঙ্গে-সঙ্গে মানি প্রত্যেকটি প্রেরিতপুরুষকে, মানি সনাতন ধর্ম্মকে—যা' প্রতিটি মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে বাঁচা-বাড়ায় পৌঁছে দেয়। তাই আমরাও ইসলামকে বাদ দিয়ে নই, ইসলামও আমাদের বাদ দিয়ে নয়। এককথায়, বাঁচা-বাড়ার ক্ষুধা আছে যাদের, পরমপিতার পথে শান্তিতে বসবাস করবার, অভ্যুদয়শীল হ'য়ে পারস্পরিক প্রীতি নিয়ে জীবন উপভোগ করবার লালসা আছে যাদের, তাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ হবার কথা নয়। যদি কেউ বুঝতে না পেরে বাধার সৃষ্টি করে, তাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেই বুঝবে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বাইবেল আর বৈষ্ণব-দর্শনে কোন পার্থক্য নেই।

এরপরে মেরি ম্যাগডিলিনির প্রসঙ্গ উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যীশুখ্রীষ্টের ভক্তদের মধ্যে মেরি ম্যাগডিলিনির সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। She loved Lord for His own sake (সে প্রভুকে তাঁর জন্যই ভালবাসত)। তার মতো unexpectant, selfless love (প্রত্যাশাশূন্য, নিঃস্বার্থ ভালবাসা) আর কারও ছিল কিনা জানি না। আজ ভগবান যীশুর কত ভক্তের কথা শোনা যায়। কত saint (সন্ত)-এর কথা শোনা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, যীশুর অনুরাগীদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাম করা উচিত তার।

হাউজারম্যানদা—আজ মেরির খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব খ্রীষ্টান-জগতে যতটুকু আছে ও হয়েছে, তার থেকে তো ঢের বেশী হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করায় উপায় নেই যে সে ছিল pivot (মূল খুঁটো)। চরম দুঃসময়ে যখন কেউ ছিল না যীশুর পাশে, প্রত্যেকে ভয়ে-ভয়ে আত্মগোপন ক'রে চলছিল, তখন একমাত্র সে-ই প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে বেপরোয়া হ'য়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়েছিল যীশুর জন্য পাগল হ'য়ে। কেউ-কেউ নাকি বলে—যীশুর প্রতি তার যে ভালবাসা ছিল, তা ছিল lustful (কামনালিপ্সু)। হয়তো তা' lustful (কামনালিপ্সু)-ই ছিল। কিন্তু সমগ্র সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে অমন ক'রে আর কেউ বোধহয় যীশুর অস্তিত্ব ও স্বস্তি কামনা করেনি। Her whole soul and entire being was bequeathed to Christ and that

was the holiest of love (তার সমগ্র আত্মা, সমগ্র সত্তা যীশুকে সমর্পিত হয়েছিল এবং তার প্রেম ছিল পবিত্রতম)। ভালবাসা এমন জিনিস যে তাতে প্রিয়তমের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা মনে পড়ে না। "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"—এমনতর হয়। আবার আছে—

"অনুরাগের বাতি যার
নয়নকোণে জ্বলেছে,
সে না সর্ব্বস্ব তেয়াগিয়া
গুরুকে সার করেছে।"

ম্যাগডালার মধ্যে ছিল এই প্রাণ-উপচান অনুরাগ। আবার ছিল প্রচণ্ড নির্ভীকতা ও পরাক্রম। আমি যত ভাবি ততই আমার শ্রদ্ধা হয়।

প্রফুল্ল—রজোগুণী জাঁকজমকওয়ালা চটকদার ভক্তরাই যেন আজকাল লোকের শ্রদ্ধা বেশী ক'রে আকর্ষণ করেন, নইলে সাধু নাগমহাশয়ের মতো অনাড়ম্বর ভক্ত ভগবান রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গের মধ্যে কমই দেখা যায়, কিন্তু তাঁর কথা নিয়ে আলোচনা-চর্চ্চা লোকের মধ্যে কমই দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাগ-মহাশয়, গিরীশ ঘোষ প্রমুখ ভক্তদের কথা forefront-এ (পুরোভাগে) আনাই ভাল। ভক্ত যে সেই ভক্তকে চিনতে পারে, নইলে সাধারণ লোকের বিচার-বিবেচনায় বহু গোলমেলে ব্যাপার ঢুকে যায়। নিজেদের ভিতরে দৈন্য থাকে, সেই দৈন্যদুষ্ট দৃষ্টি নিয়েই তারা জগতের যা'-কিছুকে দেখে ও বিচার করে। চরিত্রের আদিম ঐশ্বর্য্য কী তা' বোঝার মতো মাথা তাদের থাকে না। মোটা বুদ্ধিতে চোখধাঁধান মোটা ব্যাপারগুলিই বোঝে। কার master-complex (নিয়ামক প্রবৃত্তি বা প্রভু-প্রবৃত্তি) কী তা' ধরতে পারে না।

হরেনদা (বসু) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একগাল হেসে বললেন—কাজ হাসিল করতে পারলি তো?

হরেনদা—আপনার দয়ায় হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ায়। তোর কথা ভাবছিলাম, কাজ আছে। পরমপিতার দয়ায় সময়মতো এসে পড়েছিস্। আয় এদিকে।

হরেনদা বিছানার কাছে এগিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্যাখ্, রাধারাণীর শ্রাদ্ধ কবে?

হরেনদা—বৃহস্পতিবারে। সব ঠিক আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লক্ষ্য রাখিস্—নিখুঁতভাবে সব হয় যেন। টাকা-পয়সা যা' লাগে নিয়ে নিস্। মনে রাখিস্—যাদের আপনজন কেউ নেই, তাদের আপনজন কিন্তু তোরা। পরমপিতা যেমন সবার, পরমপিতার বান্দা হিসাবে তোরাও তেমনি সবার।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আগেই নালিশ এসেছে হরেনদা ঐদিন একটি ছেলেকে খুব মেরেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছেলেটাকে অমন ক'রে মারলি কেন? তোদের কাছে থেকে মানুষ নিজেকে অসহায় ও নির্য্যাতিত ব'লে বোধ করার সুযোগ পাবে কেন?

হরেনদা—চুরি করেছিল, তাই নিজের বাড়ীর ছেলের মতো শাসন করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের বাড়ীর ছেলের মতো যদি শাসন করতে, তাহ'লে যাকে শাসন করেছ, সেও তোমার দরদ ও শুভাকাঙ্ক্ষা বোধ করতে পারত। আমি বলি—অমনভাবে মারিস্ না। মারা-টারা ভাল নয়। Forbearance (ক্ষমা)-ই ভাল।

১৫ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ১।১২।১৯৪৭)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর গোল তাঁবুতে চৌকির উপর পাতা বিছানায় ব'সে আছেন। এমন সময় সুশীলদা (বসু) এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বালিশে হেলান দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কথাবার্ত্তা বলছেন। শীতের দিনে অনেকে বাইরে রোদ-পিঠ ক'রে দাঁড়িয়ে তা' সাগ্রহে শুনছেন।

সুশীলদা—মানুষ যত বড় হয়, তার অহঙ্কার তত অনমনীয় হ'য়ে ওঠে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা হ'লো last infirmity of great souls (বড় মানুষদের শেষ দুর্ব্বলতা)। ওটা থাকে না রামচন্দ্র, কেষ্ট ঠাকুর, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, হজরত রসুল-জাতীয় লোকের কিংবা তাঁদের যারা তাদের কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করে, যেমন হনুমান, উদ্ধব প্রভৃতির। Ego (অহং) থাকলে to the last (শেষ পর্য্যন্ত) fight দেওয়া যায় না (সংগ্রাম করা যায় না), লেগে থাকা যায় না, অনেক দূর এগিয়ে হঠাৎ হয়তো কোন জায়গায় অহং আহত হওয়ায় উৎসাহদীপ্ত এগিয়ে-চলা রুদ্ধ হ'য়ে যায়। Ego (অহং) থাকলে পদে-পদে wounded (ব্যথিত) হবার scope (সুযোগ) থাকে কিনা, তাই astray (বিপথে) যাবার সম্ভাবনা থাকে, কারণ balance of judgment (বিচারবুদ্ধির সাম্যসঙ্গত দাঁড়া)-টা যখন-তখন shaken হয় (টলে যায়)। 'লব তুরঙ্গিণী ছলে-বলে অথবা কৌশলে'—এমনতর zeal (উৎসাহ) আর থাকে না। মাঝখানে অভিমান এসে হানা দিয়ে purpose to the principle (আদর্শপূরণী উদ্দেশ্য) থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

এরপর প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরকে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনালেন।

কাগজ পড়া শ্ুনতে-শ্ুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর জগদীশভাই (রায়)-কে বললেন—ঘড়িটা সাবধান ক'রে ঘড়ির পকেটে ঢুকিয়ে রাখ। প'ড়ে যেতে পারে। সবদিকে হুঁশ রেখে চলতে হয়। তাতে character (চরিত্র)-ও adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। বেখেয়াল হবার অভ্যাস থাকলে, তা' একজায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না, জীবনের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

১৯শে অগ্রহায়ণ, শ্ুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ৫।১২।১৯৪৭)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁব্ুতে ব'সে আছেন। কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে কথা হচ্ছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Treacherous man (বিশ্বাসঘাতক লোক)-এর এখানে টেকবার জো নেই। একটা রথোমাল, যার sincerity (একনিষ্ঠতা) আছে, সে হয়তো ঐ জামতলায় প'ড়ে মাটিতে মিশে যাবে, তব্ু এ-স্থান ত্যাগ করবে না। আর-একজন হয়তো bull-dog zeal (নাছোড়বান্দা উৎসাহ)-ওয়ালা brilliant (দীপ্তিমান) মান্ুষ, কিন্তু তার যদি sincerity (একনিষ্ঠতা) না থাকে, তবে সে একঠেলায় কোথায় ছিটকে যাবে, তার হদিশ পাওয়া যাবে না। পরমপিতার দরবারে বিধিবশে আপনা থেকে সব বাছোট হ'য়ে যায়। কারও কিছ্ু করা লাগে না। তাই মনে হয়, এ movement (আন্দোলন) যখন দাঁড়াবে, তখন একেবারে indomitable (অদম্য) হ'য়ে উঠবে, কেউ একে র্ুখতে পারবে না, দ্ুনিয়া flood (প্লাবিত) ক'রে দেবে, world (জগৎ)-এর circumference-এ (পরিধিতে) কুলাবে না, তাও ছাপিয়ে যাবে।

এমন মান্ুষও আপনাদের মধ্যে আছে, যে হয়তো চোর, এখনও তার চুরি ঘোচেনি। তব্ু রোজ সকালে অন্নজল গ্রহণের আগে সে তার বোচকা থেকে কিছ্ু-কিছ্ু বের ক'রে নিয়ে মনে-মনে বলে—'ঠাকুর! কীভাবে কী করি, সবই তো তুমি জান, তব্ু তোমাকে না খাইয়ে আমার কিছ্ু খেতে ইচ্ছা করে না, আমার এই নিবেদন যত তুচ্ছ হো'ক, যত অসমীচীন হো'ক, দয়া ক'রে তাই-ই তুমি গ্রহণ কর। আমাকে বিম্ুখ ক'রো না ঠাকুর!'—এই ব'লে চোখের জলে নিত্য ইষ্টভৃতি ক'রে চলে। এমন মান্ুষ যে, তারও কিন্তু রেহাই অদ্ূরে। গীতায় আছে—

"অপি চেৎ স্ুদ্ুরাচারো ভজতে মাম্ অনন্যভাক্
সাধ্ুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ।"

অনন্য-ভজনশীল হ'লে তার চরিত্র বদলাবেই। তাই, ভালমন্দ যে যেমন হো'ক, মান্ুষকে দীক্ষিত ক'রে যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি-পরায়ণ ক'রে তোলা লাগে।

আমি মন্মথ (বন্দ্যোপাধ্যায়)-কে বলেছি to be a fisher of man (মানুষের জেলে হ'তে)। ইষ্টার্থে লোকসংগ্রহের মতো এমন পবিত্র কাজ আর কিছু নেই। মানুষের কাছে মানুষের মতো উপাদেয় আর কিছু হ'তে পারে না। আমার মতো আপনাদেরও যেন লোক-ক্ষুধা কখনও না মেটে। লোককে সইবেন, বইবেন, শাসন-তোষণ সবই করবেন। আদর-যত্নে, সেবায়, সোহাগে, মমতায়, প্রেরণায় প্রত্যেককেই বাড়িয়ে তুলবেন তার মতো ক'রে। এই হ'লো মানুষের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক।

কেষ্টদা রামকৃষ্ণদেবের লোকলিপ্সা-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবতার-টবতার বলতে গেলে যা বুঝায়, রামকৃষ্ণ ঠাকুর ষোল আনা তাই। Superman (মহামানব) বললেও ছোট ক'রে বলা হয়। একেবারে আমান divine man (ভাগবত মানুষ)।

২০শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ৬।১২।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে আছেন। হাউজারম্যানদা এসে কথাবার্ত্তা বলছেন।

হাউজারম্যানদা কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—লোকের সঙ্গে চলতে গিয়ে অনেক সময় ভুল ক'রে বসি, তাতে কাজের পথে ব্যাঘাত হয়। এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Consider, seek out thy fault, do correct, adjust and behave accordingly, perfection will approach with the crown of success and adorement.

ইংরাজীতে ব'লেই পরক্ষণে বাংলায় বললেন—বিচার কর, তোমার দোষত্রুটি খুঁজে বের কর, সেগুলি নিয়ন্ত্রিত কর আর তদনুরূপ আচরণতৎপর হও, নিখুঁত চলন কৃতার্থতার মুকুট প'রে তোমাকে অভিনন্দন করবে। চলা যত নিখুঁত হয়, কৃতকার্য্যতাও ততই আমাদের আলিঙ্গন করে। আবার, প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁতভাবে করতে অভ্যস্ত হ'লেও তার প্রভাব আমাদের চরিত্রের উপর পড়ে। শুধু মনে-মনে চিন্তারাজ্যে নিখুঁত হ'লে চলবে না। চলার বেলায় নিখুঁত হ'তে হবে। বিচলিত হওয়ার মতো সংঘাত বাইরে থেকে সর্ব্বদা পাওয়া সত্ত্বেও যদি বিচলিত না হ'য়ে তোমার purpose to the principle (আদর্শপূরণী উদ্দেশ্য) অব্যাহত রেখে চলতে পার, তাহ'লে বোঝা যাবে তোমার নিজের উপর দখল আসছে। নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করবার ব্যাপারে পরিবেশের প্রতিকূলতারও প্রয়োজন আছে। অন্যের দোষ দেখতে না যেয়ে, নিজের দোষ কোন্ ব্যাপারে কতখানি তাই দেখা ভাল। কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করল ব'লে তুমি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারবে না। খারাপ ব্যবহার করলে তুমি হেরে যাবে। তোমার

purpose to the principle (আদর্শপূরণী উদ্দেশ্য) defeated (পরাস্ত) হ'য়ে যাবে।

হাউজারম্যানদা—ক্রোধের বশে যদি কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রেই ফেলি এবং মানুষটা যদি বেঁকে বসে, তাহ'লে কী করা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Be prudent and be bathed in repenting penance, then beg pardon with a follow of fulfilling zeal—may bliss with amity embrace you.

নিজেই বাংলা ক'রে বললেন—বিচক্ষণ হও, অনুতপ্ত প্রায়শ্চিত্তস্নাত হও; ক্ষমা চাও, আর পরিপূরণী আচরণ-তৎপর হও—আশীর্ব্বাদ তোমাকে মিত্রালিঙ্গনে সম্বর্দ্ধনা করতে পারে।

ব্যাখ্যা ক'রে বললেন—কারও কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে দেখতে হয়—তার অন্তরে-বাইরে যে ক্ষত ও ক্ষতির সৃষ্টি করা হয়েছে, তার অপনোদন কিভাবে করা যায়। সে-চেষ্টা না থাকলে ক্ষমা চাওয়াটা একটা মৌখিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। নিজ অন্তরের পরিশুদ্ধি হয় না। বার-বার একই রকম ভুল করবার সম্ভাবনা থাকে। এ-কথা মনে রাখা দরকার যে, অন্যের উপর আমরা যে ক্ষত ও ক্ষতির সৃষ্টি করি, তার নিরাকরণ যদি না করি, তাহ'লে তা' আমাদের পাওনা হ'য়ে থাকে প্রকৃতি ও পরিবেশের কাছ থেকে। তাই বুঝে চলা ভাল। প্রকৃতি আমাদের কোন পাওনা থেকেই বঞ্চিত করেন না। আমরা যদি মানুষের ভাল করি, তার ফল আমরা চাই বা না চাই, মঙ্গল আমাদের আলিঙ্গন জানাতে ভুল করে না। তাই আমি বলি—Do serve—service will serve you equally. (সেবা কর—সেবা তোমাকে সমভাবে সেবা করবে)। ভাল কর, ভাল হও, ভাল পাও। এই চলায় চললে কিছুই অপাওয়া থাকবে না।

২১শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ৭।১২।১৯৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রামেশ্বরদা (সিং) প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শুনেছি আগে বিহারে হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই মাছ-মাংস খেত না, কিন্তু আজকাল নাকি খায়। নিরামিষ ছেড়ে আমিষাহারে অভ্যস্ত হওয়াটা ভাল হয়নি। ওতে চরিত্র অনেকখানি বদলে যায়, স্বাস্থ্য ও আয়ুর পক্ষেও খারাপ হয়। আমিষাহারে একটানাভাবে সূক্ষ্ম চিন্তা করা যায় না, মধ্যে-মাঝে কেটে যায়, বিক্ষেপ আসে। এ-সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে। প্রথম আমলে দেখেছি—কোনদিন যদি মাছ খেতাম, তারপর বেশ কিছুদিন যাবৎ ধ্যান-ধারণা ও ভজন তেমন জমতো না, light ও sound

(জ্যোতি ও শব্দ) ফুটি-ফুটি ক'রেও যেন ঠিকভাবে ফুটে উঠত না। হয়রান হ'য়ে যেতাম, আনন্দ পেতাম না। মাঝখানে যেন একটা কালো পর্দ্দা প'ড়ে যেত। তার মানে—মাছ খাওয়ার ফলে nerve ও cell (স্নায়ু ও কোষ)-গুলি gross (স্থূল) হ'য়ে যেত। কিছুদিন পরে আবার ঐ ভাবটা কেটে যেত। Experiment (পরীক্ষা) হিসাবে তখন হয়তো আবার একদিন মাছ খেয়ে দেখেছি। তখন আবার ঐ-সব অসুবিধা দেখা দিত। নিজের অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে আমার অকাট্য বিশ্বাস হয়েছে যে, উচ্চতর অনুভূতির রাজ্যে যারা পেঁছিতে চায়, চিন্তা, চলন ও চরিত্রকে যারা স্থৈর্য্য-সমন্বিত ক'রে তুলতে চায়, আমিষ-আহার তাদের বর্জ্জন করতেই হবে। আমিষ-আহারে শরীর একটা unnatural whip (অস্বাভাবিক বেত্রাঘাত) পায়, তার ফলে তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। যে-বাড়াটা স্বাভাবিকভাবে দশ বছরে বাড়ত, তা' হয়তো পাঁচ বছরে বেড়ে যায়। তার ফলে total (পুরো) আয়ু থেকে অতোটা minus (বিয়োগ) হয়। তাহ'লে দাঁড়াল—আমিষ-আহারে যে growth (বৃদ্ধি) হয়, তা' হয় at the expense of longevity (আয়ুর বিনিময়ে)। তা' কখনও আমাদের কাম্য হ'তে পারে না। Life (জীবন) যাতে prolonged (দীর্ঘায়িত) হয়, তাই করাই ভাল। আমার ধারণা—নিরামিষ আহার ও সুনিয়ন্ত্রিত চলনেই তা' হওয়া সম্ভব। সুনিয়ন্ত্রিত চলনের জন্য তিনটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথম হ'লো concentric tenor (সুকেন্দ্রিক ধাঁজ)। এইটে না থাকলে মানুষ জীবনের বিরোধী শক্তি-গুলিকে আয়ত্তে আনতে পারে না। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে দুর্ব্বল ও হতাশ হ'য়ে পড়ে। তাতে power of resistance (প্রতিরোধ-ক্ষমতা) ক'মে যায়। রোগব্যাধি চেপে ধরে। দ্বিতীয় হ'লো adjusted conjugal life (সুনিয়ন্ত্রিত দাম্পত্য-জীবন) এবং তৃতীয় হ'লো peaceful home-environment (শান্তিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ)। এই দুটি জিনিস না থাকলে মানুষের শরীর-মনের ক্ষয়ক্ষতির পূরণ হয় না, সে শক্তি ও উৎসাহের যোগান পায় না।

কেষ্টদা—মাছ-মাংসের পুষ্টির প্রভাবে যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হ'য়ে আয়ু ক'মে যায়, সে-সম্বন্ধে কি আপনার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এইরকম মনে হয়। কথাটা reasonable (যুক্তিযুক্ত) কিনা ভেবে দেখুন। তাছাড়া আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে। একবার একটা গুঠে বেগুনের গাছে মাছের সার দিয়েছিলাম। গাছটা পেয়ারা গাছের মতো বেড়ে উঠলো, কিন্তু কোন পোকা না-লাগা সত্ত্বেও ছয় মাসের মধ্যে মরে গেল। গুঠে বেগুনের গাছ তো কতদিন বাঁচে। গাছও একটি প্রাণী, মানুষও একটি প্রাণী। গাছের জীবনের উপর মাছের যে-প্রভাব, মানুষের জীবনের উপরও মাছের সেই একই প্রভাব —এই আমার বিশ্বাস।

রামেশ্বরদা হিন্দীতে কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—রামেশ্বর যদি মাঝে-মাঝে আসে তাহ'লে আমারও বোধহয় হিন্দী কথা বেরোয়।

কেষ্টদা—আপনি ইচ্ছা করলেই হিন্দীতে কথা বলা কেন, হিন্দীতে বাণীও দিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আপনি বুঝি আবার আমাকে টেংলাতে সুরু করলেন! আপনার অসাধ্য কাম নেই। কলে-কৌশলে কিভাবে যে উসকায়ে দেন, ঠাহরই পাওয়া যায় না। ইংরেজীতে বাণী দেব, ছড়া বলব—এসব কথা তো আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। আপনিই আমাকে খেলায় নামাইছেন। এখন আবার আর-এক হুজুক তুলতিছেন। তা' পরমপিতার ভাণ্ডার হাতে পাইছেন—তা' থেকে নিয়ে নেন যা' পারেন। (নৃত্যভঙ্গিমায়) আমি তো নাচুনি নাচেই আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব্ব মজাদার ভঙ্গী দেখে সবাই আনন্দে হো-হো ক'রে হাসতে লাগলেন। সবার হাসি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসছেন সঙ্গে-সঙ্গে।

সরোজিনী মা তামাক দিচ্ছেন, টিকের থালায় টিকে ফুরিয়ে এসেছে দেখে তিনি একজনকে টিকে এনে দিতে বললেন।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার আবার আছে, যে যা' করবে, সে তার সবটুকু না করলে ভাল লাগে না। (প্রফুল্লর দিকে চেয়ে)—তুমি হয়তো লিখছ, একজন কাগজ এনে দেবে, আর একজন কলম এনে দেবে, কলমে কালি ভরে দেবে তৃতীয় একজন—এমনতর রকম ভাল নয়। লিখতে গেলে যা'-যা' করণীয় তা' তুমি নিজে করবে। এইভাবে যে ব্যাপারে যা' করণীয়, সব দিকে লক্ষ্য রেখে তার সবটা নিজে করলে দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে, হুঁশ বাড়ে, বোধ বাড়ে, কর্ম্মশক্তি বাড়ে, নিষ্ঠা বাড়ে। নইলে চাকরেদের মতো একপেশে হ'য়ে যেতে হয়, পরনির্ভরশীল হ'য়ে যেতে হয়। ঠেলাই-মেশাইতে কাজ পণ্ডও হ'তে পারে। আবার ability (সামর্থ্য)-এর দিক দিয়ে deprived (বঞ্চিত) হ'তে হয়।

সরোজিনীমা এই কথা শুনে নিজেই যেয়ে টিকে নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসি-হাসি মুখে বললেন—আমার কথা শুনে তোর মন খারাপ হ'য়ে গেল না তো?

সরোজিনীমা—না, মন খারাপ হবে কেন? আপনি তো আমাদের ভালোর জন্যই বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল হওয়ার জন্য সব সময় নিজেকে নিজে যতটা শাসনের উপর রাখা লাগে, তাই যে আমরা রাখতে চাই না।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টভৃতি হ'লো practical materialised condensed form of psycho-physical ascetic devotion

(শারীর-মানস তপস্যাপরায়ণ ভক্তির কার্য্যকরী বাস্তব সংক্ষিপ্ত রূপ)। ইষ্টভৃতি ঠিক-ঠিক ভাবে করতে গেলে তা' অর্থভাবনা-সহ জপও আনে, সঙ্গে-সঙ্গে আনে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠামূলক মনন-সমন্বিত ধ্যান। ইষ্টের ভরণ-পূরণ করতে গেলে কায়মনোবাক্যেই তা' করতে হয়। শরীরটা মানুষের বড় জীবন্ত বাস্তব জিনিস, কোন ব্যাপারে আগ্রহ-সহকারে শরীরটাকে নিয়োজিত করলে মন, বাক্যও তার পিছু-পিছু ছোটে। একটা মানুষ রোজ ভোরে উঠে যদি শুদ্ধাচারে ভক্তিভরে ইষ্টভৃতি করে, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়ে এতখানি extra-energy (অতিরিক্ত শক্তি) stored (সঞ্চিত) হয় যে, তার উপর দাঁড়িয়ে সে-সব বিপদ-আপদকে easily overcome (সহজে অতিক্রম) করতে পারে। অন্য মানুষ যেখানে ভেঙ্গে পড়ে, সেখানে সে অটল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কেষ্টদা—যদি ছেলের অসুখ সারবে, এই আশায় কেউ ইষ্টভৃতি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Tempting attitude (প্রলুব্ধ করার মনোভাব) থাকলে সবই নিষ্ফল হ'য়ে যায়। বাইবেলে আছে—Do not tempt Lord thy God (তোমার প্রভু ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ ক'রো না)। 'ঠাকুর! রোজ আমি ইষ্টভৃতি করি, আমি তোমার অনুগত, তুমি আমার রোগটা সারিয়ে দাও। রোগ যদি সারে, তাহ'লে বুঝব তোমার দয়া আছে আমার উপর। ইষ্টভৃতির মাহাত্ম্য আছে। রোগ সেরে গেলে বেশী ক'রে ইষ্টভৃতি করব'—এমনতর সর্ত্তকণ্টকিত অবদানে Supreme Being (পরমপিতা) টলেন না, Satan (শয়তান) টলতে পারে। ঐ সর্ত্ত ও প্রত্যাশাই তাঁর দয়া পাওয়ার পথে barrier (বাধা) সৃষ্টি করে। ভগবান ভালবাসেন সকলকে equitably (যথোপযুক্তভাবে), কিন্তু আমরা প্রত্যাশাহীন হ'য়ে তাঁকে যতখানি ভালবাসি, ততখানি আমাদের তাঁকে পাওয়া হয়, তাঁকে পাওয়া মানে স্ববৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তাঁর রকমে রূপান্তরিত হওয়া। ঐ চরিত্র যেখানে মজুত হয়, সেখানে জীবনীয় লওয়াজিমার অভাব হয় না। গীতায় আছে কর্ম্মফল ত্যাগের কথা। ইষ্টভৃতি হ'লো বাস্তব কর্ম্মফল ত্যাগ। কাজের ফলে যা' পেলাম তার অগ্রভাগ গুরুকে দিলাম। এর ক্রমাগতি ও ক্রমবিস্তারে ভগবান আপনাদের কাছে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবেন আপনাদের গুরুর ভিতর-দিয়ে, যেমন কেষ্টঠাকুর হয়েছিলেন অর্জ্জুনের কাছে।

"একভক্তির্বিশিষ্যতে"। একনিষ্ঠ না হ'লে হয় না। বহুনৈষ্ঠিকতা নিষ্ঠার ব্যভিচার ছাড়া আর কিছু নয়। ওকে নিষ্ঠাই কয় না। সবাইকে ভালবাস, শ্রদ্ধা কর, কিন্তু devotion (ভক্তি) concentrate (কেন্দ্রীভূত) কর এক জায়গায়। Traffic love (ব্যবসাদারী ভালবাসা) ভাল নয়।

প্রফুল্ল—Traffic love (ব্যবসাদারী ভালবাসা) কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ধর, একজন স্বার্থ বাগাবার আশায় বহু সাধুর কাছে যাচ্ছে,

খুব ভক্তি দেখাচ্ছে, কিন্তু কাউকে অনুসরণ করে না।

কেষ্টদা—চারিদিক হ'তেই তো মানুষ তার প্রয়োজনীয় যা'-কিছু তা' আহরণ করবে। এরমধ্যে গুরুর প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজনকে অনুসরণ না করলে আহরণগুলি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকবে। মালার আকারে গেঁথে উঠবে না। মালা গাঁথার সূত্র হলেন ইষ্টগুরু। I love all with the love of my one (একের প্রতি আমার যে ভালবাসা, তাই নিয়ে আমি সকলকে ভালবাসি)। ঐ-রকম একজন এক যদি আমার জীবনে না থাকেন, যাঁকে নিয়ে আমার জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বদা চলি, তাহ'লে আমার জীবনে কখনও ঐক্যসঙ্গতি আসবে না। কতরকমের অসঙ্গতি ও পরস্পর-বিরোধী ভাব যে আমার উপর আধিপত্য ক'রে আমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলবে, তার ইয়ত্তা নেই। তাই গুরু চাই-ই, আর চাই গুরুনিষ্ঠা। গুরুনিষ্ঠা নিয়ে, গুরুগত প্রাণ হ'য়ে যা'-কিছু করতে হবে। বৈষ্ণবরা কয় কেষ্টঠাকুর যাতে ভাল থাকেন, সেইজন্য নাকি গোপীরা কাত্যায়নী পূজা করেছিল। ইষ্টার্থে যা' করা যায়, তাই-ই পবিত্র, তাই-ই পুণ্য।